সাইয়েদ কুতুব শহীদ

বিশ্বশান্তি ও ইসলাম

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
অনূদিত

সাদিয়া পাবলিকেশন

বিশ্বশান্তি ও ইসলাম

মূল ঃ সাইয়েদ কুতুব শহীদ

অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

তৃতীয় (সা. প্রথম) সংস্করণ
কার্তিক ১৪০৬
শাবান ১৪২০
নবেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক
মোঃ মশিউর রহমান
সাদিয়া প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা - ১১০০।

প্রচ্ছদ
মোঃ মশিউর রহমান

মুদ্রন
হ্যাভেন প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস
৪৮/১ নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা - ১১০০।

বিনিময় ঃ ১১০.০০

BISHWA SHANTI O ISLAM : Word peace and Islam written by Sayed Qutub Shaheed, translated by Golam Sobhan Siddique into Bengali and published by Md. Moshiour Rahman, Proprietor, Sadia Prokashani, Banglabazar, Dhaka.

November 1999

Price : Tk. 110.00; Dollar(US) : 5.00

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মালিক ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহর। যিনি শুধু আমারই মালিক নয় বরং আকাশমন্ডলী ও যমীনের প্রতিটি প্রাণী তথা অনু-পরামনুর প্রতিপালক ও বিধানদাতা। যার অসীম দয়ায় আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

দরুদ ও সালাম পেশ করছি, সেই মহান নেতার দরবারে যার নেতৃত্বে এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বেহেশ্তি শান্তির নমূনা। যার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও মুক্তির একমাত্র জীবন বিধান (ইসলাম) পেয়েছি। যার নেতৃত্বের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তিনি দিয়েছেন চীর শান্তির গ্যারান্টি। পৃথিবীর অন্য কোন নেতাই তাঁর অনুসারীদের শান্তির এ গ্যারান্টি দিতে পারেনি, পারবেও না। সেদিন যে পথ ধরে এ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে পথেরই রূপরেখা এই গ্রন্থ।

একটা সময় ছিল যখন আমি নামাজ পড়তাম না। অন্য আর দশটি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রের মতই নিজেকে ইসলাম থেকে দূরে রাখাকে আধুনিকতা মনে করতাম। ইসলাম তথা ইসলামের বিভিন্ন প্রথা নিয়ে কটুক্তি করে, নিজেকে আধুনিক হিসেবে পরিচিত করতাম। এমনি সময় কোন এক ঘটনায়,প্রচন্ড অস্থীরতা,অশান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি শান্তির অন্বেষায় ঘুরতে থাকি। ইসলামিক ফাইন্ডেশন লাইব্রেরীতে (ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সাথে) গিয়ে সময় কাটাতে থাকি । প্রথমদিকে এখানে গল্প, উপন্যাস পড়ে সময় বেশ ভালই কাটতে থকে। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ করে জানতে ইচ্ছে হয় আল্লাহ্ তাঁর এই কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য কি পাঠিয়েছেন। এই জানার ইচ্ছে থেকেই আমি শ্রদ্ধেয় মাওলানা আমিনুল ইসলামের লিখিত বাংলাভাষায় প্রথম তাফসীর, তাফসীরে নূরুল কোরআন প্রথম খন্ড থেকে পড়তে শুরু করি। আর এ তাফসীরের অসীলায়ই মহান আল্লাহ পাল্টে দেন আমার জীবন চলার পথকে; জানতে পারি এতদিন আমি যে পথ ধরে চলছিলাম সে পথের গন্তব্য ছিল দোজখ। আর আল্লাহ আমাকে যে পথে নিয়ে যেতে চান সে পথের গন্তব্য চির শান্তির আবাস জান্নাত। এরপর থেকে নিয়মিত চলতে থাকে আমার লাইব্রেরীতে আসা-যাওয়া। এরই মাঝে চোখে পড়ে **"বিশ্বশান্তি ও ইসলাম"**-এ বইটি। চোখে পড়ার পরই বই-এর এ নামটি আমাকে আকর্ষণ করে। হাতে তুলে নেই বইটি,গ্রন্থকারের নাম সাইয়েদ কুতুব শহীদ দেখেই পড়া শুরু করি। কিন্তু এই বই পড়তে গিয়ে আমি কোনদিন একটানা এক-আধ পৃষ্ঠার বেশী পড়তে পারিনি। একটু পড়তেই আমার ভাবনা আমাকে নিয়ে যেত বিভিন্ন দিকে। আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম, কত শান্তির এ পথ - ইসলাম। অথচ আমরা সবাই এ পথ থেকে কত দূরে থেকে কেবল শান্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি। আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সমাজ, এক কথায় আমাদের সব কিছু আমাদেরকে এ শিক্ষা থেকে কত দূরে সারিয়ে এনেছে, আমরা অন্ধের মত আজ ছুটে চলেছি জাহান্নামের পানে।

এ গ্রন্থ প্রকাশে অনুমতি দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, শ্রদ্ধেয় অনুবাদক গোলাম সোবহান ছিদ্দিকীকে। তাছাড়াও আমার সহধর্মিনী, যিনি পুরো অর্থ যুগিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশে সর্ববৃহৎ অবদান রেখেছেন তাঁর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেসব শুভাকাঙ্খিদের যাদেঁর অনুপ্রেরণা আমাকে এ গ্রন্থ প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছে।

পরিশেষে আমি আমার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করছি। কারণ গ্রন্থপ্রকাশে সবেমাত্র আমার হাতেখড়ি। সঙ্গত কারণেই এতে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠক আমার ভুল-ত্রুটি গুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করলে কৃতজ্ঞ থাকব। এ গ্রন্থপাঠে কোন পাঠক যদি এপথের সন্ধান খুঁজে পান, তাহলে

অনুবাদকের আরয

সময়ের স্বল্পতার কারণে তৃতীয় সংস্করণে অনুবাদক তাঁর লেখা দিতে না পারায়, তাঁর অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণের লেখাটি সরাসরি এখানে তুলে ধরা হলো।

আলহামদুলিল্লাহ। 'বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। শতদল প্রকাশনী বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। কিন্তু বইটর যথার্থ মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে পাঠক মহলের নিকট তেমন হৃদয়গ্রাহী হতে পারেনি। তবুও প্রায় এক দশক আগে মেসার্স শতদল প্রকাশনী বইটি প্রকাশে উদ্যোগী না হলে আদৌ বইটি প্রকাশিত হতো কিনা সন্দেহ। এজন্য আমরা প্রথম প্রকাশক শতদল প্রকাশনী কর্তৃপক্ষের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান বিশ্বে যে বস্তুটির অভাব সবচেয়ে বেশী, তা হচ্ছে শান্তি। আজ বিশ্বের কোথাও এতটুকু শান্তি নেই। শান্তি নেই ব্যক্তি জীবনে। শান্তি নেই সমাজ আর রাষ্ট্রীয় জীবনে। মানুষ আজ মানুষকে ভয় করছে হিংস্র বাঘের চেয়েও বেশী। গভীর রাতে মানুষরূপী এক শ্রেণীর পশুর ভয়ে মানুষ পথে-ঘাটে চলাচল করতে ভয় পায়। এমনকি গৃহের কারো জীবন নিরাপদ নয়। কোথাও শান্তি নেই। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোথাও শান্তি নেই। বিশ্ব-শান্তির পক্ষে যারা মোড়লগিরি করছে, তারাই তো আজ বিশ্ব-শান্তির পথে বাধা, বিশ্ববাসীর আজ আর তা বুঝতে বাকী নেই। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আজ নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে। ফিলিস্তিনীররা আপন গৃহে প্রবাসীর মতো মানবেতর জীবন যাপন করছে। শেষ পর্যন্ত জবর দখলদার ইসরাঈলী হায়েনার সঙ্গে তাদেরকে আপোস করতে হয়েছে। বিশ্ব-শান্তি আর মানবাধিকারের নামে যারা কেঁদে বুক ভাসায়, মানুষের দরদে যারা মায়া অশ্রু ঝরায়, তাদের কেউ এ কথা বলতে এগিয়ে আসেনি যে, ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডের অধিকারীদের নিকট তাদের ছিনতাইকৃত ভূ-খন্ড ফেরত দেয়া হোক।

বিশ্বে দু'দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। লাখ লাখ বনী আদম প্রাণ হারিয়েছে। তার চেয়েও বেশী পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ। এখনো সে যুদ্ধের জের চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যখন অশান্তির বিভীষিকা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ যখন শান্তির জন্য হাহাকার করে, তখন সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ বর্তমান গ্রন্থের মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। বলা চলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে মূল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থটির অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হলেও গ্রন্থটির আবেদন মোটেই ফুরায়নি এবং কখনো ফুরাবে না।

লেখক বইটিকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন- মনের শান্তি, ঘরের শান্তি, সমাজের শান্তি এবং বিশ্ব-শান্তি। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটাই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শান্তির নামে সভা-শোভাযাত্রা এবং বিশ্ব-শান্তি পরিষদ গঠন দ্বারাও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ আর নিরাপত্তা পরিষদ যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সে কথা আজ আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার মোড়লগিরি করা ছাড়া জাতিসংঘ

আজ পর্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ উপায় হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, লেখক কুরআন-হাদীস থেকে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বপরিস্থিতিতে আজ অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশ্বে অশান্তির দুই মহানায়কের একজন আজ ধরাশায়ী। সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসের ঘর আজ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়েছে। কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যর্থ প্রমানিত হয়েছে। পুঁজিবাদেরও আজ নাভিশ্বাস দশা। সেদিন খুব দূরে নয়, যে দিন পুঁজিবাদও মুখ থুবড়ে পড়বে। এখন মানুষ বুঝতে পারছে যে, ইসলাম ছাড়া কোন মতবাদ দ্বারা, কোন তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। প্রয়োজন কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বাস্তব প্রতিষ্ঠা। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ। এজন্য প্রয়োজন ত্যাগ আর কুরবানী। তার চেয়েও প্রয়োজন এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রের, সাধারণ মানুষ যাদেরকে ইসলামের মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে না, তা প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে। এ যুগেও যে ইসলাম বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তা টিকে থাকতে পারে, ইরান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইসলাম যাতে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে এবং প্রতিষ্ঠিত হলেও যাতে টিকে থাকতে না পারে, সে জন্য শয়তান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই শয়তান নানাভাবে আমাদেরকে প্রতারিত করবে। শয়তানের প্রতারণা আর চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদেরকে সর্তক থাকতে হবে। তার প্রতারণার জাল ছিন্ন করে ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, অশান্তি প্রতিষ্ঠা মানুষের নয়, শয়তানেরই কাজ। আজ সারা বিশ্বে কম-বেশী শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসন থেকে শয়তানকে অপসারণ করতে হবে। কথাটা বলা যত সহজ, করা কিন্তু তত সহজ নয় বরং অনেক বেশী কঠিন। আমরা কি এ কঠিন কাজটি করার জন্য প্রস্তুত?

২৪ মার্চ, ১৯৯৪ ইং

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
'নিরিবিলি'
১২-ই ১/৩৮ মিরপুর, ঢাকা - ১২২১

গ্রন্থাকার প্ররিচিতি

জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ কুতুব। কুতুব তাঁর বংশীয় উপাধী। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিশরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ইবরাহীম কুতুব। ইবরাহীম কুতুবের পাঁচ সন্তান ছিল। সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব, হামিদা কুতুব, আমিনা কুতুব। পঞ্চম কন্যা সন্তানটির নাম জানা যায়নি। সাইয়েদ কুতুব ভাই-বোনের মধ্যে বড়, তাঁরা সকল ভাই-বোনই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন; ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করেন এবং কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সালে মিশরের উস্ইউত জিলার 'মূশা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মা ফাতিমা হোসাইন উসমান অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাভীরু মহিলা ছিলেন। সাইয়েদ কুতুবের পিতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করতেন কিন্তু তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফয করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পিতা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি তাজহিযিয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে ঐ মাদ্রাসা থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা-মন্ত্রনালয়ের অধীনে স্কুল-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। মিশরে ঐ পদটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচিত হত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই তাঁকে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি পড়া-শুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তিনি দু'বছরের কোর্স শেষ করে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকা থাকা কালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরাবস্থা লক্ষ্য করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখওয়ানুল মুসলেমুন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী যাচাই করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ঐ দলের সদস্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে মিশরকে স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথেই ইখওয়ান দল বৃটিশের মিশর ত্যাগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে এ দলের সক্রিয় কর্মী সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ্যে পৌছে। সাধারণ সদস্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ছিল কর্মী সংখ্যার কয়েকগুণ বেশী। বৃটিশ ও স্বৈরাচারী মিশর সরকার ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং এ দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইংরেজী ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ দলের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ-এ-আম উস্তাদ হাসানুল বান্না শাহাদত বরণ করেন এবং ইখওয়ানুল মুসলেমুন বে আইনী ঘোষিত হয়।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিশরে সামরিক বিপ্লব সূচিত হয়। ঐ বছরই ইখওয়ান দল পুনরায় বহাল হয়ে যায়। ডাঃ হাসান আল হোদাইবী দলের মোরশেদ-এ-আম নির্বাচিত হন। সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ান দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনিত হন। দলের আদর্শ প্রচার ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ বিভাগ তাঁর পরিচালনাধীনে অগ্রসর হতে থাকে। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি।

১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন সাইয়েদ কুতুব। ছ'মাস পরই কর্ণেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারণ, ঐ বছর মিশর সরকার বৃটিশের সাথে নতুন করে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে, ঐ পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের উপর নির্যাতন শুরু করে। একটি বানোয়াট হত্যা-ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে ইখওয়ানুল মুসলেমুন দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারী ও নির্যাতন

গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। তাঁকে মিশরের বিভিন্ন কারাগারে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাঁকে সে অবস্থায়ই গ্রেফতার করে। তাঁর হাতে-পায়ে শিকল পরানো হয়। শুধু তাই নয়, সাইয়েদ কুতুবকে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় জেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। পথে কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতেন, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

জেলে ঢুকার সাথে সাথেই জেল কর্মচারীগণ তাঁকে মারপিট করতে শুরু করে এবং দু'ঘন্টা পর্যন্ত এ নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুর তাঁর পা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে বেড়ায়। এ প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানানোর পর একটানা সাত ঘন্টা ব্যাপী তাঁকে জেরা করা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য এসব নির্যাতন সহ্য করার যোগ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর সুদৃঢ় ঈমানের বলে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় সব অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য করেন। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

জেলের অন্ধকার কুঠরী রাতে তালা বন্ধ করা হতো। আর দিনের বেলা তাঁকে রীতিমত প্যারেড করানো হতো। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বক্ষ-পীড়া, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা ও সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যাথা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। তবু তাঁর গায়ে আগুনের ছেঁকা দেয়া হতে থাকে। পুলিশের কুকুর তাঁর গায়ে নখ ও দাঁতের আঁচড় কাটে। তাঁর মাথায় খুব গরম এবং পরক্ষণেই বেশী ঠান্ডা পানি ঢালা হয়। লাথি, কিল, ঘুষি, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ইত্যাদি তো ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার।

১৯৫৫ সালের তেরই জুলাই, 'গণ-আদালতের' বিচারে তাঁকে পনর বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। অসুস্থতার দুরুন তিনি আদালতে হাজির হতে পারেননি। এক বছর কারাভোগের পর নাসের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়ে যে,তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করলে তাঁকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মর্দেমু'মিন এ প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেনঃ

"আমি এ প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, মযলুমকে যালিমের নিকট ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। আল্লার কসম! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসী থেকেও রেহাই দিতে পারে, তবু আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাযী নই। আমি আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হতে চাই যে, আমি তাঁর প্রতি এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

পরবর্তীকলে তাঁকে যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে, ততবারই তিনি একই কথা বলেছেন, "যদি আমাকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায় ভাবে বন্দী করে থকে, তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থন করবো না।"

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ মিশর সফরে যান। তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্ণেল নাসের তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁরই বাসভবনে অন্তরীনাবদ্ধ করেন।

আবার গ্রেফতার ও দন্ড

এক বছর যেতে না যেতেই বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া পাহারাধীন ছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাজারেরও বেশী লোককে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে প্রায় সাত শ' ছিলেন মহিলা।

১৯৬৫ সালে কর্ণেল নাসের মস্কো সফরে থাকাকালীন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ইখওয়ানুল মুসলেমুন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারা মিশরে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়। ১৯৬৪ ছাব্বিশে মার্চে জারীকৃত একটি নতুন আইনের বলে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি দন্ডবিধানের অধিকার প্রেসিডেন্টকে প্রদান করা হয়। তার জন্যে কোন আদালতে প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। কিছুকাল পর বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হয়। প্রথমত ঘোষণা করা হয় যে, টেলিভিশনে ঐ বিচারনুষ্ঠানের দৃশ্য প্রচার করা হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ 'অপরাধ স্বীকার' করতে অস্বীকার এবং তাদের প্রতি দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার চলতে থাকে। আসামীদের পক্ষে কোন উকিল ছিল না। অন্য দেশ থেকে আইনজীবীগণ আসামী পক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখান করা হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি উইলিয়াম থরপ (Throp) ও মরোক্কোর দু'জন আইনজীবি আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য যথরীতি আবেদন করেন। কিন্তু তা না-মঞ্জুর করা হয়। সুদানের দু'জন আইনজীবি কায়রো পৌঁছে তথাকার বার এসোসিয়েশনে নাম রেজিষ্ট্রি করে আদালতে হাযির হন। পুলিশ তাঁদের আদালত থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগণ ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইবুনালের সামনে প্রকাশ করেন যে, 'অপরাধ স্বীকার' করার জন্যে তাঁদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইবুনাল সভাপতি আসামীদের কোন কথার প্রতিই কর্ণপাত করেননি।

১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দু'জন সাথীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃতুদন্ডাদেশ শুনানো হয়। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদে ঝড় উঠে। কিন্তু ঐ বছর পঁচিশে আগষ্ট, তারিখে ঐ দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

সাইয়েদ কুতুব মিশরের প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকদের অন্যতম। শিশু সাহিত্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় ভাষায় নবীদের কাহিনী লিখে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। শিশুদের মনে ইসলামী ভাবধারা জাগানোর জন্য এবং তাদের চারিত্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি গল্প লিখেন। পরবর্তীকালে আশওয়াক (কাঁটা) নামে ইসলামী উপন্যাস রচনা করেন। একটি 'তিফলে মিনাল ক্বারীয়া' (গ্রামের ছেলে) ও অন্যটি 'মদিনাতুল মাসহুর' (যাদুর শহর)।

তাঁর রচিত গ্রন্থবলী

(১) আল কুরআনে কেয়ামতের দৃশ্য।

কুরআন পাকের ১১৪টি সুরার মধ্য থেকে ৮০টি সূরার ১৫০স্থানে কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে। সাইয়েদ বিপুল দক্ষতার সাথে সে সব বিবরণ থেকে হাশরের ময়দান, দোযখ ও বেহেশতের চিত্র এঁকেছেন। বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

(২)التصوير الفنى فى القرآن - ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ খানায় সাইয়েদ কুতুব কুরআনের ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গীর আলোচনা করেছেন। আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য নামে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।

(৩) ইসলামে সামাজিক সুবিচার। এ পর্যন্ত বইখানার ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বইখানা অনূদিত হয়েছে। (ইংরেজী, ফারসী, তূর্কী ও উর্দূ ভাষায়)।

(৪) تفسير فى ظلال القرآن সাইয়েদ কুতুবের এক অনবদ্য অবদান। আট খন্ডে সমাপ্ত এক জ্ঞানের সাগর। ঠিক তাফসীর নয়- বরং কুরআন অধ্যয়নকালে তাঁর মনে যেসব ভাবের উদয় হয়েছে তা-ই তিনি কাগজের বুকে এঁকেছেন এবং প্রতিটি আয়াতের ভিতরে লুকানো দাওয়াত, সংশোধনের উপায়, সতর্ককরণ, আল্লার পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে নিপূণতার সাথে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত।

(৫) ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব। (৬) বিশ্বশান্তি ও ইসলাম। (৭) ইসলামী রচনাবলী। (৮) সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি। (৯) "মিশরে সংস্কৃতি ভবিষ্যৎ" নামক পুস্তকের সমালোচনা। (১০)গ্রন্থবলী ও ব্যক্তিত্ব। (১১) ইসলামী সমাজের চিত্র, (১২) আমার দেখা আমেরিকা, (১৩) চার ভাই-বোনের চিন্তাধারা, এতে সাইয়েদ কুতুব, মহাম্মাদ কুতুব, আমিনা কুতুব ও হামিদা কুতুবের রচনা একত্রে সংকলিত হয়েছে। (১৪) নবীদের কাহিনী, (১৫) কবিতা গুচ্ছ, (১৬) জীবনে কবির আসল কাজ, (১৭) পথে দিশা।

معالم فى الطريق পুস্তক লেখার জন্যই মিশর সরকার সাইয়েদ কুতুবকে অভিযুক্ত করেন ও ঐ অভিযোগে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়। মিশরে সামরিক বাহনীর প্রত্রিকা مجلة الصوت المطلع পয়ষট্টির ১লা অক্টোবরে প্রকাশিত ৪৪৬নং সংখ্যায় তার বিরুদ্ধে অতীত অভিযোগের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

"লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ এবং মার্কসীয় মতবাদ উভয়েরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি দাবী করেন যে, ঐসব মতবাদের মধ্যে মানব জাতির জন্য কিছুই নেই! তাঁর মতে বর্তমান দুনিয়া জাহেলিয়াতে ডুবে গেছে। আল্লার সার্বভৌমত্বের জায়গায় দৃষ্টিভংগীকে পুনরুজ্জীবিত করে সে জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করার উপর জোর দেন এবং এ জন্যে নিজেদেও যথাসর্বস্ব কুরবানী করে দেয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আল্লাহ ব্যতীত সকল শাসনকর্তাদের তাগুত আখ্যা দেন। লেখক বলেন- তাগুতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ঈমানের শর্ত। তিনি ভাষা, গোত্র-বর্ণ, বংশ, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্যবোধকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে ঐক্য গড়া এবং এ মতবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করার জন্যে মুসলিমদের উস্কানী দিচ্ছেন।

লেখক তাঁর ঐ পুস্তকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, সারা মিশরে ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করা ও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা পেশ করেন।"

মহান আল্লাহ তাঁর কুরবানী কবুল করুন এবং তাঁকে শহীদ হিসাবে গ্রহন করে জন্নাতুল ফিরদাউস স্থান দান করুন।

সূচিপত্র

বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ঈমান ও জীবন

নশ্বর মানুষের জীবন সীমিত। দুনিয়ার জীবনের দিনগুলো আঙ্গুলে গোনা যায়। এ বিস্ময়কর বিশ্ব-যাতে মানুষ বসবাস করে-এর তুলনায় সে এক অণুকণা মাত্র; যার কোন ঠিকানা নেই, নেই কোন মূল্য। অনাদি অনন্তকালকে একদিকে রেখে নশ্বর মানুষের জীবনকে বিচার করলে সে তুলনায় মানুষের জীবনকে মনে হবে বিদ্যুতের চমক বা চক্ষের পলকমাত্র।

কিন্তু এ নশ্বর মানুষ, এ অস্থির অণু, মূল্যহীন-পতিত এ বস্তু এমন এক শক্তির অধিকারী, যার সাহায্যে সে ক্ষণিকে অনন্ত অসীম শক্তির সাথে মিলিত হতে পারে, পারে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিস্তৃত হয়ে মহাবিশ্বের সমান হতে, কালের গভীরতা আর সময়ের ব্যাপকতায় এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে আর নিজেকে গণ্য করতে পারে কালের মহান এবং বিস্ময়কর শক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে। সন্দেহ নেই, সে অনেক বড় বড় কার্য সাধন করতে পারে, অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা রাখে, অনেক কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করার এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যোগ্যতাও রয়েছে তার। সে অতীত কালের বিষয়কে অনুভব করে, বর্তমান কালে অবস্থান করে আর আর ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। সে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তির নিকট থেকে শক্তি লাভ করে, যার ঝর্ণাধারা কখনো ফুরাবার মত নয়। দুর্বলতা-অস্থিরতা তাকে আচ্ছন্ন করে না। এ শক্তি অর্জন করার পর সে জীবন, জীবনের ঘটনা প্রবাহ এবং অন্যান্য বিষয়ের মুকাবিলা করতে পারে সমশক্তি দিয়ে; বরং তার চেয়েও বেশী শক্তিশালীভাবে। যখন সে অনাদি-অনন্ত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের এবং সে শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক সুস্থির করে গড়ে তোলে, তখন সে আর পতিত বস্তু থাকে না, থাকে না দুর্বল মানুষ।

এ শক্তি সরবরাহ করা ধর্মীয় বিশ্বাসের কাজ। মানব-মন এবং তার জীবনে এর কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায়, আমরা তার প্রতি আলোকপাত করেছি। এ হচ্ছে মানব-মনে বিশ্বাসের মূল্যের নিগূঢ় তত্ত্ব, আর এই হচ্ছে বিশ্বাসের কারণে জীবনে শক্তিলাভের গোড়ার কথা। আকীদা-বিশ্বাস বিশ্বের বুকে যে সব বিস্ময়কর কার্য সাধন করেছে এবং অবিরতভাবে এখনও করে চলছে, তার তত্ত্বকথার পেছনে স্বয়ং বিশ্বাসই কার্যকর রয়েছে। আকীদা-বিশ্বাসের বিস্ময়কারিতা জীবনের ধারা পরিবর্তন করেছে, করেছে ঘটনা প্রবাহের মোড় পরিবর্তন। তা ব্যক্তি এবং সমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করে নশ্বর-সীমিত জীবন বিসর্জন দিতে, যাতে এক অবিনশ্বর এবং মহান জীবন লাভ করা যায়। তা দুর্বল অক্ষম মানুষকে এনে দাঁড় করায় রাষ্ট্র ক্ষমতা, বিত্ত-বৈভব এবং লৌহ-শক্তির মুখোমুখী। একজন মর্দে মু'মিনের অন্তরাত্মায় আকীদা-বিশ্বাসের যে সুদৃঢ় এবং অবিনশ্বর শক্তি নিহিত থাকে, তার সামনে জুলুম-নির্যাতনের সকল ক্ষমতা-দর্প পরাজয় বরণ করে। এ সব শক্তিকে পদানতকারী কেবল সীমিত এবং নশ্বর মানুষই নয়; বরং এ হচ্ছে সে

বিস্ময়কর শক্তির কাজ, যার প্রাণশক্তি তার মধ্যে কার্যকর রয়েছে। শক্তির এ চিরন্তন আধার কখনো ফুরাবার নয়, নয় দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার।

দীনের এ প্রত্যয় ছাড়া অপর কোন দর্শন-মতবাদ নশ্বর সৃষ্ট জীবকে অনাদি-অনন্ত শক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে না, সে ক্ষমতা তার নেই। দুর্বল মানুষকে সে এমন ভরসাও দিতে পারে না, যাতে শান-শওকত, বিত্ত-বৈভব, রাষ্ট্র-ক্ষমতা এ সবই তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়, গোলা-বারুদের শক্তিও তার নিকট কিছুই মনে হয় না। সে বঞ্চনা আর নির্যাতন সহ্য করে নেয়, অটল-অবিচলভাবে প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করে। কেবল দীনি আকীদা-বিশ্বাসই তাকে মৃত্যুর জন্যে উদ্বুদ্ধ করে-এমন মৃত্যু, যার অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয় জীবনের ফোয়ারা। এ বিশ্বাস তাকে বিনাশের জন্যে অনুপ্রাণিত করে-এমন বিনাশ, যার পর অর্জিত হয় চিরন্তন জীবন। তাকে প্রস্তুত করে কুরবানীর জন্যে, যার ফলে সে লাভ করে আল্লাহর সাহায্য। এ কারণেই ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে দীনি আকীদার বিস্ময়কর শক্তি স্বীকৃত। আর এ কারণেই আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কেবল আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে খুঁজে বের করার জন্যে আমরা এতটা জোর দেই। আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছে এ সমাধানের একমাত্র উৎস।

আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে, এ বিশ্বাস আমাদের নিকট এক বিরাট শক্তি। আমাদের জাতীয় অস্তিত্বে এর গভীর কার্যকারিতা বিদ্যমান। জীবন-সংগ্রামে আমরা যদি এ মহাশক্তিকে বিসর্জন দেই, তবে এর চেয়ে বড় বোকামী আর কিছু হবে না। আমরা ভেতরে-বাইরে এক মহা-সংঘাতের সম্মুখীন। আমাদেরকে অসংখ্য বিস্ময়কর শক্তির সম্মুখীন হতে হবে, যাদের বস্তুগত শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। এ মহা-সংঘাতে আমাদের দীনি আকীদা-বিশ্বাস যেহেতু আমাদেরকে সত্যিকার শক্তি দান করে, সাথে সাথে সমস্যার বাস্তব এবং কার্যকর সমাধানও পেশ করে; সুতরাং এমন কোন্ বিবেক আছে, যা এ সব শক্তিকে কাজে লাগাতে এবং এ সমাধান গ্রহণ করতে ইতস্তত করবে, অস্বীকার করবে? আর এ অস্বীকৃতির কারণও কেবল এই যে, এ সব শক্তি-সমাধান অর্জিত হয় আমাদের আকীদার বদৌলতে!

অন্যান্য জীবন-দর্শন কখনো কখনো কোন কোন সমস্যার অসম্পূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু আমরা যে আকীদার প্রতি আহ্বান জানাই, তার মূল্য কেবল এটুকুই নয় যে, তা কোন জরুরী সমস্যার সাময়িক সমাধান পেশ করে। তার সত্যিকার মূল্য এই যে, সে সমাধানও পেশ করে আর তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সহায়ক এবং নিয়মিত শক্তিও সরবরাহ করে। কী সেই শক্তি? ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর প্রাকৃতিক নিয়ামক শক্তি। এটা এমন এক জিনিস, মানব-মন যদি তা থেকে মুক্ত হয়, তাহলে কোন দার্শনিক তত্ত্ব সে শূন্যতা পূরণ করতে পারে না, কোন সামাজিক তত্ত্ব এবং কোন অর্থনৈতিক মতবাদও নয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানব-মনে দীনি দর্শনের স্থান অন্যান্য দর্শন-চিন্তাধারার তুলনায় অনেক গভীর। এটা এক স্বাভাবিক পিপাসা, কেবল ঈমানের পানিই যে পিপাসা

মেটাতে পারে। এ পিপাসার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন দেহের জন্যে পানাহার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দাবির পিপাসা হয়ে থাকে।

কখনো কখনো এসব প্রাকৃতিক দাবি কোন প্রাসঙ্গিক কারণে স্তিমিত অথবা চাপা পড়ে থাকে। তখন এ অবস্থায় কিছু লোক ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা মনে করে, এ দাবি বুঝি মরে গেছে! তাদের মনে তখন এ ধারণা জাগে যে, মানব-মনের এ শূন্যতা দার্শনিক কিংবা অর্থনৈতিক মতবাদ বা অন্য কোন দর্শন-মতবাদ দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অচিরে তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়। তারা বুঝতেই পারে না-সুপ্ত বিশ্বাস অকস্মাৎ এক নূতনরূপে জেগে ওঠে। অতঃপর ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে তা সৃষ্টি করে এক বিস্ময়কর বিপ্লব। মানুষ দেখে অবাক হয়ে যায় যে, একটু আগেও তো এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিশ্চুপ এবং নিষ্প্রভ ছিল। এর দ্বারা কোন পরিবর্তন, কোন বিপ্লবের তো আশাই ছিল না। কিন্তু একটু পরই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বোকার দল যে অবস্থাকে বিশ্বাসের মৃত্যু বলে মনে করত, আসলে তা ছিল আত্মগোপনের এক সাময়িক বিরতিকাল মাত্র। মানব-মনের অবস্থা আর ভাবধারা সম্পর্কে ব্যক্তিরা ভালো করেই জানেন যে, এ বিরতি মানব-মনের এক অবাক পর্যায়। মানব-মন অনেক রাস্তা, মোড়, দুর্গম গিরি এবং সংকীর্ণ অন্ধকার অলি-গলিতে ঘেরা।

ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে দীনি আকীদা যে বিস্ময়কর কার্য সাধন করে, কোন গোপন ধ্যান-ধারণা পোষণ তার ভিত্তি হতে পারে না। কোন বাহুল্য উক্তি, কোন কূট-কৌশল এবং কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দ্বারাও এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে না। বস্তুত এসব বিস্ময়কর বিপ্লব সূচিত হয় কিছু জ্ঞাত কার্য-কারণ এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে একটা সর্বাত্মক চিন্তাধারার নাম, যা গোটা সৃষ্টিনিচয়কে দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে। তা মানব হৃদয়কে আস্থা এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে এবং তাকে দান করে এমন এক ক্ষমতা, যাতে সে পতনশীল শক্তি এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারার মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর আস্থার ক্ষমতা অর্জন করে সে এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করার শক্তিতে উজ্জীবিত হয়। এ বিশ্বাস তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, তার আশ-পাশে ছড়িয়ে পড়া মানুষ, নানা বস্তু এবং ঘটনা প্রবাহের সাথে তার সম্পর্কের ধরন কি হওয়া উচিত। তা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে তার মনযিলে মাকসূদ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা। তা মানুষের সকল শক্তিকে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করে তাকে একই পথে এনে দাঁড় করায়। মানব শক্তির সাথে যোগ দেয় স্বয়ং এ বিশ্বাসের শক্তি। এসব শক্তি মিলে একই কেন্দ্রের পেছনে একীভূত হয়। বিশ্বাসের শক্তি তাদেরকে একই পথের, একই লক্ষ্যের অভিসারী করে তোলে। তার সামনে লক্ষ্য হয়ে ওঠে স্পষ্ট, পথ হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল। এ লক্ষ্যের অভিসারী ব্যক্তি উজ্জীবিত হয় শক্তি, আস্থা এবং বিশ্বাসে।

পরিপূর্ণ মানব-ব্যক্তিত্ব এক ভারসাম্যপূর্ণ ঐক্যের নাম। সে এমন এক আকীদা-বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী, যা জীবনের প্রতি পদে ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানব ব্যক্তিত্ব জ্ঞান এবং কর্মে এর নিকট থেকে পথ-

নির্দেশ লাভ করতে পারে। সৃষ্টি নিচয় এবং জীবনের যে কোন মোড়ে, যে কোন বাঁকে তাঁর হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

প্রতিটি মানুষের জীবনে এ আকীদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তার অবস্থান হবে একটি কেন্দ্রবিন্দুবৎ। মানব-জীবন এবং তার ইচ্ছা ও কর্মের সকল যোগসূত্র তাতেই কেন্দ্রীভূত হবে। এমনিভাবে তার ব্যক্তিসত্তা খান খান হওয়া এবং হোঁচট খাওয়া থেকে মুক্তি পাবে; চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার শিকারও হবে না সে। এ কেন্দ্রবিন্দু যতটা শক্তিশালী হবে, ব্যক্তি জীবন এবং তার কর্মকাণ্ডে এদিক-ওদিক বিস্তৃত সূত্রের সাথে তার সম্পর্ক যতটা সুদৃঢ় হবে, ততটাই শক্তিশালী হবে তার ব্যক্তিত্ব। কারণ তা তো এক সুগঠিত ব্যক্তিত্ব। আর এমন ব্যক্তিত্বের চাল-চলন হবে সুদৃঢ়। কারণ তার চলার পথ সোজা-সরল।

যে দর্শন মানুষের নিছক কতিপয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং অন্যান্য বিষয়কে ছেড়ে দেয়, তার তুলনায় সে দর্শন অনেক উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ, যা মানুষের জ্ঞান ও আচরণের সকল পর্যায়কে ব্যাপৃত করে নেয়। মানুষ যখন তার জীবনের সকল বিভাগে একই আকীদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তা জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নানা দর্শন-মতবাদের অনুসারী হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অনেক সহজ হয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, একমাত্র দর্শনের ঐক্যই পারে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি অবিচার না করে ব্যক্তিত্বের ঐক্য সৃষ্টি করতে। এ ঐক্য জ্ঞান এবং কর্মের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ বা সীমিত করে না, করে না তাকে বিভিন্ন অলি-গলিতে বিভক্ত। কারণ, এ বিভক্তির পরিণতিও দাঁড়ায় জীবনের নানা পর্যায়ে স্থায়ী অস্থিরতা।

সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যে 'আত্মিক দর্শন'-এর কোন সম্পর্ক নেই, তা হচ্ছে সে সমাজ-দর্শনের মত-আধ্যাত্মিক দর্শন এবং রাষ্ট্রনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যার কোন যোগসূত্র নেই। অথবা তা হচ্ছে সে কারিগরী জ্ঞানের মত, বাস্তব কর্মজীবন, আকীদা-বিশ্বাস বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুত এসব দর্শনই হচ্ছে অসম্পূর্ণ। এটা মানবতার গোটা জীবনকে সংগঠিত-পরিচালিত করতে পারে না, পারে না মানব ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য এবং নিয়ম-শৃংখলা সৃষ্টি করতে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ তার ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে এমন কোন একটি দর্শনের তীব্র মুখাপেক্ষী, যা মানুষের জ্ঞান এবং কর্মজীবনের সকল দিক এবং বিভাগকে পরিব্যাপ্ত করে। চিন্তা ও আচরণের সকল দিকের তত্ত্বাবধান করে, উন্নতি-অগ্রগতির পথে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব-ইতিহাসের যে অধ্যায়ে ব্যক্তি এবং সমষ্টি এমন দর্শনের সন্ধান লাভ করে, এর আহ্বানকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এবং কর্মজীবনে তাকে বাস্তবায়িত করে, সে অধ্যায়ে মানবতাকে দেখা যায় অনেক অসাধ্য সাধন করতে। যে ঐক্য বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংগঠিত করে সকলকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করে, কেবল সে ঐক্যের আলোকেই এ অসাধ্য সাধনের ব্যবস্থা করা যায়। ইতিহাসের গতিধারায় তা যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝা-বায়ু বা দুর্বার সয়লাব।

এ ক্ষেত্রে কেবল ইসলামী দর্শনই হচ্ছে একক দৃষ্টান্ত, মানবতা তার দীর্ঘ ইতিহাসে যাকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেয়েছে। এ দর্শন এতটা ব্যাপক যে, জীবনের সকল বিভাগে ছেয়ে আছে মানুষের সকল জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডের ওপর, তা মানব জীবনের কোন একটি বিভাগকে গ্রহণ করে অন্য বিভাগগুলোকে বর্জন করে না। জীবনের একটি দিককে ফুটিয়ে তুলে অন্য দিকগুলো থেকে পলায়ন করে না। তার নির্দেশ এ নয় যে, 'কাইজারের পাওনা কাইজারকে দাও, খোদার পাওনা দাও খোদাকে।'[১] এর কারণ এই যে, ইসলামী দর্শন অনুযায়ী কাইজারের জন্য যা কিছু (এবং স্বয়ং কাইজারের অস্তিত্বও) কেবল আল্লাহর জন্য। কাইজারেরও এমন কোন অধিকার নেই, যা তার কোন প্রজা ভোগ করতে পারে না।

এ দর্শন ব্যক্তির আত্মিক-আধ্যাত্মিক দায়িত্ব গ্রহণ করে তার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং দৈহিক সত্তাকে পরিত্যাগ করে না। তার আচার-আচরণের নিয়ামক হয়ে আইন-বিধানকে ছেড়ে দেয় না, তার আত্মাকে সন্তুষ্ট করে কর্মকাণ্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এও নয় যে, তা কেবল ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আলোচনা করে, সামাজিক জীবন সম্পর্কে নীরবতা পালন করবে; তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যত্ন নেবে, কিন্তু রাষ্ট্র শাসন ও রাজ্য পরিচালন কার্যে, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে কোন পথ-নির্দেশ দেবে না। সর্বোপরি এ দর্শন এক পূণাঙ্গ জীবন বিধান-যার সূত্র মানব জীবনে এমন বিস্তৃত, যেমন একটা জীবন্ত দেহে ছড়িয়ে রয়েছে রগ-রেশা এবং নানা তন্ত্রী।

মিসরে এবং সারা মুসলিম জাহানের মুসলমানদের সামনে রয়েছে অনেক সমস্যা; অনেক জটিলতা-প্রতিবন্ধকতা। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে আমরা সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন, আর বৈদেশিক দিক থেকে আমাদের সামনে রয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যার সামাধান কি? দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে আমাদের নিজেদের খবর নেই। এ কথাও আমরা জানি না যে, আমাদের সংরক্ষিত শক্তি কত! আমাদের সামনে স্পষ্ট কোন লক্ষ্য নেই, নেই কোন স্পষ্ট পথ। এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা এসব সমস্যার সম্মুখীন, যখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে এমন এক দর্শন, যা আমাদের শক্তিকে সংগঠিত করতে পারে। আমাদের তীব্র প্রয়োজন এমন এক পতাকার, যার নীচে আমরা সকলে মিলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারি। আমরা এমন এক জীবন-দর্শনের তীব্র মুখাপেক্ষী, যা নিয়ে আমরা জীবন সমস্যার মুকাবিলা করতে পারি, মুকাবিলা করতে পারি এমন সব শক্তির, যারা ভেতর এবং বাইরে থেকে প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

আমরা এ যাবত আমাদের মহান ধর্মীয় দর্শনের প্রতি অবিচার করে এসেছি। অজ্ঞতা বা আত্মস্বার্থে আমরা এ কথা মনে করে বসেছি যে, আধুনিক যুগের জীবন এবং তার জটিলতার ক্ষেত্রে এ দর্শন কোন নির্ভুল সমাধান উপস্থাপন করতে পারে না। বিশেষ করে সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা তাকে নীরব বলেই মনে করে এসেছি।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। এ সব গ্রন্থে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম এ ক্ষেত্রে জীবন সমস্যার বাস্তব সমাধান উপস্থাপন করে। সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্ররা যেসব প্রশ্ন

১ বাইবেল পাদ্রিঃ ২২-২১

উত্থাপন করতো, তার অনেকাংশেরই জবাব দেয়া হয়েছে এসব গ্রন্থে। এখন তারাও এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, পূর্ণরূপে এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ইসলামে নিহিত রয়েছে অন্যান্য সমাজ-দর্শনের চেয়ে বেশী।

অবশিষ্ট রয়েছে আন্তর্জাতিক বিভাগ। এ ক্ষেত্রে খুব সামান্যই কাজ হয়েছে। এ বিভাগটি এখনও পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি। আজ আমরা বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন। গোটা মানবতা তীব্রভাবে এর প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। এ ব্যাপারে আমাদের অনুভূতিও তাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের নিকট কি এর কোন জবাব বর্তমান রয়েছে? ইসলাম কি এ জটিল গ্রন্থি খুলতে পারে?

এ জিজ্ঞাসার বিস্তারিত জবাব উপস্থাপন করে বক্ষ্যমান গ্রন্থ।

সাইয়েদ কুতুব

ইসলামে শান্তির প্রকৃতি

ইসলামে শান্তির ধারণা একটি মৌলিক এবং গভীর ধারণা। ইসলামের প্রকৃতির সাথে এ ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবন, জগত এবং মানুষ সম্পর্কে মানুষের সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে এর সম্পর্ক সুগভীর। ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থা, তার আইন-বিধান, বিধি-ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান সবই এ ধারণার সাথে যুক্ত। এ ধারণা গোটা ইসলামের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে, গভীরভাবে এর অধ্যয়নকারী যতক্ষণ না এর গভীর এবং সুদূর-প্রসারী শেকড়ের সন্ধান করবে, ততক্ষণ তা তাদের নাগালে আসবে না, আসতে পারে না। সে পর্যন্ত পৌছার জন্যে প্রয়োজন গভীর দূরদৃষ্টি, ধৈর্য-স্থৈর্য এবং বিচক্ষণতা।

জীবন, জগত এবং মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নয়। যেমন আমার প্রণীত 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' গ্রন্থেও এটা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, ইসলামের যে কোন দিক এবং বিভাগ সম্পর্কেই আলোকপাত করা হোক না কেন, এ বিরাট সর্বাত্মক মতবাদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা অনেকাংশে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, ইসলামের সর্বাত্মক দর্শনের সকল দিক ও বিভাগ একে অপরের সাথে যুক্ত। এ সর্বাত্মক দর্শন, তার সকল খণ্ডিত অংশের ধারণা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক। গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে জানা যায় যে, ইসলাম মানব জীবনের সকল সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে তার সমাধান পেশ করে না। তার কোন খণ্ডিত অংশকে এমনভাবে স্বতন্ত্র ভিত্তির ওপর স্থাপন করে না, যাতে অন্যান্য ভিত্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম সে সবকেই এক কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপন করে এবং ব্যাপক খুঁটির চারপাশে আবর্তিত করায়। কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয় তার এসব জীবন সমস্যাকে একই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এ সম্পর্ক সর্বাবস্থায় অটুট থাকে। ইসলামের সকল বিষয় এবং আদেশ-নিষেধ মিলে সৃষ্টি হয় এক সর্বাত্মক ঐক্য। জীবন, জগত এবং মানুষ সম্পর্কে ইসলামের সর্বাত্মক দর্শন হচ্ছে এ ঐক্যের উৎস।

ইসলামে শান্তির প্রকৃতি এক বিশেষ ধারার অনুসারী। এ আলোচনা করার জন্যে ইসলামের ব্যাপক দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অপরিহার্য। কারণ কার্যত তা সে মূল থেকেই উৎসারিত আর সে কেন্দ্রবিন্দুতেই ফিরে যায়। এজন্যে ইসলামে শান্তির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে তার সর্বাত্মক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী। 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' গ্রন্থেও আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে 'ইসলামে সামাজিক সুবিচারের প্রকৃতি' সম্পর্কে অনেকাংশে আলোচনা করেছি।

এ বিশাল বিশ্বে ইসলাম এক মহান ঐক্যের ধর্ম। সৃষ্টিনিচয়ের ক্ষুদ্রাংশে একক অণু থেকে নিয়ে মুক্ত জীবনব্যাপী সবচেয়ে উন্নত শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র এ ঐক্য বর্তমান রয়েছে। জড় পদার্থ থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান উদ্ভিদ, চলনশীল প্রাণী অতঃপর বাকশক্তিশীল মানুষ পর্যন্ত সর্বত্র ঐক্য পাওয়া যায়। গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন থেকে শুরু করে চিন্তাধারা এবং প্রাণশক্তির বিবর্তণ পর্যন্ত সর্বত্র রয়েছে ঐক্য। সৃষ্টিকুলের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। গ্রহ-নক্ষত্রও খোদায়ী বিধানের অনুসারী। আত্মাও ছুটে যায়

মা'রিফাতের সন্ধানে। সৃষ্টি জগতের সকল শক্তির মধ্যেও ঐক্য দেখা যায়। বস্তুগত দেহে রয়েছে নানা প্রয়োজন, নানা চাহিদা। আর আত্মা বিভোর সুখ আহ্লাদের অন্বেষায়। সৃষ্টিকুলের সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল শ্রেণীর মধ্যে এবং সকল বংশধারায় রয়েছে ঐক্য। এক কথায়, এর সূচনা এবং সমাপ্তিতে, আসমান- যমীনে এবং দুনিয়া ও আখিরাতেও রয়েছে ঐক্যের কার্যকারিতা।

ইসলাম তার ঐক্যের সূচনা করে সৃষ্টিকর্তার একত্ব থেকে। অর্থাৎ এমন এক সত্তা থেকে, যাঁর মাধ্যমে জীবনের সূচনা হয় এবং পরিশেষে যাঁর নিকট ফিরে যেতে হয়ঃ

قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ ০ اَللهُ الصَّمَدُ ০ لَمْ يَلِدْ ০ وَلَمْ يُوْلَدْ ০ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ০

-বল, তিনি আল্লাহ্, একক। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। -সূরা ইখলাস

এমনিভাবে সে সৃষ্টি জগতের আদি উৎসের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের সকল কার্য-কারণকে চিরতরে নির্মূল করে এবং প্রকৃতির বিধানে সংঘাত ও বিপর্যয়ের সকল কার্য-কারণকে করে রহিত। এর কারণ এই যে, বিশ্বস্রষ্টার একত্ব বা তাওহীদ সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃংখলা এবং বিন্যাসে বহুত্বের ধারণা অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে তা সংঘাত এবং সংঘর্ষের সকল কারণও অস্বীকার করে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত ঘোষণার তাৎপর্যও তাইঃ

لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ج

- আসমান যমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ থাকত; তবে উভয়ই বিপর্যস্ত হতো।

-সূরা আম্বিয়া ঃ ২২

এ তাৎপর্যই ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط

-আল্লাহ কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাথে অন্য কোন মা'বুদও নেই, তা হলে প্রত্যেক মা'বুদ তার নিজের সৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতো আর একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতো। -সূরা মু'মিনূন ঃ ৯১

এই এক মা'বুদের ইচ্ছায়ই গোটা সৃষ্টি জগত একইভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে ঃ

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ০

-যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাঁর নির্দেশ হয়- 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। - সূরা ইয়াসীন : ৮২

সৃজনশীল ইচ্ছা এবং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অপর কোন মাধ্যম থাকে না। গোটা সৃষ্টিনিচয় একই স্রষ্টার দ্বারা যে উপায়ে অস্তিত্বলাভ করেছে, তা-ও এক। এতে কোন বহুত্ব নেই। কী সে ইচ্ছা? তা হচ্ছে বিমূর্ত ইচ্ছা, কুরআন যাকে 'কুন' (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে। কোন কিছু সৃষ্টির জন্যে কেবল এটুকুই যথেষ্ট যে, সে ইচ্ছা সে দিকে মনোনিবেশ করবে। 'কুন ফা-ইয়াকুন'- তিনি বলেন, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়। এমনিভাবে ইসলাম বিশ্ব সৃষ্টির কার্য-কারণ থেকে সকল মাধ্যম, সকল দ্বিত্ব এবং সকল বহুত্বকে অস্বীকার করেছে। সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই সংঘাত, সংঘর্ষ এবং প্রতিবন্ধকতার সকল ছায়াকে ইসলাম অপসারিত করেছে। ইসলাম বলে, অস্তিত্বের পথে সৃষ্টিনিচয়ের গতিকে স্বাধীনতা, সরলতা, আড়ম্বরহীনতা এবং নিয়ম-শৃংখলার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে :

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ٥ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ٥

-(তিনিই আল্লাহ) যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা দয়াময়ের সৃষ্টজগতে কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। একটু চক্ষু তুলে দেখ না, কোথাও কোন ত্রুটি তোমার নজরে পড়ে কি না? অতঃপর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তা ব্যর্থ-পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসবে। - সূরা মূল্‌ক : ৩-৪

সব কিছুর শাসন-কর্তৃত্ব এই এক ইলাহ'র হাতে নিবদ্ধ। গোটা সৃষ্টিনিচয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে, ঐক্যের বিচারেও আর একক ব্যক্তিগতভাবেও, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও, যাবতীয় কর্মকাণ্ড এবং সালাত-দু'আতেও, জীবনেও এবং মৃত্যুতেও। যেমনিভাবে তাঁর থেকেই সৃষ্টির সূচনা হয়েছে, তেমনিভাবে সমাপ্তিও হবে তাঁরই দিকে :

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ٥ نِ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

-সকল বরকত-মহিমা সে সুমহান সত্তার, সকল কর্তৃত্ব-আধিপত্য যাঁর হাতে নিবদ্ধ। আর তিনিই তো সকল বিষয়ে শক্তির একক অধিকারী। তিনি জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কাজের বিচারে কে সর্বোত্তম। -সূরা মূল্‌ক : ১-২

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط

-সাত আসমান-যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমুদয় বস্তুই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না সপ্রশংস চিত্তে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারছ না। -সূরা ইসরা : ৪৪

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلا لِيَعْبُدُوْنَ ٥ مَـــا اُرِيْــدُ مِنْـــهُمْ مِّـــنْ رِزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُاَنْ يُّطْعِمُوْنَ ٥

- আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট থেকে জীবিকার প্রত্যাশী নই, এ-ও আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাদ্য দান করবে। -সূরা যারিয়াত : ৫৬-৫৭

এমনিভাবে ইসলাম জীবন জগত এবং সৃষ্ট জীব সম্পর্কে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের গুমরাহীর ধারণা, অভীষ্টের দ্বৈততা এবং লক্ষ্যের সংঘাতকে অস্বীকার করে। ইসলাম এ সব কিছুকেই স্পষ্ট, ভারসাম্যপূর্ণ এবং এক সোজা-সরল পথে এনে দাঁড় করায়। এ পথই মনযিলে মকসূদে নিয়ে যায়। এটাই সকলের মনযিলে মকসূদ, সকলের লক্ষ্য-অভীষ্ট।

নানা উপাদান-উপকরণ, নানা আকার আকৃতি আর নানা রং-রূপের সমন্বয়ে গঠিত এ বিশ্ব জাহানের উৎসমূল এক ও অভিন্ন। এর প্রকৃতিও এক। এমন এক সময় ছিল, যখন এর উৎসমূল ছিল একীভূত। অতঃপর তার নানা অংশ নানাভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। অস্তিত্ব লাভ করে বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ :

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط

-কাফিররা কি দেখে না যে, আসমান-যমীন বিজড়িত ছিল। অতঃপর আমরাই বিদীর্ণ করে এদু'টোকে পৃথক করেছি। - সূরা আম্বিয়া : ৩০

এ বিশাল বিশ্ব একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তারই অনুগত। এ নিয়ম তার আবর্তনের শৃংখলা বিধান করে এবং তাকে সংঘাত ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। এ প্রাকৃতিক নিয়মই সৌরজগত এবং গ্রহ-নক্ষত্র জগতের তত্ত্বাবধান করে। নিরূপণ করে তাদের গতিপথ এবং কক্ষপথ :

وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ٥ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَآ اَنْ تُـــدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥

-আর সূর্য, সে তো তার নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে। এ-যে তাঁরই নির্ধারিত নিয়ম, যিনি পরম পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। আর চাঁদের জন্যেও আমরা নানা মনযিল নির্ধারণ করে দিয়েছি; এমন কি সে পুরাতন খেজুর শাখার মত অবস্থায় ফিরে যায়। সূর্যের সাধ্য নেই যে, চাঁদকে ধরতে পারে, আর রাতও

আসতে পারে না দিনের আগে। সকলেই তো আপন আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। - ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০
এমনিভাবে সে সৃষ্টি জগতের নানা অংশের সাথে সম্পর্কহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করে প্রমাণ করে যে, এসব অংশের মধ্যে রয়েছে ঐক্য এবং নিয়ম-শৃংখলা। বিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়মের দৃঢ়তা এবং আবর্তন ব্যবস্থায় এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যথারীতি বিদ্যমান।
এ বিশ্ব-জাহানে জীবনের উদ্দেশ্য রয়েছে। তা নিছক কোন দৈব ঘটনা নয়। বিশ্ব জাহানের সুদৃঢ় গঠন এবং প্রাকৃতিক নিয়মে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, তা জীবনের বিকাশ ঘটাবে, তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করবে এবং জীব-জগতের প্রয়োজন পূরণ করবে। অতঃপর জীবনকে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা করবে। যমীন সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যাক। আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا

-তিনি যমীনের বুকে স্থাপন করেছেন বিশাল পর্বতমালা, তাতে নিহিত রেখেছেন বরকত এবং জীবন-জীবিকার রকমারী উপকরণ। - সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ ঃ ১০

وَاَلْقٰى فِيْ الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ –

-আর তিনি যমীনের বুকে স্থাপন করেছেন ভারী পর্বতমালা, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে একদিকে ঝুঁকে না পড়ে। -সূরা নাহ্‌ল ঃ ১৫

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَ نَامِ ٥ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ٥ وَالْحَبُّ ذُوْ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ٥

-আর পৃথিবীকে তো তিনিই সৃজন করেছেন মানবমন্ডলীর জন্যে। তাতে রয়েছে ফল-ফলারী, আরও রয়েছে খেজুর গাছ, যার খোসার ওপরে আবরণ থাকে। এমন শস্য, যাতে দানা জন্মায়, আর সুগন্ধ-সুন্দর ফুল। - সূরা আর-রাহমান ঃ ১০-১২

هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَا مْشَوْا فِيْ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهٖ

- তিনিই তো সে সুমহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই তো তোমরা এর পথে-প্রান্তরে চলাফেরা কর আর তাঁরই দেয়া জীবিকা তোমরা গ্রহণ কর। - সূরা মূল্‌ক ঃ ১৫

আর চিন্তা করে দেখ, আকাশের সুদৃঢ় গঠনে জীবনের চাহিদার প্রতি কিভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে ঃ

وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَا بِيْحَ وَحِفْظًا –

-আর আমরা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে উজ্জ্বল তারকারাজিতে সুশোভিত করেছি আর তার সংরক্ষণের কার্য-কারণও তাতে স্থাপন করেছি। -সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ ঃ ১২

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ –

-এবং তিনি আসমানকে সামাল দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশ ছাড়াই তা দুনিয়ার ওপর পড়ে না যায়। -সূরা হজ্জ ঃ ৬৫

আসমান-যমীনের মধ্যখানে যে হাওয়া জীবন এবং প্রাণীকুলের সেবায় নিয়োজিত, তাও তো সৃজন ও স্থাপন করেছেন তিনিই ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ – فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

-তিনিই তো আল্লাহ, যিনি হাওয়া প্রবাহিত করেন, অতঃপর তা মেঘমালা ছড়িয়ে দেয়, আর তিনিই আসমানের বুকে তা বিস্তৃত করেন যেমন খুশী, যেভাবে খুশী। আর তাকে করেন টুকরো টুকরো, অতঃপর আপনি (হে নবী!) দেখতে পান, সে মেঘমালার ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী, যখন তা পৌঁছে দেন, তখন তারা কতই না উৎফুল্ল হয়! - সূরা আর-রূম ঃ ৪৮

আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে বিশ্ব প্রকৃতি এবং জীবনের সাধারণ প্রকৃতিতে সহযোগিতা সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করেন, বিদূরীত করেন সংঘাত আর সংঘর্ষের ধারণা, যেমনভাবে বিশ্ব সৃষ্টির গঠন প্রণালীতে লক্ষ্য নিরূপণের সূচনা নির্ণয় করেন এবং নিয়ম-শৃংখলাবিহীন দৈবাৎ ঘটনাচক্রের কথা অস্বীকার করেন।

বিশ্বের বুকে বিচরণশীল প্রাণীকুল একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত আর তার সকল আকার-আকৃতিও একই ধাতুমূলের সমন্বয়ে গঠিত। সে মূল ধাতু হচ্ছে পানি-যা সকল প্রাণীর উৎস ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ –

-এবং আমরা পানি থেকেই সকল জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি। - সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩০

আর প্রাণীকুলের মধ্যেও উন্নত শ্রেণী একটি বৈশিষ্ট্যে- জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টিতে-সম অংশীদার।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

-তিনিই তো পবিত্র মহান সত্তা, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু মাটিতে জন্মায়, আর তাদের নিজেদের মধ্য থেকেও, আর তারা যা কিছু মোটেই জানে না- এমন সব জিনিসের মধ্য থেকেও। সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَجًا وَّمِنَ الانعَـــامِ اَزْوَاجًا –

-তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্য থেকেও জোড়া পয়দা করেছেন। -সূরা আশ্-শূরা ঃ ১১

আর এসব প্রাণীকুল একই ধরনের সামাজিক সংগঠনে অংশীদার ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ وَلاَطَٰئِرٍ يَطِيْرِ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَا لَكُمْ –

-পৃথিবীতে বিচরণশীল যত জন্তু-জানোয়ার আছে, আর পাখাদ্বারা উড়ে এমন যত পাখী রয়েছে, এরা সবই তোমাদের অনুরূপ দল ছাড়া কিছুই নয়। -সূরা আল-আন'আম ঃ ৩৮

এমনিভাবে স্থাপিত হয় পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল সকল প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক, আর এরা সবাই মিলে পরিণত হয় একই পরিবারে। এ পরিবারের উদ্ভব একই মূল থেকে। যেন উন্নত স্তরের প্রাণীর মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় ঐক্য, নৈকট্য, আত্মীয়তা। আর মানুষ হচ্ছে প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ আদর্শ, বিশ্ব-জাহানের আদি উপাদান থেকে তার সৃষ্টি। এ উপাদানের সাথে তার সম্পর্ক অতিশয় গভীরঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ج

-সন্দেহ নেই, আমরা মানুষকে কাদা-মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। -সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১২

অতঃপর মানব গোষ্ঠীর সদস্যবর্গ তাদের মৌলিক ঐক্যের কারণে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। মূলের সাথে সকলের সম্পর্ক এক সমান। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

انتم بنو ادم وادم من تراب –

-তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী। -মুসলিম, আবু দাউদ

মানব গোষ্ঠীর সকল সদস্য একই প্রাণী থেকে সৃষ্টি। এ প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তার জোড়া। আর এতদোভয় থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছ অন্য সব মানুষ ঃ

يٰاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًاكَثِيْرًا وَّنِسَاءً –

-মানবমন্ডলী! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, আর এ উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ। -সূরা আন্-নিসা ঃ ১

পারস্পারিক পরিচিতি আর প্রীতি-ভালবাসার জন্যেই এ সবের সৃষ্টি; অনৈক্য এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে নয় ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

-মানবমন্ডলী! আমরা তোমাদেরকে এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন দল-গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। - সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩

এমনিভাবে প্রকৃতি, ভিত্তি এবং বিকাশে মানবীয় ঐক্য স-প্রমাণ করে পৃথক পৃথক দল-গোত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করত: বংশ-গোত্রের বিরোধের সকল কার্য-কারণ অপসারণ করা হয়েছে। স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, বংশ-গোত্রে বিভক্তি পারস্পারিক পরিচিতি ও সম্প্রীতির জন্যে; অনৈক্য ও বিভেদের জন্যে নয়।

এক আল্লাহ একই মানবতার নিকট পয়গাম প্রেরণ করেছেন। এ পয়গামে ঈমান আনয়নকারী সকলে একই উম্মত ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنَ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ –

-আল্লাহ তোমাদের জন্যে দীন নির্ধারণ করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন নূহ (আঃ)-কে আর (হে নবী!) তা-ই তোমার প্রতি ওহী করেছি, আর তারই হুকুম দিয়েছি ইবরাহীম (আঃ)-কে, মূসা (আঃ)-কে। (নির্দেশটি এই) যে, তোমরা সকলে দীন কায়েম কর, তাতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করো না। -সূরা আশ্-শূরা ঃ ১৩

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ٥

-তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তা মেনে নিয়েছি। ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব (আলাইহিমুস-সালাম) এবং তাঁদের বংশধারায় যে দীন নাযিল করা হয়েছে, আমরা তা মেনে নিয়েছি। মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীর প্রতি তাঁদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে বিধান প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাদের কারুর মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি অনুগত। -সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৬

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم ٥ وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ٥

-রাসূলগণ! তোমরা পাক-পবিত্র বস্তু খাবে এবং সৎকর্ম করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত রয়েছি। সন্দেহ নেই, তোমাদের এই দল একই দল আর আমি তোমাদের রব্ব। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করবে। -সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ৫১-৫২

এমনিভাবে ইসলাম সকল ধর্মীয় বিরোধের কার্য-কারণ দূরীভূত করেছে এ বক্তব্য দিয়ে যে, সব দীনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর তা হচ্ছে এক দীন। ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে এই যে, কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে কেবল তাঁর সামনেই মাথা নত করতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত হচ্ছে নিঃশর্ত। কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই সকল ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত।

এ মহাঐক্যের ধারণা বদ্ধমূল করার জন্যে ইসলাম আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলাম এ ঐক্যকে অন্তরের গভীরে, দেহ-প্রাণের এবং আত্মার আশা-আকাংখায় প্রবেশ করায়। মানব-জীবনের সকল প্রান্তে এবং সকল দিকে ইসলাম তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু এসব এমন বিষয়, যা বিস্তারিত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। 'ইসলামে শান্তির প্রকৃতি' আলোচনা করার জন্যে ভূমিকা হিসেবে কেবল এটুকুই যথেষ্ট।

সৃষ্টিনিচয়ের প্রকৃতি, জীবনের প্রাকৃতিক বিধান এবং ইসলামের মূল ভিত্তিতে যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য প্রমাণ করা হয়েছে, তা থেকেই গড়ে ওঠে ইসলামে শান্তির প্রকৃতি। এক গভীর শিকড়ের সাথে এ প্রকৃতির সংযোগ। তদনুযায়ী শান্তি একটা স্থায়ী এবং মৌলিক বিধান। যুদ্ধ হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম। এর দাবি হচ্ছে প্রকৃতির বিধান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যের সাথে অবিচার ও বিদ্রোহ করে বাইরে বেরিয়ে আসা। যখন যুলুম-অবিচার দেখা দেয়, প্রকৃতির বিধানে দেখা দেয় প্রতিবন্ধকতা এবং সৃষ্টি হয় বিপর্যয়, তখন যুদ্ধ (যা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তাকে নিশ্চিহ্ন করে নব পর্যায়ে স্বতন্ত্র আইন-শৃংখলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে)।

এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে যেসব কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, ইসলাম শুরু থেকেই সেসব কার্যকারণ রহিত করেছে। যুদ্ধের বহুবিধ ধরন, কার্যকারণ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম তাকে প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছে। যেমনঃ

বংশ-গোত্রের আভিজাত্য যেসব যুদ্ধের সৃষ্টি করে, ইসলাম তার পথ রোধ করে। কারণ ইসলামে বংশ-গোত্রের আভিজাত্যের কোন অবকাশ নেই। ইসলামের মতে সকল মানুষের মূল এক। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে এই যে, এক প্রাণ থেকেই সকল মানুষের সৃষ্টি এবং তাদের বংশ-গোত্র নিছক পরিচয়ের জন্যেই।

ক্রুসেডার এবং অ-ক্রুসেডার সংকীর্ণমনা ব্যক্তিরা যে সীমিত অর্থে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বকে গ্রহণ করে থাকে, ইসলাম তার ছড়ানো যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। ইসলামে সে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ

নেই, যার অর্থ হচ্ছে অপরের ধর্মকে ঘৃণা করা, তার মৌল বিষয় না জেনে কেবল তাকে অস্বীকার করা। ইসলাম বলে, আল্লাহর দীন এক। সকল ঈমানদার এক উম্মত। তারা সকলে ইসলামের অনুসারী। ইসলাম অর্থ আল্লাহর সম্মুখে সর্বতোভাবে অবনত হওয়া এবং কাউকে তাঁর শরীক না করে তাঁর ইবাদত করা। সাথে সাথে ইসলাম এ নির্দেশও দেয় ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -ধর্মে কোন জবরদস্তী নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভিন্নমতের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় যেন সীমালংঘন করা না হয় ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ -

-আহলি কিতাব এবং মুশরিকদের বল, তোমরা কি ঈমান এনেছ? সুতরাং তারা যদি ঈমান এনে থাকে তবে হিদায়াত লাভ করেছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার কাজ হচ্ছে কেবল পয়গাম পৌঁছে দেয়া। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ২০

কিতাবধারীরা যতক্ষণ আল্লাহর সাথে কুফরীর আচরণ না করে এবং আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল না করে, ততক্ষণ তাদের সাথে ব্যাপক যুদ্ধ করা যাবে না ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ٥

-কিতাবধারীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ এবং রাসূলের হারাম করা জিনিসকে হারাম করে না এবং সত্য দীনের অনুগত হয় না, তারা যতক্ষণ না অবনত হয়ে জিযিয়া আদায় করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও। -সূরা আত্-তাওবা ঃ ২৯

ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করা এবং বস্তুগত স্বার্থে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হয়ে থাকে, ইসলাম তারও বিরোধী। উপনিবেশ সৃষ্টি, শোষণ, বাণিজ্যিক বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল লাভ করার জন্যে যুদ্ধকেও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। অপরের শ্রম, জীবন-জীবিকার উপকরণ এবং অন্য মানুষকে দাসে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ইসলাম। ইসলামের মতে মানবতা হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতার একটা ভিত্তি। সুতরাং সেখানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন অবকাশ নেই। ইসলাম বিশ্ব-জাহানের সকল জীবন্ত বস্তুকে মনে করে নিকটতম পরিবারের সদস্য। বরং সে মনে করে গোটা দুনিয়ায় একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কার্যকর। ইসলাম নেক এবং তাকওয়ার কাজে একে অপরের

সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয় এবং পাপ ও যুল্‌মের কাজে সহযোগিতা করতে বারণ করে। লুট-তরাজ, ছিনতাই-রাহাজানী-হত্যাকে সে হারাম করে। সে গোটা মানবতার সাথে ওয়াদা করে সার্বিক সুবিচারের। ইসলামের মতে বংশ-ধর্ম-গোত্রের বিভেদ এবং ধর্মের অনৈক্য আল্লাহর সুবিচার থেকে উপকৃত হওয়ার পথে আদৌ প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

রাজা -বাদশাহ এবং জাতীয় বিরোধের মিথ্যা অহমিকায় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং রাজা-বাদশাহদের অধিকারের মোহে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহের সূচনা হয়, ইসলাম তাকেও প্রত্যাখ্যান করে। একব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ

-কেউ গনীমতের মাল লাভ করার জন্যে যুদ্ধ করে, কেউ নামের জন্যে যুদ্ধ করে, আর কেউ যুদ্ধ করে বীর-বাহাদুর বলে অভিহিত-পরিচিত হওয়ার জন্য। বলুন, এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله –

- যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। -পাঁচটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ

এখান থেকে আমরা সে একটি মাত্র আইনসিদ্ধ যুদ্ধের পরিচয় পাই- ইসলাম যাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত সুস্পষ্ট বাণী ঃ

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا –

- যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে লড়াই করে, কেবল সে-ই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

এখন দেখতে হবে, যে কালিমাতুল্লাহর (আল্লাহর বাণীর) খাতিরে যুদ্ধকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াইকারী ব্যক্তি বলে অভিহিত হয়, তা কি জিনিস?

কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী মূলত আল্লাহর অভিপ্রায়ের অপর নাম। আর মানুষের জন্যে তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্ট ও ব্যক্ত, তা হচ্ছে জীবন-জগত এবং মানুষের জন্য তাঁর দেয়া প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল বস্তু। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, সৃষ্টিকুলের প্রাকৃতিক-সামাজিক, নিয়ম-শৃংখলা এবং মানব জীবনে পারস্পারিক সহযোগিতা-এ সবই আল্লাহর বিধান বলে অভিহিত। আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনে এসব কার্যকর রাখতে চান। বিশ্ব জাহানের এসব সামঞ্জস্যই বিকৃতি এবং অস্থিরতা দূর করে আর সকল যুগে মানবতার জন্যে জীবনে স্থায়ী উন্নতি-অগ্রগতির এবং গণকল্যাণের স্বার্থে সহযোগিতা-সহমর্মিতা সৃষ্টি করেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ –

- কল্যাণ এবং আল্লাহ্-ভীতির কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো, গুনাহ আর সীমালংঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না। - সূরা আল-মায়িদা ঃ ২

গোটা মানবতার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব। তাই আল্লাহ্র বাণী প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের আনীত মহাকল্যাণ সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের ও সে মহাকল্যাণের মধ্যস্থলে কোন অন্তরায় স্বীকার না করা। এমন কি যে ব্যক্তি মানুষের নিকট এ মহাকল্যাণ পৌছানোর কাজে প্রতিবন্ধক হবে, ক্ষমতার জোরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, বস্তুত সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র বাণীর প্রতি অবিচারী বলে প্রতিপন্ন হবে। এমন ব্যক্তিকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই হবে সত্যিকার অর্থে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহ্র বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা এজন্যে নয় যে, জোর করে মানুষের ওপর ইসলামকে চাপিয়ে দিতে হবে; বরং এ জন্যে যে, তারা যাতে জ্ঞানের স্বাধীনতা এবং হিদায়াতের ইখতিয়ার লাভ করতে পারে। ইসলাম কবুল করতে সে কাউকে বাধ্য করে না, কিন্তু যারা তার পথে অন্তরায় হয়, মানুষকে সে দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়, ইসলাম তাকে অত্যন্ত না-পছন্দ করে ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ –

- আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না বিপর্যয় দূর হয়ে আল্লাহ্র পূর্ণ দীন কায়েম হয়ে যায়। - সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯

ইসলামে যে সব যুদ্ধকে বৈধ প্রতিপন্ন করা হয়েছে, এটা হচ্ছে তার অন্যতম। ইসলাম সে জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট দাবি করেছেন ঈমানদারকে এ জন্যে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করতে। যারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন; আর তাদের সাথে ওয়াদা করেন স্বীয় সন্তুষ্টির উচ্চাসনে আসীন করার।

গোটা বিশ্বে সুবিচার আর ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম চায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে। সকল প্রকার ইনসাফ কায়েম করা তার অভীষ্ট লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম চায় সামাজিক সুবিচার, শাসনতান্ত্রিক সুবিচার এবং রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে। যে ব্যক্তি যুলুম-বিদ্রোহ করে, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির দাবি থেকে দূরে সরে যায়, সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র বাণীর বিরোধী। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্যে যুদ্ধ করা, তা থেকে বিমুখ লোকদের সে দিকে ফিরিয়ে আনা। যদি এ জন্যে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে তরবারিও ধারণ করতে হয়।

সুতরাং নিঃশর্ত সুবিচার কায়েম করা এবং বিদ্রোহ-বাড়াবাড়ি দূর করাই হচ্ছে কালিমাতুল্লাহ, সর্বাবস্থায় এবং সর্বত্র যাকে সমুন্নত রাখা অপরিহার্য ঃ

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ ج فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥

- আর ঈমানদারদের দু'টি দল যদি পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে। এরপরও যদি একদল অন্য দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। সে যদি ফিরে আসে, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে সন্ধি স্থাপন করে দাও। আর তোমরা ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। -সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৯

বিদ্রোহ নির্মূল করে ইসলাম কায়েম করার খাতিরে ইসলাম বিদ্রোহী মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি যেহেতু আহ্‌বান জানায়, সেহেতু এ কথা ভালভাবেই প্রমানিত হয় যে, ইসলাম তাদেরকে যুলম নির্মূলের দীক্ষা দেয়, সে যুলুম যেখানেই হোক না কেন। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদেরকে যুলম থেকে বিরত রাখবে। আর যে মযলুম ব্যক্তি নিজে যুলম প্রতিরোধ করতে পারে না, তার থেকেও যুলুম দূর করবে।

ইসলাম যুলুমের এতটা বিরোধী যে, যুলুম দূর করার জন্যেও সে যুলুমের অনুমতি দেয় না ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ –

- যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তোমরাও তাদের সাথে লড়াই কর। কিন্তু ইনসাফের সীমালংঘন কর না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। - সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯০

وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ٥

-আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না? আর সে সব দুর্বল নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্যে তোমরা লড়াই করছ না, যারা এই ফরিয়াদ করে যে, পরওয়ারদিগার! আমাদের সে জনপদ থেকে বের করে আনো, যার অধিবাসীরা যালিম। আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু এবং সাহায্যকারী প্রেরণ করো। - সূরা আন্-নিসা ঃ৭৫

ইসলাম কেবল এসব মহান উদ্দেশ্যের জন্যে তরবারি ধারণ করে, জিহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আর মুজাহিদদের জন্য শাহাদাত এবং প্রতিদানের উচ্চ মর্যাদার ওয়াদা করে ঃ

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِىْ التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط

-নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন। (কারণ) নিঃসন্দেহে তারা জান্নাত লাভ করবে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআনে আল্লাহর যিম্মা এ সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে। - সূরা আত্-তাওবা ঃ ১১১

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

- যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা কখনো তাদেরকে মৃত ভাববে না; বরং তারা তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট জীবিত। তারা রিযিকও পায়। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর যে ফযল দান করেছেন, তাতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত। আর যারা এখনও তাদের কাছে পৌঁছেনি, তারা তাদের সম্পর্কে এ কথা জেনে সুসংবাদ লাভ করে যে, তাদের জন্যে কোন ভয় নেই এবং তাদেরকে চিন্তিতও হতে হবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর অনুগ্রহে খুশী হয়। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না-এটা জেনে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

কেবল এসব উন্নত উদ্দেশ্যের নিমিত্ত ইসলাম ঈমানদারকে সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়। ইসলাম বলে মু'মিন যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতার কারণে সে যেন দুশমনের দ্বারে সস্তা সন্ধির জন্যে কড়া না নাড়ে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

- আর তোমরা তাদের সাথে মুকাবিলার জন্যে সকল প্রকার শক্তি এবং শিক্ষিত ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত থাকবে, তা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীতি প্রদর্শন করবে। - সূরা আল-আনফাল ঃ ৬০

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ٥

-আর তোমরা হতোদ্যম হয়ো না এবং দুর্বলতার কারণে দুশমনকে আহ্বান করো না সন্ধির জন্যে। তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহ তো তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি কখনো তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন না। -সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৫

স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করা এমন এক উদ্দেশ্যে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ইসলামী চিন্তাধারার অন্যতম ভিত্তি। ইসলাম বিশ্ববাসীর নিকট আল্লাহর শেষ পয়গাম। মহান আল্লাহ মানুষকে যে আকীদা দান করতে চেয়েছেন, ইসলাম হচ্ছে তার সর্বশেষ রূপ। এ দীনের মৌলিক শিক্ষা নিয়েই সকল নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –

-নিঃসন্দেহে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। - আলে-ইমরান ঃ ১৯

সকল নবী আগমন করেছেন মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার জন্যে। কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না এবং কোন প্রকার দ্বিধাগ্রস্ততা এবং দোদুল্যপনা ছাড়াই কেবল এক আল্লাহ্র আনুগত্য করবে। সবশেষে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দীন পেশ করেছেন ঃ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ –

-তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা নিরূপণকারী এবং তার মৌলিক শিক্ষার হিফাযতকারী। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪৮

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ শেষ রিসালাত গোটা মানবসত্তার প্রাণশক্তি এবং তার গোটা জীবনের জন্যে আল্লাহর ওসীয়ত। ওয়াসী, যিনি ওসীয়ত করেন- তাঁর নিকট অতটা ক্ষমতা থাকা দরকার, যদ্বারা তিনি ওসীয়ত জারী করতে পারেন। এ জারী ভয়-ভীতি দ্বারা নয়; বরং সম্মান ও সম্ভ্রমের পথে হতে হবে। যাই হোক, মানুষ তো মানুষই। আইন-বিধান মেনে চলার স্বপক্ষে কোন সুদৃঢ় সহায়তা লাভ না করলে তাদের বিভ্রান্ত হওয়া মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। তাই এমন একটা শক্তি অপরিহার্য, যার খবরদারীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, যদিও কার্যত তার হাত তাদের নাগাল পাবে না। যে নির্দেশের পেছনে শক্তি থাকে না, তা কেউ মানে না। আর দুর্বল কল্যাণের পরোয়া করে না কেউ, এ কথা কে না জানে?

এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি সঞ্চয় করা ওয়াজিব, অপরিহার্য কর্তব্য। এটা এমন এক কর্তব্য, যাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হতে হবে, যাতে সত্যবিমুখ লোকদের ফিরিয়ে আনতে পারে, বিদ্রোহ এবং বাড়াবাড়ি থেকে বিদ্রোহীদের নিবৃত্ত করতে পারে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের যোগ্য

ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সংহত করতে পারে, আর অপমান-লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে পারে আল্লাহর বাণীকে।

কিন্তু যখন চিত্ত ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন জোর করে মানুষকে আল্লাহর বাণী থেকে ফেরানো যাবে না; তাদের পছন্দ করা দ্বীন থেকে তাদেরকে অপসারণ করা যাবে না। আর যখন সুস্পষ্ট সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন কেউ কারো প্রতি যুলুম-সিতম করবে না; এক মানুষ অন্য মানুষকে গোলামে পরিণত করবে না। যেসব দুর্বল ব্যক্তির নিজেদের প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই, তারাও যদি সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করে, বিদ্রোহী যখন বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সৎ জীবন যাপন করে, এরূপ অবস্থায়ও ইসলাম- যার নিকট পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্যে পূর্ণ শক্তি সংগৃহীত থাকবে, যুদ্ধকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করে এবং তাৎক্ষণিক সন্ধি ও শান্তির আহ্বান জানায় ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ٥

-আর তারা যদি সন্ধির জন্য ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। -সূরা আল-আনফাল ঃ ৬১

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ٥

-আর যদি দুশমন তোমাদের থেকে একদিকে সরে যায়, মানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং সন্ধির পয়গাম পাঠায়, তবে তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করার জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দেন না। -সূরা আন্-নিসা ঃ ৯০

এ হচ্ছে ইসলামের শান্তি দর্শনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি-নিরাপত্তা হচ্ছে মৌলিক বিষয়, আর যুদ্ধ হচ্ছে এক অপরিহার্য প্রয়োজন। এ প্রয়োজন হচ্ছে কেবল মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে। ইসলাম কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির কল্যাণ প্রয়াসী নয়। যে সব মৌলিক মানবিক মূল্যবোধকে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনের লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন, তা প্রতিষ্ঠার জন্যেই এ প্রয়োজন। মানুষকে অন্যায় বল প্রয়োগ, ভয়-ভীতি এবং যুলুম-অবিচার থেকে রক্ষা করার জন্যে এ প্রয়োজন। পৃথিবীতে নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে এ প্রয়োজন। যখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়, তখনই সমুন্নত হয় আল্লাহর বাণী।

এসব মৌলিক চিন্তাধারা ইসলামের ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ করে। কারণ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন গোটা মানবতার নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌছাবার জন্যে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا –

-এবং আমরা তোমাকে সকল মানুষের জন্যে বাশীর ও নাযীর (সুসংবাদদাতা এবং ভয়-প্রদর্শনকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছি। -সূরা সাবা ঃ ২৮

তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল একান্ত নিষ্ঠার সাথে কোন বিনিময় এবং প্রতিদান ছাড়াই আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যেঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٥ قُمْ فَانْذِرْ ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٥ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٥ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ٥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٥

- হে কম্বলদ্বারা আবৃতকারী! ওঠ এবং ভয় দেখাও। তোমার পরওয়ারদিগারের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখ, সকল প্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত থাক, আর বেশী লাভ করার জন্যে খোঁটা দেবে না এবং কেবল তোমার পরওয়ারদিগারের জন্যে ধৈর্য ধারণ কর। - সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ১-৭

তাঁকে বলা হয়েছে, সত্যের দাওয়াত পেশ করার জন্যে উত্তম উপায়ে আলোচনা করতে, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে শান্ত করতে, ভাল কাজের আদেশ করতে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে এবং কঠোরতা-পাষাণতা থেকে বিরত থাকতেঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

- তোমার পরওয়ারদিগারের পথে আহ্বান জানাবে প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করবে। - সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৫

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ٥

-আর তুমি তাদের প্রতি কঠোর নও। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দান কর, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে। -সূরা ক্বাফ ঃ ৪৫

এমনিভাবে এ ভিত্তিতে দাওয়াত চলতে থাকে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের নিকট থেকে কেবল এটুকুই আশা করতেন যে, তারা তাঁর কথায় কান দেবে। ঈমানের জন্যে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে এলে তারা ঈমান আনবে, আর তা কঠোর হয়ে এলে তাতে গুমরাহীর মরিচা পড়লে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা হয়।

কিন্তু আফসোস! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন লোকদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিলেন, লোকেরা তাঁকে তেমনভাবে শান্তিতে থাকতে দেয়নি, তেমন আচরণ করেনি তারা তাঁর সাথে। তারা শান্তি-নিরাপত্তার এ দাওয়াতের পথে বাধা দেয়। মানসিক শান্তি নিয়ে এ দাওয়াতের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, বিরোধীরা তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নেয় এবং তাদের বাড়ী-ঘর, পুত্র-কন্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বের করে দেয়। অতঃপর তারা যেখানেই চোখে পড়ে, তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এ দাওয়াত এবং তা শ্রবণকারী কর্ণের মধ্যখানে তারা অন্ধ-বধির বস্তুগত শক্তি নিয়ে দাঁড়ায়। এ শক্তি ছিল সকল প্রকার যুক্তি-প্রমাণবিহীন।

ইসলাম এ সময় তার অন্যতম মৌলিক আকীদার প্রতিরোধের লক্ষ্যে তরবারী ধারণ করে। কি সে মৌলিক আকীদা? দাওয়াতের স্বাধীনতা আর বিশ্বাসের স্বাধীনতাঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُنِ ۙ o اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ o

- যেসব মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা হয়ে আসছে, এখন তাদের জন্যেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো; কারণ তারা মযলুম। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যাদের অন্যায়ভাবে তাদের বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ আমাদের রব- এছাড়া তাদের অন্য কোন অপরাধ ছিল না। আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে দিয়ে অপর দলকে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে যতসব মন্দির, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদ, যেখানে আল্লাহর নাম খুব বেশি স্মরণ করা হয়, এসব ধ্বংস হয়ে যেত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (দীনের) সাহায্য করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান। - সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩৯-৪০

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সন্ধিকামী ব্যক্তির সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপন করেছেন; আর যে কেউ সন্ধির প্রস্তাব করেছে, তিনি তা মেনে নিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে কেবল সেসব লোকের সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে; মুসলমানের দুশমনদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় করেছে। এসব সিলসিলার একটি ছিল বনূ কুরাইযার যুদ্ধ। এসব য়াহূদী খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহৈশ দলকে ক্ষিপ্ত করেছিল। আর প্রকাশ্যে সন্ধি ভঙ্গ করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম ছিল সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর এ নির্দেশ পালন ঃ

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ o اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ o فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

-যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আর কিছুতেই ঈমান আনবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। তুমি যাদের সাথে বারবার চুক্তি স্থাপন করেছ, কিন্তু এরা প্রতিবারই চুক্তি ভঙ্গ করেছে; আর (পরিণতি সম্পর্কে) তারা মোটেই ভীত নয়। তাই যুদ্ধে তোমরা তাদেরকে কাবু করতে পারলে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পশ্চাৎবর্তীরাও শিক্ষা গ্রহণ করে। -সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৫-৫৮

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কুরাইশের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তার চতুর্থ শর্ত ছিল এই ঃ

"যে কেউ এ চুক্তিতে কুরাইশের সাথে যোগ দেবে, তার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য; আর যে কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগ দেয়, সে-ও এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এ ভিত্তিতে বনু বকর সন্ধিপত্রে কুরাইশদের সাথে যোগ দেয় আর বনূ খুজা'আ যোগ দেয় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। জাহিলী যুগে বনু খুজা'আ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা জনাব আব্দুল মুত্তালিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। এখন তারা মহানবীর সাথে সন্ধিতে শামিল হয়ে পুরাতন চুক্তি নবায়ন করতে চায়। জনাব আব্দুল মুত্তালিবের সাথে বনু খুজা'আর যে চুক্তি ছিল, তাতে এ বাক্যাংশও অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ

"আব্দুল মুত্তালিব, তাঁর বংশধর এবং বনু খুজা'আর সদস্যরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতায় এক থাকবে। তাদের সাহায্য করা আব্দুল মুত্তালিবের কর্তব্য হবে। আর বনু খুজা'আর কর্তব্য হবে বনু আব্দুল মুত্তালিব, তার বংশধরদের সাহায্য করা। গোটা আরবের বিরুদ্ধে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যে, পাহাড়ে-প্রান্তরে এ সাহায্য হবে বাধ্যতামূলক।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এতে এমন দুটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেন, যাতে সাহায্য-সহযোগিতার পরিধি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। এটা করা হয়েছে এজন্যে, যাতে চুক্তিটি ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার সম্পূর্ণ উপযোগী হতে পারে। শর্ত দুটি ছিল এই ঃ

"বনু খুজা'আ যখন অত্যাচারের পক্ষাবলম্বন করবে, তখন তিনি তাদের সাহায্য করবেন না; কিন্তু তাদের প্রতি যুলুম করা হলে তাদের সাহায্য করা হবে তাঁর কর্তব্য।"

বনু খুজা'আ তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে চুক্তি করার সময় মযলুম অবস্থায় তাদের যাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ, ইসলাম যুলুমের যে কোন আকৃতি-প্রকৃতিকেই না-পছন্দ করে। যুলুম চাই মুসলমানদের ওপর হোক, কি অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর ওপর, সর্বাবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম। ইসলাম-পূর্ব যুগে 'হলফুর ফুযুল' নামে একটি চুক্তি হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم لو ادعی به فی الا سلام لاجبت -

-"আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন-এর গৃহে এমন এক চুক্তিতে আমি হাযির ছিলাম, এর বিনিময়ে লাল উট গ্রহণ করাও আমি পছন্দ করি না। ইসলামের আবির্ভাবের পরও যদি কেউ আমাকে সেদিকে আহ্বান জানায়, তাহলেও আমি সাড়া দেব।"

এ চুক্তি, যা ভঙ্গ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল কুজ-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ উষ্ট্র গ্রহণ করাও পছন্দ করতেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, কী এর তাৎপর্য? বস্তুত এটা ছিল এমন চুক্তি, যাতে শামিল ছিল এসব কাবীলা- বনু হাশিম, আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, আসাদ ইবনে আব্দুল উয্যা, যুহ্‌রা ইবনে কিলাব এবং তায়ম ইবনে মুররা। আর চুক্তিতে তারা কসম খেয়ে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা যুলুম-সিতম রুখবে, যালিমের নিকট থেকে মযলুমের হক আদায় করে নেবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও নবুয়ত লাভ করেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর।

মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামে বায়'আত করা কখনো ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা এবং ঐতিহাসিক সত্যতা- উভয় দিক থেকেই এ কথা প্রমাণিত। ইসলামের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত কোন ব্যক্তি দ্বারা ঘটনাক্রমে এ ধরনের কিছু সংঘটিত হয়ে থাকলে সেজন্যে ইসলাম দায়ী নয়। কারণ, এটা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং তার দুশমনরা তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারের যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলাম প্রচারে যুদ্ধ কখনো পথ প্রদর্শক বা মাধ্যম-উপলক্ষ ছিল না। এটা ইসলামের প্রকৃতির পরিপন্থী।

খ্যাতনামা প্রাচ্য বিশারদ স্যার টি.ভি. আর্নল্ড তাঁর Preaching of Islam (ইসলাম প্রচার) গ্রন্থে (আরবী তরজমা ঃ ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসান এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়, পৃ.৫১) উল্লেখ করেন ঃ

"হিজরী প্রথম শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আরব খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলিম বিজেতাদের উদার ব্যবহারের যে উদাহরণ আমরা একটু আগে উপস্থাপন করেছি, তা থেকে আমরা এ যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সেসব খ্রীষ্টান গোত্রের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তা করেছিল নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং মনস্তুষ্টিতে। আজও মুসলমানদের সাথে যেসব খ্রীষ্টান বসবাস করছে, তারা এ উদারতার জ্বলন্ত প্রমাণ।"

স্যার আর্নল্ড উক্ত গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেন ঃ

"খ্রীষ্টান আরব এবং মুসলমানদের মধ্যে ভালবাসা-সহমর্মিতার যেসব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তার আলোকে এ সমাধানে পৌঁছা সহজ হয় যে, জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ এবং পীড়াপীড়ি কোন চূড়ান্ত কার্য-কারণ ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কোন কোন গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করেছেন। তাদের সাহায্য-সহায়তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন আর তাদেরকে দিয়েছেন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা। তিনি গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের অধিকার বহাল রাখেন। এমন ধরনের একটা চুক্তি দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী এবং তাদের অংশীবাদী স্বদেশবাসীর মধ্যেও, যাদের প্রাচীন ধর্ম ছিল প্রতিমা পূজা।"

এসব দৃষ্টান্ত এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দুশমনদের দাবি মিথ্যা। এ থেকে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইসলামের যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান করার

এসব দৃষ্টান্ত এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দুশমনদের দাবি মিথ্যা। এ থেকে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইসলামের যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান করার নিমিত্তে ছিল না। নয়া উপনিবেশবাদ কায়েম করা, শোষণ করা এবং মানুষকে অপমান-অপদস্থ করাও এ সবের উদ্দেশ্য ছিল না। এসব ছিল কেবল এজন্যে যে, ইসলাম মানুষের জন্যে যে কল্যাণ বয়ে এনেছে, তাদের সন্তুষ্টি নিয়ে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তা পেশ করে বিশ্বের বুকে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা।

ইসলাম যে ময়দানে কাজ করে, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ কিছুটা আলোকপাত না করলে ইসলামে শান্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জীবন দর্শন সম্পর্কে ইসলাম তার সর্বাত্মক প্রকৃতির কারণে শান্তি-নিরাপত্তাকে বিভক্ত করে না, যাতে জীবনের অনেক বিভাগের মধ্য থেকে কোন একটি বিভাগে আহ্বান জানিয়ে সে খামুশ হয়ে যাবে। ইসলাম শান্তিকে একটি ইউনিট মনে করে জীবনের সকল বিভাগে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। আর জগত, জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে তার ব্যাপক দর্শনের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করে।এমনিভাবে অধুনা দেশে দেশে প্রচলিত শান্তি-নিরাপত্তা থেকে ইসলামী অর্থে শব্দটি লাভ করে আরও ব্যাপকতা, গভীরতা। ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি-নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে এমন এক বাস্তব সত্য তত্ত্ব, যা বিশ্বের বুকে আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষের জন্যে সুবিচার, ন্যায়নীতি এবং শান্তি বিস্তার করে। এর অর্থ যে কোন মূল্যে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা নয়, তা বিশ্ব যতই যুলম-নির্যাতন আর ফাসাদ-বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ হোক না কেন।

আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত-সমুন্নত করার জন্যে ইসলাম যখন তার উন্নত আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী পরিপূর্ণ শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে, তখন সে আন্তর্জাতিক শান্তি দিয়েই সূচনা করে না। কারণ এ যে সফরের শেষ পর্যায়, সূচনা পর্ব নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি জিঞ্জিরের অনেক কড়ার শেষ কড়া। এর আগে আরও অনেক কড়া রয়েছে।

ইসলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তির মনে শান্তির বীজ উপ্ত করে। অতঃপর পরিবার পর্যায়ে, এরপর জাতীয় জীবনে এবং সবশেষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা স্থাপন করে। একেবারে সূচনাতে ইসলাম ব্যক্তি এবং তার পরওয়ারদিগারের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। স্বয়ং ব্যক্তির সাথে আচরণে এবং ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর সে একই দলের বিভিন্ন উপদলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি বিস্তার করে, শান্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক। এতটুকু পা বাড়াবার পর সে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি-নিরাপত্তা স্থাপন করে।

এ শেষ মনযিল পর্যন্ত পৌছার জন্যে ইসলাম এক দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে। এ পথে মনের শান্তি থেকে ঘরের শান্তি পর্যন্ত, অতঃপর সমাজের শান্তি এবং সবশেষে সারা বিশ্বে শান্তির মনযিল পর্যন্ত সে পরিক্রম করে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা শান্তির অন্বেষায় ইসলামের অনুগমন করব।

প্রথম অধ্যায়

মনের শান্তি

ব্যক্তি-মন যেখানে শান্তি উপভোগ করতে পারে না, সেখানে কোন শান্তি নেই। শান্তি সম্পর্কে এটাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম যখন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন সে সর্বপ্রথম মনের গভীরে তা কায়েম করতে চায়।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি একটা বুনিয়াদী স্থান দখল করে আছে। সমষ্টির ইমারতে ব্যক্তির ভূমিকা হচ্ছে প্রথম ইঁটের মত। আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম বীজ উপ্ত হয় ব্যক্তি-মনেই। অতঃপর এ গোপন বিশ্বাস মানব-কর্মে এক সর্বাত্মক সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। বরং বলা চলে, স্বয়ং ব্যক্তি-সত্তা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দেয়।

ইসলাম ব্যক্তি-মনে শান্তির বীজ বপন করে। এ হচ্ছে এক ইতিবাচক শান্তি, যা জীবনকে করে সরফরাজ, তাকে করে বিকশিত। এটা কোন নেতিবাচক শান্তি নয়, যা সব কিছুতেই তুষ্ট থাকে, যা শান্তি ও মুক্তির পথে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য জলাঞ্জলী দেয়াকে মেনে নেয়। এ শান্তি উৎসারিত হয় সামঞ্জস্য আর ভারসাম্য থেকে। স্বাধীনতা আর নিয়ম-শৃংখলা দ্বারা তা গঠিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাধীনতা এবং সুস্থ মৌলিক শক্তিকে কর্মমুখী করার মাধ্যমে তার সৃষ্টি। আবেগ-অনুভূতি আর কামনা-বাসনার সুবিন্যাসের ফলে এর অস্তিত্ব লাভ; জোর-জবরদস্তী, বলপ্রয়োগ, ছল-চাতুরী আর কলা-কৌশলের ফলে নয়। এ শান্তি ব্যক্তির অস্তিত্ব, তার আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাংখার মর্যাদা দেয়, সাথে সাথে সমষ্টির অস্তিত্ব, সুযোগ-সুবিধা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকেও স্বীকার করে। এটা মানবতা, তার নানাবিধ প্রয়োজন এবং আশা-আকাংখার সম্মান করে। ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা এবং মানবীয় মূল্যবোধের মর্যাদা দেয়। আর এ সবই করে ভারসাম্য আর সামঞ্জস্য বজায় রেখে।

কথা ও আকীদা

ইসলাম একেবারে সূচনা-পর্ব থেকেই মানুষের কথা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক স্থাপন করে। কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলাম একটা মুক্ত-স্পষ্ট আকীদা, যাতে কোন জটিলতা নেই, নেই কোন গোলক-ধাঁধাঁ। কী এ সাদাসিধা আকীদা? তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র মা'বুদ। কোন বস্তুই তাঁর মত নয়। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। ওহীর মাধ্যমে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মানুষকে পথ দেখাতে। তিনি এক আল্লাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ তিনের মধ্যে এক বা একের ভিতর তিন নন। তিনি পিতাও নন, পুত্রও নন। এমনও নয় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে আল্লাহ্ আর অপর দিকে মানুষ। আর এ-ও নয় যে, তিনি যমীনে পয়গাম্বর আর আসমানে রব। তিনি কেবল মানুষ এবং রাসূল।

ইসলামে কোন দুর্বোধ্য জটিল গ্রন্থি নেই- যার সাথে বুদ্ধিবৃত্তির কোন সংযোগ নেই, যা মানুষের কথাবার্তাকে অবাক-বিস্ময়ে ফেলে, আর তার মনকে করে তোলে অস্থির, চঞ্চল। এখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না যে, ব্যক্তি ঈমান আনলে তার মুখে তালা লাগাতে হবে আর কথা বলার স্পর্ধা দেখালে কুফরী এবং নাস্তিক্যবাদে গিয়ে পড়বে অথবা তার সামনে তৃতীয় পথ কেবল এটাই অবশিষ্ট থাকবে যে, কথা বলা আর নীরবতা পালন করার মধ্যে সে ঝুলে থাকবে; সব সময় অস্থির আর চঞ্চল থাকবে বা সর্বদা কেবল কথাই বলতে থাকবে।

ইসালামে মানুষের এ ধারণা অসম্ভব নয় যে, সে বিশ্বের মহাশক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী মানবাত্মার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত রয়েছে, যা তাকে সে শক্তির সাথে মেলাতে পারে। সূফীতত্ত্বে বায়আতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা 'ফানা' এবং 'বাকা'- আল্লাহর ইশ্‌কে বিলীন হয়ে অমরত্ব লাভ- এ অভিজ্ঞতায় এ সম্পর্ক উপলব্ধি করে থাকেন। কিন্তু তাদের আত্মার সাথে এ মিলন ঘটে কিছু সাময়িক মুহূর্তের জন্যে। অবশিষ্ট রয়েছে উন্নততর আত্মা- যেমন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈসা আলাইহিস-সালাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম প্রমুখের আত্মা। সে মহাশক্তির সাথে এ সবের স্থায়ী সম্পর্ক এবং সরাসরি ফয়েয-লাভকে দুঃসাধ্য মনে করা যায় না।

ইসলামে ওহীর ধারণা অত্যন্ত সাদামাটা এবং স্পষ্ট। এতে এমন কোন জটিলতা-দুর্বোধ্যতা নেই, যেমনটি পাওয়া যায় খ্রীষ্টবাদের কল্প-কাহিনী এবং বিশ্বাসে। খ্রীষ্টবাদে লাহুত আর নাসূত- খোদায়ী শক্তি আর জড় শক্তি- একই মূলে (যা নাকি তাদের ভাষায় নেতৃত্বের অংশবিশেষ মানে যীশুখ্রীষ্ট) একীভূত হওয়ার দুর্বোধ্য ধারণা পেশ করা হয়েছে। উপস্থাপন করা হয়েছে, একের ভেতর তিন-এর ধারণা। স্বীয় পুত্রের রূপ ধারণ করে 'ঈশ্বরে'র ধরাধামে নেমে আসা এবং মানবতাকে আদমের পাপ থেকে মুক্তিদানের জন্যে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগের ধারণাও পোষণ করা হয় খ্রীষ্টবাদে। গির্জা এবং পাদ্রী-পরিষদ এ ছাড়া আরও অনেক কল্প-কাহিনী প্রবেশ করিয়েছে খ্রীষ্টবাদে। ওহীর ইসলামী ধারণা সম্পর্কেও উত্থাপন করা হয়েছে নানা আপত্তি ও অভিযোগ। কিন্তু খ্রীষ্টবাদের এসব ধারণার পাশাপাশি রেখে ওহীর ইসলামী ধারণা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে খ্রীষ্টবাদের জটিলতার তুলনায় তা অনেক সাদাসিধে এবং স্পষ্ট। সহজেই প্রতিভাত হবে ইসলামে ওহীর ধারণার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা।

খ্রীষ্টবাদে এসব কল্প-কাহিনী প্রবেশ লাভ করেছে পরে। আসল খ্রীষ্টবাদ এসব থেকে মুক্ত। কারণ উৎসমূলের বিচারে তা ছিল একক ধর্মের একটা বিশেষ রূপ, যা আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে। তা ছিল তাওহীদের ধর্ম, যাতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা হয় না, যা মানুষকে মুক্তি দেয় সকল অংশীদারীর দাসত্ব থেকে। কিন্তু রোমানরা যখন খ্রীষ্টবাদে দীক্ষিত হয়, তখন তারা সাথে করে নিয়ে আসে রকমারী খোদা। তারা খ্রীষ্টবাদের তাওহীদের শিক্ষার জন্যে নিজেদের অন্তরে নিষ্ঠা সৃষ্টি করতে পারেনি। এখান থেকে সৃষ্টি হয় নানাপ্রকার কল্প-কাহিনী। কালের বিবর্তনে

এসব কল্প-কাহিনী ধীরে ধীরে খ্রীষ্টবাদের আকার ধারণ করে আর এটাই আজকের খ্রীষ্টধর্ম। আজকের দিনে খ্রীষ্টবাদ একটা নিছক অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মে পর্যবসিত হয়েছে। যারা এ ধর্মকে স্বীকার করে না, এরা তাদেরকে ধিক্কার দেয়, তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয় মুক্তি থেকে বঞ্চিত বলে।

কিন্তু খ্রীষ্টবাদ বর্তমানে রূপ পরিগ্রহ করার ফলে সত্যিকার খ্রীষ্টবাদ এক চিরন্তন মানসিক অস্থিরতা এবং চিন্তার নৈরাজ্যের শিকার হয়ে পড়েছে। এখন তারা মুখ খুললে তাদেরকে আস্তিকের দল ছেড়ে নাস্তিকের দলে ভিড়তে হবে আর যদি গির্জার কল্পিত-স্বীকৃত ধারণা রক্ষণ করে তাহলে জ্ঞানের দাবি বিসর্জন দিতে হয়।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ উপায়টি হচ্ছে এই যে, বিশ্বাসের পিপাসা এবং সত্যবাদিতার-দাবির মধ্যখানে-কারণ মুখ্যত যেসব স্ব-কপোলকল্পিত কাহিনীকে ভয় পায়-এক চিরন্তন মানসিক-আত্মিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত থাকা।

খ্রীষ্টবাদকে যেসব দৈব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ইসলামেও তা ঘটার উপক্রম হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে এই যে, কল্প-কাহিনী আর আজগুবী গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা আর সাদাসিধা আকীদা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব,তাঁর প্রিয় আহলে বায়ত এবং (হযরত ইমাম) হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেন্দ্র করে এসব কল্প-কাহিনী গড়ে উঠতে পারত। বস্তুত হয়েছেও তাই। এসবের তানা-বানা বোনা হয়েছিল এবং প্রস্তুত হয়েছিল অলীক কাহিনীর পরিমন্ডল। কিন্তু ইসলামের প্রকৃতি এসব কল্প-কাহিনী অস্বীকার করে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, এসব কল্প-কাহিণী আর গাল-গল্প তো জনগণের মধ্যে কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে, কিন্তু ইসলামের সাদাসিধা বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ মুক্ত-বিশুদ্ধ রয়েছে, সংরক্ষিত রয়েছে তার মূলনীতি। বস্তুত তার প্রকৃতিতে এতটা সরলতা-বিশুদ্ধতা রয়েছে যে, এসব ভয়ংকর কল্প-কাহিনী আর গাল-গল্প তার আশেপাশেই ঘোরাফেরা করতে থাকে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

পক্ষান্তরে খ্রীষ্টবাদে গির্জা নিজেই এসব কল্প-কাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কারণ গণমনে তার প্রভাব ছিল সুদৃঢ়। বিশ্বাসের জটিলতা এবং তার চারপাশে বিভ্রান্তির বেড়াজালের পেছনে গির্জার একটা জ্ঞাত উদ্দেশ্য রয়েছে, যাতে জন-জীবনে গির্জার একটা অংশ থাকে। এমনিভাবে সে চায় একটা পরিমন্ডল সৃষ্টি করতে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস যদি মূলানুযায়ী সাদাসিধা থাকত আর সবাই তা বুঝতে পারত, তবে ধর্মের ঠিকাদাররা কি করত? মানুষ যখন নিজেই তাদের দীনকে বুঝতে পারত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিজেরাই পালন করতে পারত এবং কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই নিজেদের স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে পারত, তখন পেশাদার ধর্ম-ব্যবসায়ীর কি প্রয়োজন ছিল? এ কারণে ধর্মে এসব জটিলতা-অস্পষ্টতা মনে করা হয়েছে অপরিহার্য। মানুষ যাতে সবসময় গির্জানির্ভর থাকে, এজন্যই এসব দুঃস্বপ্ন গাল-গল্প আর কল্প-কাহিনী। বিশ্বাসের গ্রন্থি কেবল গীর্জার অধিকর্তারাই উম্মোচন করতে পারবে আর ধর্মের রহস্য ভেদ করা কেবল তাদের ওপরই ন্যস্ত থাকবে। এমনিভাবে গির্জার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব

অটুট রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ কারণে মানুষ যতক্ষণ তাদের ধর্মীয় জীবন এবং আত্মিক বিষয়ে কোন পাদ্রী- পুরোহিত-এর পথ-দর্শন গ্রহণ না করে, ততক্ষণ সে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না।

ইসলামে গির্জার কোন অস্তিত্ব নেই। তাতে পেশাদার কোন ধর্মীয় দলেরও (Priesthood)সন্ধান মেলে না। যাদের ছাড়া কোন ধর্মানুষ্ঠান পালন করা যেতে পারে না, কেবল এদের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে পারে। ইসলাম নানা কল্প-কাহিনী থেকে মানব-মনের মুক্তিদাতাই কেবল নিজেকে মনে করে না; বরং সে অলৌকিক কর্মকান্ডের বেড়াজাল থেকেও বের করে আনে। ইসলাম তার স্পষ্টতা-সরলতা এবং বাস্তবতাকেই মানব-মনের গভীরে তাকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম মনে করে। মহানবীর জীবদ্দসায় একবার ঘটনাক্রমে তাঁর পুত্র-সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ হয়। এ ঘটনায় লোকেরা চিৎকার করে ওঠে এবং বলতে থাকে,"হুযুরের সন্তানের মৃত্যুর কারণে এ সূর্য গ্রহণ হয়েছে।"'এটা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাত এ কল্প-কাহিনী নাকচ করে দেন, যাতে আকীদার স্বচ্ছতা-সরলতার ওপর তা রেখাপাত না করে। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে,"সূর্য আল্লাহর অসীম শক্তির একটা নিদর্শন মাত্র। কোন মানুষের মৃত্যুতে তাতে গ্রহণ লাগে না।" এ স্পষ্ট সতর্কতা এবং উজ্জ্বল সত্যতার সাথে তিনি কল্প-কাহিনীর প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার অভিপ্রায় থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। এ কাহিনীকে তিনি তাঁর নতুন চিন্তার প্রচার-প্রসারের জন্য মোটেও ব্যবহার করেন নি; বরং তিনি তা বরদাশ্‌তই করেন নি। কারণ হচ্ছে এইযে, তা ছিল প্রকৃতিগতভাবেই নতুন দীনের মেজাজের বিরোধী। এ স্বচ্ছতা স্পষ্টতা দিয়ে ইসলাম ব্যক্তির কথা এবং আকীদার মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। গির্জার বিকৃত-পরিবর্তিত খ্রীষ্টবাদ মানব মনে যে রোগাতুর অস্থিরতা ক্ষিপ্ত করে তোলে, ইসলাম মানব-মনে তা সৃষ্টি করে না। খ্রীষ্টবাদ ছাড়া অপর কোন কোন ধর্মও মানব মনে এ অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এখানে ধর্মে আসল বিষয় আর কল্প-কাহিনী সংমিশ্রিত হয়ে যায়, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটে এমন আকীদা হয় আলো আর স্পষ্টতাবর্জিত। এ কারণে তা কেবল আগরবাতির খোশ্‌বু এবং সঙ্গীতের গুনগুনানীর মধ্যে জীবিত থাকতে পারে। কারণ আলো থেকে তা পলায়ন করে; বরং তাকে ভয় পায়।

সন্দেহ নেই যে, এ বিশাল বিশ্বে এ বিস্ময়কর বস্তুজগতে মানুষ তার প্রতিপালককে নিকটে পাওয়ার প্রয়োজনিয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। সে চায় তার প্রতিপালক তার দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাংখা অনুভব করুক। মানবতার এ গভীর আগ্রহ পূরণ করার জন্যে গির্জা-প্রধান খ্রীষ্টবাদ অনেক কল্প-কাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার নিমিত্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার খাতিরে তারা খোদাকে ওপর থেকে নীচে নামিয়ে আনে অথবা মানুষের প্রতি দয়া করার জন্যে খোদার একমাত্র পুত্রকে এসব দুঃখ সহ্য করতে বাধ্য করে। খ্রীষ্টবাদ এ ধরণের আরও কিছু ধারণা উপস্থাপন করে, যা মানুষকে করে হতবুদ্ধি আর তার মনকে করে তোলে অস্থির, চঞ্চল। অপর পক্ষে ইসলামও এ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জবাব দেয়। কিন্তু তার জবাব হচ্ছে, খোদার খোদায়ী এবং একত্বের শানের সম্পূর্ণ

উপযোগী। ইসলামের জবাব এই যে, আল্লাহ মানুষের অনেক নিকটবর্তী। তিনি মানুষের দু'আ শুনেন, মানুষের পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি আদৌ গাফিল নন। তিনি মানুষকে বিস্মৃতও হন না ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۝

- আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করলে তুমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দাও যে, আমি অতি নিকটবর্তী। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার দু'আ শুনি। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা কল্যাণ পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। -সূরা বাকারা ঃ ১৮৬

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ –

- এবং তোমার পরওয়ারদিগার বলেন যে, তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তা কবূল করবো। - সূরা মু'মিন ঃ ৬০

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۝

- কোথাও তিন ব্যক্তির কানা-ঘুষা হতে পারে না, যেখানে তিনি চতুর্থ থাকেন না, পাঁচ ব্যক্তির শলা-পরামর্শ হতে পারে না, তিনি যেখানে ষষ্ঠ থাকেন না। এর চেয়ে কম-বেশী যাই হোক, যেখানেই হোক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। - সূরা মুজাদালাহ্ ঃ ৭

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ –

- আর আমরা তো তার শাহরগের চেয়েও নিকটবর্তী। - সূরা ক্বাফ ঃ ১৬

এমনভাবে মানুষ আল্লাহর সাথে তার গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, তার দয়া-দাক্ষিণ্য এবং দু'আ কবুল করা অনুভব করে। বিস্ময়কর কল্প-কাহিনীর তার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

আশা-আকাংখা এবং প্রয়োজন

এমনিভাবে ইসলাম ব্যক্তির একান্ত স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং অগণিত আত্মিক আশা-আকাংখার মধ্যে শান্তি-চুক্তি স্থাপন করে। কিন্তু এমনটি করার সময় ইসলাম স্বাভাবিক খাহেশের পাল্লা ভারী করে না, আত্মিক আশা-আকাংখার পাল্লাও নয়। সর্বাত্মক ঐক্যের ব্যাপারে ইসলামের দর্শন ব্যক্তি-মানস এবং

তাতে নিহিত জীবনের আবেগ-অনুভূতিকে গভীর প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। প্রয়োজন এবং আত্মিক আগ্রহ উভয়ই স্থাপিত হয়েছে এক সামঞ্জস্যের সাথে। এতদোভয়ের মধ্যে যেটা এ সামঞ্জস্যের যতটা পরিপন্থি হবে এবং জীবনের বিকাশে যতটা প্রতিবন্ধক হবে, তার ততটা শক্তিই অপচয় হবে।

এ কারণে একেবারে সূচনা-পর্ব থেকেই মানব প্রকৃতিতে সুপ্ত জীবনের মৌলিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেয় এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় তাকে ব্যক্তি-মানসের একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের আগ্রহের সাথে সংঘাতমুখর বলে অভিহিত করেনি। কারণ এই যে, আশা-আকাংখার একটা বুনিয়াদী দাবি, যা মানব প্রকৃতিতে সুপ্ত রয়েছে।

ইসলাম যখন আত্মার পবিত্রতা অবলম্বনের আহ্বান জানায় এবং কামনা-বাসনার ওপর কড়াকড়ি আরোপ থেকে আযাদীর নির্দেশ দেয়, তখন তার অর্থ এই নয় যে, জৈবিক আবেগ-অনুভূতিকে নির্মূল করতে হবে এবং জীবন্ত শক্তিগুলোকে মেরে ফেলতে হবে। ইসলাম শুধু এটুকুই চায় যে, নফসের কর্তৃত্ব মানুষের নিজের হাতে থাকুক; যাতে সে মনস্কামনার দাসে পরিণত না হয়, আবার এমন জন্তুতেও পরিণত হয়ে থাকবে না, যার লাগাম কেবল আবেগ-উচ্ছ্বাসের হাতে নিহিত। উপভোগ করার ক্ষেত্রে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য শুধু ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ –

- আর যারা কাফির,তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত উপভোগ করে এবং আহার্য গ্রহণ করে। - সূরা মুহাম্মদ ঃ ১২

মানুষ যখন নিজেই তার কর্মকান্ডের মালিক, তখন তার উচিত নিজের দেহের হক চেনা, পাক-পবিত্র বস্তু দ্বারা জীবনের কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম না করা। আল্লাহ যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, তাতে স্বাদ-আহ্লাদের সে সব বস্তুই শামিল রয়েছে, একটা সুস্থ-সুঠাম ভারসাম্যপূর্ণ দেহ যা হাসিল করতে চায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের বস্তুগত খাহেশের সবটুকুই পূঁতিগন্ধময় এবং পরিত্যাজ্য নয়। পছন্দসই জিনিস বেশী গ্রহণ করার খাহেশ পোষণ করা এমন কোন নীচ কাজ নয় যে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা তা থেকে উর্ধ্বে থাকবেন। জীবনের উপায়-উপকরণ বিস্তারের আগ্রহ জীবন সৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা শুধু জীবনের বিস্তৃতিই চান না; বরং তিনি জীবনের বিকাশও চান। এ বিস্তৃতি অগ্রগতির সহায়ক এবং তা ক্রমবিকাশবাদের দর্শনের বিরোধী নয়। এ কারণে ইসলাম মানব জীবনের জৈবিক বৃত্তিকে তার প্রকৃতিতে নিহিত গভীর আত্মীক আকাংখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। ইসলাম উভয়কে নিয়ে এক ইউনিট গঠন করে, যা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে একেবারেই সংরক্ষিত।

ইসলামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বস্তুর স্বাদ আস্বাদনের আহ্বান চলে। এ দুয়ের মধ্য থেকে উদ্ভব হয় মধ্যপন্থার, যা সীমালংঘন এবং বঞ্চনা- উভয়ের থেকে মুক্ত ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٥ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

- বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর। এবং পানাহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, কে তাকে হারাম করে? কে সে, যে পূত-পবিত্র জীবিকাকে হারাম করে? বলে দাও, পার্থিব জীবনেও এটা ঈমানদারদের জন্যে, আর পরকালের জীবনে তো তা কেবল এদের জন্যেই থাকবে। জ্ঞানবান জাতির জন্যে আমরা এমনিভাবে নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ব্যক্ত করি। বল, আমার পরওয়ারদিগার তো কেবল অশ্লীল জিনিস হারাম করেছেন- তা স্পষ্ট হোক, কি অস্পষ্ট। তিনি এটাকেও হারাম করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করবে, যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেন নি। যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, আল্লাহর প্রতি তা আরোপ করাকেও তিনি হারাম করেছেন। -সূরা আ'রাফ ঃ ৩১-৩৩

উপরিউক্ত আয়াতে 'ফাওয়াহেশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল হচ্ছে ফুহ্শ্ আর এর অর্থ হচ্ছে সীমাতিক্রম করা। আলোচ্য আয়াতে এটাকে অন্যায়, বিদ্রোহ এবং আল্লাহর সাথে শরীক করার সমার্থক করা হয়েছে। এসব হচ্ছে প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধনকারী, ন্যায়নীতির বিরোধী এবং জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থি।

এমনিভাবে মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি জীবনের বিন্যাস ও বিকাশে নিজের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রস্তুত করে নেয়। মানুষ তার টিকে থাকা এবং জীবনের হিফাযতের খাতিরে জীবনের জন্যে অপরিহার্য বস্তুগত দিক এবং সেসব আশা-আকাংখার মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে, যা তাকে ওপর থেকে আহ্বান জানায়, উৎসাহ দেয়। এমনিভাবে জীবনের হিফাযত এবং বিকাশে রক্ষিত হয় ভারসাম্য। ব্যক্তির অন্তরে তার বিশ্বাসের অধীনে এ ভারসাম্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমন সামাজিক পর্যায় পূর্ণ হয় তার কর্মকান্ড দ্বারা। ব্যক্তি যখন নিজের এবং অপরের অধিকার আদায় করে, তখন তার মনের ভেতর থেকে শান্তি অনুভব করে, যেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারে সে অনুভব করে বাইরে থেকে শান্তি।

ইসলাম এভাবে মনস্তাত্ত্বিক চুক্তির চিকিৎসা করে। ফ্রয়েড এবং তার অনুসারীরা নিজেদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছে এ মনস্তাত্ত্বিক চুক্তির ওপর। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ চুক্তি অপরিহার্য; এ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব। তাদের মতে এটা সমাজের একটা অভিশাপ, সমাজ তার বিধি-নিষেধ এবং শিক্ষার মাধ্যমে তা ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয় আর ব্যক্তি-মন - অন্য কথায় উন্নত সত্তা-সমাজের প্রতিনিধিত্বে খাহেশকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে একেবারেই দাবিয়ে দেয়। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে ইসলামী আকীদার পরিবেশে এ 'চুক্তি' অত্যন্ত দুর্বল বা একেবারেই অনুপস্থিত প্রতিভাত হবে। কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামী আকীদা শুরু থেকেই ব্যক্তির খাহেশ-প্রয়োজনকে স্বীকার করে। ইসলাম তাতে কোন ক্রটি বা নীচতা দেখতে পায় না। সে ব্যক্তির জন্যে এসব সরবরাহের নিমিত্ত সহজ পথ গ্রহণ করে। বৈধ সীমার মধ্যে থেকে নীতি-নৈতিকতা এবং স্বচ্ছতা-পরিচ্ছন্নতার দাবী অনুযায়ী নির্দ্বিধায় তা পূরা করা ব্যক্তির সর্বজন স্বীকৃত আইনগত অধিকার। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে যাতে বিকৃতি সৃষ্টি না হয় আর সমাজের বৃত্তে যাতে পশুত্বের নীচতা নেমে না আসে।

ইসলাম এসব প্রাকৃতিক অ-ক্ষতিকর খাহেশকে অতি গভীর দৃষ্টিতে দেখে। ইসলাম এ কথা স্বীকার করে যে, সৌন্দর্য আর সাজ-সজ্জার ব্যাপারে কখনো কখনো নারীর খাহেশ পুরুষের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই ইসলাম কোন কোন সৌন্দর্যের উপকরণকে নারীর জন্যে হালাল এবং পুরুষের জন্যে হারাম করে। ইসলাম সৌন্দর্যের ব্যাপারে নারীর নারীসুলভ প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে ইসলাম স্বর্ণালংকার এবং রেশমী কাপড় নারীর জন্যে 'মুবাহ' এবং পুরুষের জন্যে হারাম করে। পুরুষের প্রকৃতি এবং দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম তার জন্যে এসবকে ক্ষতিকর বিলাসিতা বলে অভিহিত করে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর জন্যে যা কিছু হারাম করেছে, তা হচ্ছে বেলেল্লাপনা আর স্বাধীনভাবে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করা। এখানে এসে ব্যাপারটি অহিতকর ভোগের গণ্ডী অতিক্রম করে. পাশবিক উন্মত্ততায় গিয়ে পৌঁছে। এটাই হচ্ছে সিদ্ধান্তকর স্থান।

এ সব কারণে ইসলামী আকীদার পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক চুক্তিতে পৌঁছাবার কারণ একান্ত বিরল অবস্থা পর্যন্ত সীমিত থাকে। আর তা'ও পছন্দসই উপায়ে, সুস্থ প্রকৃতিতে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। চঞ্চলতা-অস্থিরতার কার্যকারণ একেবারেই চাপা পড়ে যায়। ফল হয় এই যে, মুসলিম ব্যক্তি শান্তি-নিরাপত্তায় সফলতা লাভ করে।

গুনাহ এবং তওবা

ইসলাম কেবল ব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রয়োজন স্বীকার করে তাকে আত্মার দাবির উপযোগী করেই শেষ করে না; বরং আরও অগ্রসর হয়ে স্পষ্ট এবং বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করে। তা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তির পাপ-তাপের মোহকেও স্বীকার করে। ভুল-ক্রটিকে তো একেবারেই মাফ করে দেয়া হয়েছে। এজন্য কোন পাকড়াও হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

رفع عن امتى الخطاء والنسيان -

-আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হয়েছে।[১]

অবশিষ্ট রয়েছে নাফরমানী এবং গুনাহ। এজন্যে তওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। যে কেউ গুনাহমাফী এবং পবিত্রতা হাসিল করার জন্যে এদিকে পা বাড়াতে পারে। কেউ তাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে না। তার এবং আল্লাহর মধ্যখানের দরজা কেউ বন্ধ করতে পারে না। তার এবং পরওয়ারদিগারের মাঝখানে কোন অন্তরায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

কেউ যদি পদস্খলিত হয়ে গুনাহ করে বসে, তার জন্যে দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। বিনাশ হয় না তার, দরবার থেকে বিতাড়িত বা অভিশপ্ত হয়ে যায় না সে, আচ্ছন্ন করে না তাকে ঘন-কালো অমানিশা; বরং তার জন্যে বর্তমান থাকে আলো, খোলা থাকে রাস্তা। দয়ার্দ্র করুণাসিক্ত হাত তাকে তুলে নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়। মানে তওবার উদার হাত! এ হাত তাকে দেয় আরোগ্য। তার জন্যে বিস্তার করে সুখ-শান্তির গভীর ছায়া ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ - اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٥

-বলে দাও, বান্দারা আমার! যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেন। সন্দেহ নেই, তিনি দয়াময়-মেহেরমান। -সূরা যুমার ঃ ৫৩

ইসলামে মা'বুদের এমন ধারণা নেই যে, তিনি গুনাহগারকে চিরতরে তাড়িত করেন, তার কোন পদস্খলন ক্ষমা করেন না, কবূল করেন না তার কোন তওবা। তাওবার উপায়ও কেবল এই নয় যে, সে আত্মহত্যা করবে বা দেহকে শাস্তি দেবে বা কয়েক শতাব্দী, কয়েক পুরুষ ধরে তার আত্মা তুচ্ছ পংকিল দেহের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াবে। ইসলামে গুনাহের কাফ্ফারার দাবি এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা- যিনি সকল দোষ-ত্রুটি-মুক্ত-- মানুষের গুনাহের কাফ্ফারা দেয়ার নিমিত্ত শূলীতে আরোহণ করতে এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগের জন্যে ওপর থেকে নীচে নেমে আসবেন। এর কী প্রয়োজন রয়েছে? তিনি তো নিজেই মানুষের স্রষ্টা। শূলীতে না চড়ে এবং কষ্টভোগ না করেও তো তিনি মানুষকে কলুষমুক্ত করতে পারেন। এমনিভাবে তওবার জন্যে প্রয়োজন নেই কোন পাদ্রী-পুরোহিতের, কোন বধ্যভূমির। গুনাহ ব্যক্তির মাথার ওপর এমনভাবে ঝুলেও থাকে না যে, সে কিছুতেই তা থেকে মুক্ত হতে পারে না- পারে না তা থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে।

কোন গুনাহগার মানুষের জন্যে কেবল এটুকুই যথেষ্ট যে, লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে সরাসরি

১.ইমাম কুরতবী তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। আল-আসীলী 'ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে এবং ইবনুল মুনযির 'আল-ইকনা' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

লোকটি তাঁর লৌহবর্ম চুরি করেছে। কাযী আমীরুল মু'মিনীরের বিরুদ্ধে রায় দেন। কারণ, তিনি চোরের বিরুদ্ধে শরীয়তসম্মত সাক্ষী-প্রমাণ আদালতে পেশ করতে পারেন নি। এতে খলীফা একটু হেসে বিনাবাক্যব্যয়ে রাজী হয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য নজীর রয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়, কেবল ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট।[১]

ইসলাম ব্যক্তির জন্যে খাদ্যের নিশ্চয়তা দেয় আর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করে সমাজের উপর। ইসলাম ব্যক্তিকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, সে উপার্জন করতে সক্ষম হলে তাকে কাজ এবং পারিশ্রমিকে ইনসাফ করা হবে। সে যদি বেকার, অক্ষম, রোগগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে তার মৌলিক চাহিদা মেটানো সমাজ তথা রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিশু কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাকে দুধ পান করানো এবং প্রতিপালনের দায়িত্বেরও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। 'সমাজের শান্তি' অধ্যায়ে আমরা এসব নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ব্যক্তির যেসব নিরাপত্তা তাকে কর্মজীবনে শান্তি এবং আত্মার স্বস্তি দেয়, এখানে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে ব্যক্তি-মন যে শান্তিলাভ করে, এটা তার অতিরিক্ত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম ব্যক্তি-মনের গভীরে শান্তি-নিরাপত্তার সকল কার্যকারণ পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ইসলামের নীতি আমরা বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করেছি, ব্যক্তির মন যেখানে শান্তি উপভোগ করতে পারে না, সেখানে কোন শান্তি নেই।

১.বিস্তারিত জানার জন্যে গ্রন্থকার প্রণীত 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' গ্রন্থের 'কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘরের শান্তি

ঘর মানুষের আশ্রয়স্থল, শান্তির নীড়। ঘরের ছায়ায় মানুষের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। এরই কোলে শৈশব পেরিয়ে যৌবনের উন্মেষ ঘটে। ঘরের চারি দেয়াল থেকেই গড়ে ওঠে স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, তারই পরিবেশে শ্বাস গ্রহণ করে, পরিপুষ্টি লাভ করে। সমাজের বিশাল কর্মস্থলে এমন অনেক ঘটনা আছে, যা ইতিহাসের গতিধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর গোপন রহস্য পারিবারিক জীবনের সাধারণ ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

যে ব্যক্তি ঘরে শান্তি পায় না, সে শান্তির মূল্য কখনো বুঝতে পারে না, পারে না তার স্বাদ আস্বাদন করতে। যে ব্যক্তির রগ-রেশায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মনে অশান্তি, চিত্তে অস্থিরতা বিরাজমান, সে ব্যক্তি কি করে শান্তির নিষ্ঠাবান কর্মী হবে? ইসলাম পারিবারিক জীবনে শান্তির বীজ বপন করে। সাথে সাথে ব্যক্তি মনে, সমাজে, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনেও এ কাজই করে। জীবনের এসব পর্যায় একই সঙ্গে অতিক্রান্ত হয়, এসবের মধ্যে রয়েছে গভীর সংযোগ।

পবিত্র দুর্গ

ইসলাম সর্বপ্রথম পারিবারিক জীবনের এক উজ্জ্ব-সবুজ সজীব চিত্র পেশ করে। এ চিত্র থেকে ফুটে ওঠে পারস্পারিক দয়া-করুণার আলোকচ্ছটা। এতে বিস্তার করে ভালোবাসার ছায়া, বিকশিত হয় উদারতা আর সম্প্রীতি, ছড়িয়ে পড়ে মেশ্‌ক-আম্বরের খুশবুঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

-এটিও আল্লাহর অসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। আর তিনিই তো তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-আন্তরিকতা সৃষ্টি করেছেন। - সূরা আর-রূম ঃ ২১

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط

- নারীরা তোমদের জন্যে পোশাক, আর তোমরা তাদের জন্যে। - সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৭

এ সম্পর্ক মনের সাথে মনের এতে শান্তি-স্বস্তি আছে, প্রীতি-ভালোবাসা আছে, আচ্ছাদন ও শোভা আছে। নিদর্শন শব্দটির (মূল আয়াত) মধ্যেই দয়া-ভালোবাসা অনুভূত হয়। মনে হয়, শব্দটি থেকেই এক সবুজ-সতেজ ভাব ফুটে উঠছে। ইসলাম পারিবারিক জীবনের যে সুদৃঢ় এবং কোমল সম্পর্ককে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় কর্তব্য বলে অভিহিত করে, এ হচ্ছে তার মূল কথার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। এ

ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয়েছে এজন্যে যে, এতে পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ তত্ত্বও সামনে রাখা দরকার যে, সন্তানের জন্মলাভের পর এ সম্পর্কের আরো বিস্তৃতি ঘটে। এ কারণে ইসলাম এসব সম্পর্কের ওপর পবিত্রতার ছাপ মুদ্রিত করে।ইসলাম এ সব লক্ষ্যের পবিত্রতা এবং উপকারিতা স্বীকার করে, তার দিক-নির্দেশ করে এবং এ সবের দাবিতে পারস্পারিক নিয়ম-শৃংখলা সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص

- তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য ফসল ক্ষেত্র। -সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও এখানে পর্যাপ্ততা এবং শস্য-শ্যামলতার অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ইসলাম পারিবারিক জীবনের এ যুথ, এ লালন ক্ষেত্র এবং এ কেন্দ্রভূমিকে পূর্ণ তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তা দিয়ে আচ্ছন্ন করে নেয়। এখানে ইসলামের সার্বিক প্রকৃতির পরিচয় পরিস্ফূট। এ ক্ষেত্রে ইসলাম কেবল আত্মিক আলো বিকিরণ করেই শেষ করে না; বরং আইন শৃংখলা এবং বিধানগত নিরাপত্তারও পূর্ণ ব্যবস্থা করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ঃ

এক ঃ দাম্পত্য সম্পর্কে সম্মতি এবং অনুমতি অত্যন্ত জরুরী। তাই অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ছাড়া নারীকে বিবাহ দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে একে অপরকে একনজর দেখে নেয়াও জরুরী, যাতে এ সম্মতি অন্তর-অনুভূতি থেকে জেগে ওঠে এবং বাস্তবভিত্তিক হয়। বিবাহেচ্ছু জনৈক সাহাবীকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما –

- তাকে একনজর দেখে নাও। কারণ, আশা করা যায়, এতে তোমাদের মধ্যে স্থায়ী ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হবে।[১] - মাসাবীহুস-সুন্নাহ

দুই ঃ বিবাহ প্রকাশ্যে হতে হবে এবং তাতে সাক্ষী থাকতে হবে। এটা কোন অপরাধ বা বেআইনী কাজ নয় যে, গোপনে সারতে হবে। এতে সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব-কবূল সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এ সম্পর্ক স্থাপনে কোন প্রকার সন্দেহ বা গোপনিয়তা থাকুক, ইসলাম তা চায় না। এমনকি এ উপলক্ষ্যে দফ-তবলা বাজানোও পছন্দনীয়, যাতে ভালভাবে প্রচার হয়।

তিন ঃ বিবাহে স্থায়ীত্বের নিয়্যত থাকতে হবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। বিবাহের সময় যদি এ নিয়্যত থাকে বা স্পষ্ট বলে দেয়া হয় যে, একটা বিশেষ সময়ের জন্য এ বিবাহ, তাহলে বিবাহই হবে না। কারণ এ সম্পর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি ও স্থিতি। বিবাহ দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্যের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মনের শান্তির সাথে আকৃষ্ট হয়, এর ছায়ায় আস্থা এবং

১. হাদীসটি মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত। ইমাম বাগাবী (মাসাহীহুস-সুন্নাহ গ্রন্থের প্রণেতা)-র মতে হাদীসটি হাসান।

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সাথে জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

ঘরকে সঠিক অর্থে ঘরে পরিণত করা এবং এতে কাঙ্খিত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, এতে লালিত-পালিত কোমলমতি শিশুদের তত্ত্বাবধানের খাতিরে ইসলাম পুরুষের ওপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে এবং এ দায়িত্ব পালনকে তার জন্যে ফরয করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুদের মাতাকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম-সাধনা থেকে মুক্ত করে এতটা সময়-সুযোগ-সুবিধা দেয়া, যাতে সে মা'সুম শিশুদের লালন-পালনের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। তা ছাড়া পরিবারের সদস্যদের কেন্দ্রস্থলে শান্তি-শৃংখলাও রক্ষা করতে পারে। সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে গড়ে তুলতে পারে পরিবারকে এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত,কাজের চাপে বিব্রত, তারই পেছনে আটকে পড়া এবং তারই পেছনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে যে মাতা বাধ্য; ঘরের বিশেষ পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, তাতে লালিত পালিত শিশুদের হক আদায় করে দেখাশুনা করা এমন মাতার পক্ষে সম্ভব নয়। চাকুরীজীবি এবং বৃত্তিজীবি মহিলাদের গৃহ হোটেল এবং পান্থশালার পরিবেশের চেয়ে ভালো চিত্র পেশ করতে পারে না। একটি সত্যিকার পরিবারে সে খুশবু ছড়াতে পারে না। মাতা যতক্ষণ গৃহের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ততক্ষণ স্নেহ-ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। যে নারী, স্ত্রী এবং মাতা তার শ্রম-চেষ্টা-সাধনা এবং আত্মিক শক্তি জীবিকা অর্জনের পেছনে ব্যয় করে, সে গৃহকে নৈরাশ্য, ক্লান্তি-শ্রান্তি এবং বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

চাকুরীর খাতিরে নারীর বাইরে যাওয়া এমন এক দুঃখজনক ব্যাপার, যা কেবল অপারগ পরিস্থিতিতে জায়েয মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যারা এ থেকে বিরত থাকতে পারে, এরপরও তা করতে যায়, তাদের জন্যে এটা এক অভিশাপ। পতন, দুর্ভাগ্য এবং গুমরাহীর যুগে মানুষের মন, আত্মা এবং বিবেকের ওপর এ অভিশাপ চেপে বসেছে। ঘরের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, বিশৃংখলা এবং বিভক্তির পরিণতি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে ইসলাম ঘরের শান্তি-শৃংখলার দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। শান্তি-শৃংখলা এবং ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্তে অন্যান্য ব্যাপারে অতি যত্নের সাথে যে পথ অবলম্বন করে, এ ক্ষেত্রেও তাই করেছে। সামাজিক জীবনে ইসলাম এটাকে এতই গুরুত্ব দেয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র এ জন্যে তাকিদ করেছেন। এমনকি দু'ব্যক্তিও যদি সফরে বহির্গত হয় বা সালাত আদায় করতে চায়, তবে একজনকে আমীর বা ইমাম নিযুক্ত করতে হবে।

নৌকার নিরাপত্তার জন্যে যেমন তাতে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব প্রয়োজন, তেমনিভাবে পরিবারের নৌকায়ও একক নেতৃত্বের অস্তিত্ব অপরিহার্য, যাতে সে নেতৃত্ব পরিণাম-পরিণতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং শান্তি-শৃংখলাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে। পুরুষ সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়েও নিয়ম-শৃংখলার এ নীতি বর্তমান। সুতরাং পারিবারিক জীবনের এ বিভাগকে কেন বাদ দেয়া হবে? ভেবে দেখুন, বিবেক-বুদ্ধি গৃহের কর্তৃত্বভার কার ওপর ন্যস্ত করতে পারে? এ কর্তৃত্ব কি নারীর ওপর ন্যস্ত করা যায়, শিশুর লালন-পালন এবং সাজানো-গোছানোর দায়িত্ব পালন করে যে আগে থেকেই তার নাজুক আবেগ-

অনুভূতির এক বিরাট অংশ ব্যয় করে বসে আছে? না এ দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত হবে, যাতে নারী তার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে অবসর থাকে এবং তার সকল শক্তি-সামর্থ্য এতেই নিয়োজিত করতে পারে? এজন্যে ইসলাম অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে, যাতে সে সব কর্মে এবং ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে পারে। অপর পক্ষে প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতার বিচারেও এ দায়িত্ব পালনের জন্যে পুরুষই হচ্ছে সবচেয়ে যোগ্য।

বিষয়টি অতি সাধারণ এবং অত্যন্ত স্পষ্ট। এ সহজ-সরল বিষয়টি সত্যিকাররূপে পেশ করা হলে এ যুগের দায়িত্বহীন নারী-পুরুষ অর্থহীন হৈ-চৈ এবং চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তারা হৈ-চৈ করে ইসলামের পারিবারিক এবং সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে। এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন এবং বিবেক-বুদ্ধির লাগামহীনতাই এসব হৈ-চৈ-এর কারণ। এসব কারণেই বিষয়টি আলোচনা-সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ইসলাম পারিবারিক ব্যবস্থাকে শান্তির একটা পর্যায় করতে চায়, চায় গৃহে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে। কিন্তু পতন এবং দুর্ভাগ্যের যুগে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়েছে, তখন সমাজ বাহ্যিক আবরণ আর খণ্ডিত অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।

অবাধ মেলা-মেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী

ইসলাম নারীর অবাধ মেলামেশা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহের শান্তি বজায় রাখা, বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ অটুট রাখা। এ জন্যেই লাজ-লজ্জা; আর মান-সম্ভ্রমের বিধানও এজন্যেই। এ সব বিধি-বিধানের গুরুত্ব সব সময় স্বীকৃত ছিল। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ-উম্মাহাতুল মু'মিনীনকেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

- হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন বড় চাদরের একাংশ তাদের ওপর টেনে দেয়। -সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৯

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٥ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ

اَوْبَنِىْٓ اِخْوَتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرَ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

- আর মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চোখ নীচের দিকে নত রাখে এবং গোপন অঙ্গের হিফাযত করে। এটাই হচ্ছে তাদের জন্যে অতি পবিত্র। আর আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে ভালোভাবেই খবর রাখেন। আর মু'মিন স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, নিজেদের গোপন অঙ্গের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, অবশ্য তা থেকে যেটুকু স্বভাবতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা বাদে। আর তারা যেন ওড়না দ্বারা নিজেদের বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে এবং নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য, সাজসজ্জা মোটেই প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের পুত্রদের জন্যে বা স্বামীর জন্যে বা পিতাদের জন্যে বা নিজেদের ভাইদের জন্যে বা ভাইয়ের পুত্রদের জন্যে বা বোনের পুত্রদের জন্যে বা নিজেদের (ঘনিষ্ঠ) মেয়েদের জন্যে বা বাঁদী-চাকরাণীদের জন্যে বা কর্মচারীদের জন্যে- যারা পুরুষদের বিশেষ কাজ-কর্ম-সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল নয় বা ছোট ছেলেদের জন্যে- যারা মেয়েদের দৈহিক রহস্য সম্পর্কে এখনও কিছু জানে না। এবং নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্যে তারা যেন মাটিতে সজোরে পা না ফেলে। আর মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে কল্যাণ লাভ করতে পার। - সূরা আন্-নূর ঃ ৩০-৩১

নারী-পুরুষ উভয়ের কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় জীবন-সঙ্গীকে নিয়ে তুষ্ট থাকা। এমন কোন উত্তেজনার দিকে মনোনিবেশ না করা- যার ফলে স্বীয় জীবন-সঙ্গীর প্রতি তার আকর্ষণ-অনুভূতি হ্রাস পায়; যদি এ বিচ্যুতি তাকে গুনাহ এবং পদস্খলনের দিকে নিয়ে না যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ কাজটি সামাজিক জীবনের পবিত্র দুর্গ ধ্বংস করে দেয় এবং তার পরিবেশ থেকে আস্থা এবং শান্তি বিনাশ করে ফেলে।

আবেগ-অনুভূতির এ বিচ্যুতি বরং একটু অগ্রসর হয়ে পদস্খলন সেসব সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে এবং নারীরা সাজ-সজ্জা নিয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বেড়ায়; বিপর্যয় এবং উত্তেজনার শয়তান সব সময় এসব নারীর সাথে ঘোরাফেরা করে স্বাধীনভাবে। "নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চিন্তাধারাকে ভদ্র ও মার্জিত করে"- আধুনিকতার প্রবক্তাদের এহেন প্রলাপকে বাস্তব ঘটনার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এসব আধুনিকতার প্রবক্তারা আরও বলে থাকে যে, এর ফল সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে, নারী-পুরুষ কথাবার্তা এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি শিখতে পারে এবং তাদের এমন সব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করে, যা তাদেরকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করতে পারে এবং পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা; বরং পাপের বোঝার পর যে জীবন-সঙ্গী বাছাই করা হয়, এমন নারী-পুরুষ একে অপরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করার গ্যারান্টি হতে পারে! কারণ, পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং অভিজ্ঞতার পর একে অপরকে পছন্দ করে।

আমি বলি, এটা প্রলাপোক্তি। বাস্তব ঘটনা এ দাবি-উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। অহরহ বিচ্যুতি, উভয় পক্ষের অনুভূতির উপর্যুপরি পরিবর্তন, তালাক এবং তা ছাড়াই অসংখ্য পরিবারের বিনাশ এবং অবাধ মেলামেশা, সমাবেশে যেতে অভ্যস্ত নারী-পুরুষের মধ্যে অঘটন এ প্রলাপকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অবাধ মেল্যামেশার ফলে স্বামী বা স্ত্রীর জীবন শক্তিশালী, পরিপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। এটা যদি দুর্ঘটনায় পরিণত হয়, তখন ফল কি দাঁড়াবে? এ নতুন প্রেমের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন অবশ্যই পদস্খলিত হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্যের খাতিরে তারা এ উত্তেজনার মুকাবিলা করে, তবে উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং চঞ্চলতার শিকার হবে। উভয় পরিস্থিতেই মনের শান্তি বিনষ্ট হয়, আত্মার শান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বরবাদ হয় পরিবারের সুখ-শান্তি। অবশিষ্ট রয়েছে অপকর্ম এবং অশ্লীলতায় মনুষ্যত্বের নিমজ্জিত হওয়া, পাশবিকতার পঙ্কিলতার আবর্তে হাবুডুবু খাওয়া এবং জন্তু-জানোয়ারের মত বে-আইনী এবং যথেচ্ছ মনস্কামনার শিকার হওয়া। হ্যাঁ, এসব কিছু হচ্ছে এর অতিরিক্ত।

অবাধ মেলমেশা এবং মুক্ত আলাপ-আলোচনা দ্বারা সভ্যতা-সংস্কৃতির উজ্জীবনের কল্পকাহিনী সম্পর্কে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গর্ভবতী ছাত্রীদের শতকরা গড় হারকে প্রশ্ন করাই ভালো। একটা বড় শহরে শতকরা এ গড় হার ৪৮ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে! আমেরিকায় অবাধ মেলামেশা এবং অত্যন্ত যাঁচাই-বাছাই-এর পর বিবাহকারী ভাগ্যবান দম্পতিদেরকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, তালাকের ফলে ধ্বংস হয়েছে- এদের মধ্যে এমন পরিবারের সংখ্যা কত? অবাধ মেলামেশা এবং যাঁচাই-বাছাই যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, পর্যায়ক্রমে এ হারও ততই বাড়ছে। বস্তুত এ হার আশংকাজনকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ঃ

বর্ষ	শতকরা হার	বর্ষ	শতকরা হার
১৮৯০	৬%	১৯৩০	১৪%
১৯০০	১০%	১৯৪০	২০%
১৯১০	১০%	১৯৪৬	৩০%
১৯২০	১৪%	১৯৪৮	৪০%

এটা হচ্ছে তালাকের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবারের অবস্থা। অবাধ মেলামেশার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য পরিবার বল্‌গাহীন যৌনাচারের হাতুড়ীর নীচে নিস্পেষিত। সকাল-সন্ধ্যায় তারা নতুন নতুন মনস্কামনা এবং আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার শিকার হয়। একটি বল্‌গাহীন সমাজে আবেগ-অনুভূতির নিত্য নতুন পরিবর্তন এসব মনস্কমনাকেই উত্তেজিত করতে পারে। এসব সমাজে নারী-পুরুষের জন্যে নিত্যনতুন জোয়ার নতুন নতুন স্বাদ-সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশ পায়। ফল দাঁড়ায় এই যে, নারী-পুরুষ সব সময় নতুন নতুন শিকারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়; যখনই কোন নারী বা পুরুষ কোন নতুন ব্যক্তিত্বের মধ্যে চমক

দেখতে পায়, তখনই তার পারিবারিক জীবনে ঝড় নেমে আসে। নারী বা পুরুষ যেন ফ্যাশন জগতে গৃহের আসবাব-পত্রের একটা অংশ, একটা নেকটাই বা কোন নতুন ফ্যাশন।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একটা সামান্য আংশিক স্বাধীনতামাত্র। অভিজ্ঞতা জীবন-সঙ্গী বাছাই করায় সাহায্য করে। আর এ বাছাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে পাকা-পোক্ত করে তাকে স্থায়ীত্বের পথ দেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি মনগড়া অন্তঃসারশূন্য চিন্তাধারা বিচার-বিবেচনা করে দেখার সময় মানবতার জন্যে নিঃসন্দেহে উপস্থিত হয়েছে।

বাহ্যত এসব চিন্তাধারা যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা মার্কিন জীবনে চরমে পৌঁছেছে- এ বাহ্য চাকচিক্যময় যুক্তিকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কারণ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফল সেখানে মৃদু-মন্দ স্বাধীনতারূপে দেখা দেয়নি; বরং দেখা দিয়েছে পূর্ণ পাশবিকতার রূপে, যা কোন সীমা নির্ধারণ এবং বিধি-নিষেধ ছাড়াই নিছক দৈহিক সম্ভোগের দাবিকেই স্বাগত জানায়। নারী-পুরুষের পারস্পরিক পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং বাছাই করার পরিণতি পারিবারিক ব্যবস্থার সুদৃঢ়তা এবং পারস্পারিক সম্পর্কের স্থায়ীত্বের আকারে দেখা দেয়নি; বরং দেখা দিয়েছে স্থায়ী বিচ্ছেদ, তালাকের প্রাচুর্য, চিরন্তন যৌন ক্ষুধা এবং কামনা-বাসনার আগুনকে আরও লেলিহান করে তোলার আকারে।

এ ক্ষেত্রে মার্কিন অভিজ্ঞতা ফ্রয়েড এবং এ ধরনের অন্যান্যদের চিন্তাধারাকে স্পষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শ্রোতাদেরকে তা চিৎকার করে বলে দেয় যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিণতি কেবল অবাধ উত্তেজনাই হতে পারে। এ পরিণতি দু'টি উপায়ে হতে পারে, তা চরমে পৌঁছে সাময়িকভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং সময়ে তা আবার দেখা দেবে অথবা বাস্তব এবং বস্তুগত চরম সীমায় উপনীত হবে না। এ পরিস্থিতিতে মাংসপেশীর দুর্বলতা এবং এর পরবর্তী নানা ব্যধির আকারে এর পরিণতি দেখা দেবে।

আমেরিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এসব চিন্তাধারা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে কেবল একাডেমিক পর্যায়ে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, দৈহিক কামনা এতটা শক্তিশালী এবং গভীর যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা; বরং উভয় পক্ষের পরস্পর তৃপ্ত হওয়ার স্বাধীনতাও তা নির্বাপিত করতে পারে না। ভাজা গোশতের কেবল ঘ্রাণ দিয়ে পেটের ক্ষুধা মেটানো যায় না; বরং তা ক্ষুধা আরও বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে বদহজমী সৃষ্টিকারী তৈলাক্ত খাবার দিয়েও সে ক্ষুধাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দমন করে রাখা যেতে পারে। এরপর আবার যখন ক্ষুধা পাবে, তখন তা আগের চেয়ে আরও তীব্র হবে। দেহের ক্ষুধাও পেটের ক্ষুধার মত। উভয় ক্ষুধাই চিরন্তন। এটা স্রষ্টার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর সাথে জীবনের বিকাশ জড়িত। এজন্যেই স্রষ্টা এটাকে চিরন্তন করেছেন। মার্কিন অভিজ্ঞতা এ তত্ত্বই উচ্চস্বরে পেশ করেছে মতবাদ আর চিন্তাধারার মোড়কে।

এসব সম্পর্কেই ইসলামের ধারণা রয়েছে। এজন্যেই ইসলাম লাজ-লজ্জা এবং মান-সম্ভ্রমের নির্দেশ দিয়েছে। অবাধ মেলামেশা থেকে বারণ করেছে, চক্ষু নীচু করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে, সৌন্দর্য প্রদর্শনী এবং বেলেল্লাপনা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম চায় মানব মনে স্থিতি, অন্তরে তৃপ্তি এবং পরিবারে শান্তি

স্থাপিত হোক। ইসলাম নিবাসে শান্তি চায়, সে নিবাসের স্থায়ী মালিকানা স্বামী-স্ত্রী কারুর নয়। তারা তো গৃহের কোমলমতি শিশুদের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তাদের মর্যাদা হচ্ছে লালিত-পালিত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণকারীর। শান্তির এ কেন্দ্রের প্রস্ফুটিত নবজীবনের হিফাযত আর তত্ত্বাবধান করাই হচ্ছে তাদের দায়িত্ব।

শান্তি ও দন্ডবিধি

ইসলাম সমাজে অপকর্ম-অশ্লীলতার বিস্তারকে না-পছন্দ করে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

- যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্যে রয়েছে নিশ্চিত কঠোর শাস্তি। - সূরা আন্-নূর ঃ ১৯

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٥

- এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল-অপকর্ম এবং খারাপ পথ। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

সমাজে অশ্লীলতা বিস্তারের কুফল এই দাঁড়ায় যে, এতে সমাজের ভিত ধ্বসে যায়। কিন্তু এখানে তার যে প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য, তার সম্পর্ক হচ্ছে গৃহের শান্তির সাথে। এ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম অতি আগ্রহী।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইসলাম সর্বপ্রথম নিবৃত্ত থাকার নানা পন্থা অবলম্বন করে, লাজ-লজ্জার নির্দেশ দেয়, বেলেল্লাপনাকে হারাম করে, অবাধ মেলামেশা থেকে বারণ করে এবং তাকে কুফরী-শিরকীর সাথে এক করে দেখে। সামর্থ্য থাকলে ইসলামের নির্দেশ এই যে, বিবাহের মাধ্যমে পবিত্রতা-নির্মলতাকে সহজ করা হোক। এমনকি ইসলাম মুসলমানদের নির্দেশ দেয়, বিবাহেচ্ছু ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য করার জন্যে। সামর্থ্য না থাকলে দৈহিক উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে রোযা রাখার নির্দেশ দেয় ইসলাম ঃ

يا معشر الشباب من اسطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء –

- হে নওজোয়ানের দল! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, তার বিবাহ করা উচিত। কারণ, তাতে চক্ষু নীচু হয় এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত হয়। আর বিবাহ করার সামর্থ্য যার নেই, তার উচিত রোযা রাখা। কারণ এটা তার জন্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়। -বুখারী

ইসলাম ব্যায়াম এবং ঘোড়সওয়ারের জন্যে যে উৎসাহিত করেছে, তাতে অন্যান্য উপকারিতার মধ্যে এ দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

আবেগ-অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা, বেলেল্লাপনার কার্যকারণকে হারাম করে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষা, নারীদের সাথে চটকদার কথাবার্তা নিষিদ্ধকরণ, অতীব প্রয়োজন ছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধকরণ, দৈহিক ব্যায়াম এবং রোযা রাখার বিধান এবং সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান, এ সবই হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেহ-মনকে সংযত রাখার জন্যে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ এবং মধ্যপন্থী শিক্ষার ইতিবাচক দিক, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুগের প্রদর্শনীমুখী নারী এবং মুক্ত পুরুষরা বলে থাকে, আত্মসংযমের এ শিক্ষা মনস্তাত্তিক বিনাশ ঘটায়। এর কারণ এই যে, অবাধ মেলামেশা দূষিত-কলুষিত পরিবেশমুক্ত কোন সমাজ চিত্র হতে পারে, এমন ধারণাই এরা করতে পারে না। কী এ চিত্র? আবেগ-উত্তেজনাপ্রবণ নওজোয়ানরা অনুভূতিকে উত্তেজিত করে এমন যুবতীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করছে, যাদের উরুদেশ আর বক্ষদেশ বিবস্ত্র-উন্মুক্ত, চক্ষু থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে কুদৃষ্টি আর ওষ্ঠে খেলা করছে, কামভাব, অশ্লীল ছায়াছবি, অপরাধবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে- পত্র-পত্রিকার এমন ছবি এবং বেতারে নারীরূপী পুরুষ আর পুরুষরূপী নারী কণ্ঠ আগুনে তেল ঢালার কাজ করছে। এসব কিছুর পরও একদিকে রয়েছে বিলাসপ্রিয়তা এবং নিশ্চিন্ততা আর অপরদিকে রয়েছে বল্‌গাহীন স্বাধীনতা ও অবাধ সুযোগ-সুবিধা। এসব কিছুর ওপর মান-ইযযত বিক্রয়কারী নারী এবং হিজড়াদের দৌরাত্ম্য তো রয়েছেই।

যে সমাজের চিত্র এই, সে সমাজে আত্মসংযম সত্যি সত্যিই এক দুঃসাধ্য কাজ। কারণ সেখানে বিপর্যয়ের সকল কার্যকারণ তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ, অবাধ্য এবং সম্পূর্ণ মুক্ত। যে সমাজের চিত্র এই, সেখানে মানব-মন কদাচিত শান্তি লাভ করতে পারে, সেখানে ঘরের শান্তির অস্তিত্ব দুর্লভ। কিন্তু ইসলামী সমাজ মূল ভিত্তি থেকেই এ সবের পরিপন্থি। এ সমাজ আরামপ্রিয়তার বিরোধী এবং তাকে হারাম মনে করে। বল্‌গাহীন যৌনাচারের বিরোধী এবং তাকে বন্ধ করে। অবাধ মেলামেশা এবং রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। হিজড়াপনা এবং নারীপনার বিরুদ্ধে জিহাদ করে। অতঃপর সে জীবনের অবকাশকে আল্লাহ্‌ এবং মানবতার পথে বড় বড় কাজে লাগায়; অবসর সময়কে কাজে নিয়োজিত করে। ফল হয় এই যে, সে সমাজে বেকার নারী-পুরুষের কোন অবকাশ থাকে না, যারা জীবনের শূণ্যতা পূরণ করার জন্যে কোন কাজ পায় না। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করার জন্যে তারা পায় শুধু যৌন কামনা-বাসনা, অনুষ্ঠান আর নৈশ ক্লাবে মগ্ন এবং অশ্লীল বিলাসিতা আর আরামপ্রিয়তা।

পানপাত্র ধমনীতে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে, বেলেল্লা নারী বক্ষ, পিপাসু ওষ্ঠ আর পাপাচারী দৃষ্টি পুরুষকে আমন্ত্রণ জানাবে আর এ সবের পরও পুরুষকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তোমরা তোমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করবে, ইসলাম এটা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করে না। এ কিছুতেই হতে পারে না। ইসলাম বিষয়টিকে সব দিক থেকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রথম পদক্ষেপ

থেকেই বিপর্যয়ের সকল কার্যকারণের পথরোধ করে। অতঃপর মানুষকে কোন প্রকার অসুবিধায় না ফেলেই সে সব বিধি-বিধান মেনে চলতে বলে- যা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

এরপরও যদি অঘটন-অপকর্ম ঘটে, তবে পরিবারের শান্তি-শৃংখলা এবং সমাজে ভারসাম্য-সুস্থিতি বজায় রাখার খাতিরে ইসলাম অপকর্মের নায়ক-নায়িকাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

- ব্যাভিচারী নারী হোক, কি পুরুষ- তাদের প্রত্যেককে একশ' ঘা চাবুক মারবে। আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তোমাদের যদি ঈমান থাকে, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি কোমল আচরণ করবে না। তাদের শাস্তিস্থলে ঈমানদারদের একটি দল উপস্থিত থাকা উচিত। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী বা মুশরিক নারীকেই কেবল বিয়ে করতে পারে, আর ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষকেই বিয়ে করতে পারে। আর এ অপকর্ম মু'মিনদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। - সূরা আন্-নূর ঃ ২-৩

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে) তাদেরকে চাবুক মারার শাস্তি দেননি; বরং রজম, (প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণবধ)-এর দন্ড দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খুলাফায়ে রাশেদীনও এ কর্মনীতি গ্রহণ করেন। প্রদর্শন অভিলাষী নারী এবং স্বাধীনচেতা পুরুষরা এখানে-সেখানে বলে বেড়ায় যে, এ দন্ড তো অত্যন্ত কঠোর, অতি পাষাণ-হৃদয়তার পরিচায়ক! জি-হাঁ, এটা সত্য বটে! কিন্তু পরিবারের পর পরিবার ধ্বংস করা, মনের অশান্তি-অস্থিরতা, বংশধারায় সংমিশ্রণ- এ সব তো কঠিন নয়, পাষাণ-হৃদয়তার পরিচায়ক নয়? এটা পাষাণ-হৃদয়তা এ জন্যে যে, বিলাসপ্রিয় এবং বেলেল্লা নারী-পুরুষ যখন এ দন্ডকে কঠোর বলে অভিহিত করে, তখন তাদের মনে জাগে নিজেদের নরম-নাজুক এবং মেদ-স্ফীত চামড়ায় কোড়ার আঘাতের চিত্র! তারা চিন্তা করে নিজেদের স্ফীত নরম দেহে প্রস্তরাঘাতের কথা। তারা মুখে তো আধুনিক সভ্য আইনের নাম নেয়, কিন্তু আসলে তারা ইসলামী দন্ডবিধিকে পাষাণ-হৃদয়তা বা বর্বরোচিত আখ্যায়িত করে নিজেদেরকেই প্রতিরোধ করে। আসলে এরাই হচ্ছে বর্বর, আদি বর্বর, যারা জংলী জীবনে ফিরে যেতে চায়।

এরপরও ইসলাম এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কেবল নিশ্চিত পরিস্থিতিতে জারী করে, যেখানে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আর এ দন্ড দেয় কেবল বিবাহিত নারী-পুরুষকে। কারণ এ পরিস্থিতিতে

তীব্র প্রয়োজনের ধারণা করা যায় না। কিন্তু যেসব নারী-পুরুষ বিবাহিত নয়, তাদের দন্ড তুলনামূলকভাবে লঘু, বেত্রাঘাতের বেশী নয় ঃ ادرؤ الحدود بالشبهات

- তোমরা সন্দেহ-সংশয়ের কারণে দন্ড মওকুফ করো। -মুসনাদে আবূ হানীফা ঃ হারেসী সংকলিত

কারণ হচ্ছে এই যে, অপরাধের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তা প্রকাশ্য-স্পষ্ট নয়, নয় তা সন্দেহমুক্ত। এ ক্ষেত্রে দয়া এবং নমনীয়তা প্রয়োজন। যাতে সত্যিকার অপরাধী ব্যক্তিই দন্ডিত হয়, এ জন্যে যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ ব্যভিচারের চারজন সাক্ষীকে তা দেখতে হবে, তাদের সকলকে একমত হয়ে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য দিতে হবে, তাদের কারো মনে যেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে এবং এদের সকলকেই শরীয়তের দৃষ্টিতে সাক্ষ্যদানের যোগ্য, মানে আদিল (ন্যায়পরায়ণ) হতে হবে। এ সবই হচ্ছে এ ব্যাপারে শর্ত। এর কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে রজম বা প্রস্তরাঘাতে বধ করার শাস্তি আলোচনায়ই আসতে পারে না।

আমরা জানি, কারো ঘরের দরজা বা দেয়াল ডিঙ্গানো এবং বিনা অনুমতিতে কারো বাসগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দন্ডদানের জন্যে এ অপরাধের আইনগত প্রমাণ এবং ইসলাম নির্ধারিত শর্তানুযায়ী সাক্ষীদের তা দেখা প্রকাশ্য স্থানে দিবালোকে ঔদ্ধত্য পরায়ণতার সাথে অপকর্ম সাধনের ক্ষেত্রেই কেবল সম্ভব। এটাকেই ইসলাম অপকর্ম,অশ্লীলতা বিস্তার এবং বদমায়েশী ও অপকর্মের নিকট মান-সম্মানের প্রকাশ্যে জলাঞ্জলি দেয়া বলে। কাজেই প্রকৃতি যাদের সুস্থ, বিবেক যাদের বিকৃত নয়-এমন ব্যক্তি এ দন্ডকে কঠোর পাষাণ-হৃদয়তার দন্ড বলে কিছুতেই অভিহিত করতে পারে না।

মিথ্যা অপবাদের প্রসার রোধের জন্যে ইসলাম অপবাদ রটনাকারীকে বেত্রাঘাত করার, ভবিষ্যতে তাকে বিশ্বাস না করার এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার দন্ড দেয়। কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারলে ইসলাম এ দন্ডের আদেশ দেয় ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

- আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকে ৮০ ঘা চাবুক মার এবং এদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। এরাই হচ্ছে ফাসিক। অবশ্য এরপর যে তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ মহা দয়ালু, অতি মেহেরবান। - সূরা আন্-নূর ঃ ৪-৫

অপবাদ আরোপ যাতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ না করে এবং ঘরে ঘরে যাতে অশান্তি-অস্থিরতা না ছড়ায়, সে জন্যে এ দন্ডের বিধান। যে সমাজে নিন্দাবাদ বিস্তার লাভ করে, সেখানে আস্থা থাকতে পারে না; এর স্থান গ্রহণ করে সন্দেহ-সংশয় এবং ভয়-ভীতির পরিবেশ ঃ

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ٥

- মযলুম ব্যতীত কারো জন্যে আল্লাহ্ প্রকাশ্য নিন্দাবাদ পছন্দ করেন না, আর আল্লাহ্ মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। - সূরা নিসা ঃ ১৪৮

এ অপবাদ যদি স্বামীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় এবং তার কাছে সাক্ষী বর্তমান না থাকে, এহেন পরিস্থিতিতে ঘরের অবস্থা এবং সাক্ষীর দুস্প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম এ জন্যে অপবাদের দন্ড দেয় না, কিন্তু এজন্যে শর্ত হচ্ছে এই যে, নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্যে সে চারবার আল্লাহর শপথ করবে এবং পঞ্চমবার বলবে ঃ সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর লা'নত-অভিশাপ হোক। এমনিভাবে স্ত্রীও দন্ড থেকে রেহাই পায়, যদি সে স্বামীর মিথ্যাবাদিতার জন্যে চারবার শপথ করে এবং পঞ্চমবার বলে সে সত্যবাদী হলে ওর (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللهِ ط اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٥ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٥ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥

- এবং যারা আপন স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া যাদের আর কোন সাক্ষী নেই, তাদের মধ্যে একজনের বাক্য হবে এমন ঃ চারবার কসম খেয়ে সে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী, আর পঞ্চমবার কসম করবে এভাবে- সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত। আর নারী থেকে দন্ড দূর করবে এটা যে, সে চারদফা সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, আমার স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার এভাবে কসম খাবে- সে সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক ঃ - সূরা আন্-নূর ঃ ৬-৯

তালাক

তালাক? তা-তো পরিবারে শান্তি সুদৃঢ়করণের কারণ। আল্লাহর নিকট হালাল বস্তুসমূহের মধ্যে সব চেয়ে অপছন্দীয় হচ্ছে তালাক। কিন্তু তা এমন এক অপছন্দনীয় বস্তু, প্রয়োজন যাকে জায়েয করে। প্রয়োজনের অর্থ হচ্ছে, পরিবারে যখন কোন প্রকারেই শান্তি থাকে না, তখন পরিবারের পরিবেশে সত্যিকার শান্তি স্থাপন করার জন্যে এর প্রয়োজন হয়। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের

নিজেদের ভাষায় প্রকাশ্যে এর সত্যতা এমনভাবে স্বীকার করেন যে, এর বিরুদ্ধে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের আপত্তি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপরন্তু কবিদের স্বপ্নও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। জীবনে কখনো কখনো এমন বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে দাম্পত্য জীবন হয়ে পড়ে অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীকে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে বাধ্য করার পরিণতি শুভ হয় না, এ থেকে আসতে পারে না শান্তি-নিরাপত্তা।

প্রথম পদক্ষেপে বিরোধের সূচনাতেই ইসলাম দাম্পত্য জীবনের পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করে না। শক্তি দিয়ে এ সম্পর্ক বহাল রাখে এবং প্রতিকূল পরিবেশেও তা টিকিয়ে রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টা-যত্নের পর যখন সংস্কার-সংশোধন থেকে নিরাশ হয়ে যেতে হয় এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়, কেবল তখনই ইসলাম তা ছিন্ন করার অনুমতি দেয়। ইসলাম পুরুষকে প্রাকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ٥

-এবং নারীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে না-পছন্দ কর, তবে হতে পারে তোমরা এমন কোন জিনিসকে না-পছন্দ কর আর আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখেন। - সূরা আন-নিসা ঃ ১৯

ইসলাম পুরুষকে দীক্ষা দেয় নারীদের সাথে কোমল আচরণ করার এবং অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সামনে উন্মুক্ত করে এক অজানা জানালা ঃ

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا —

- হতে পারে তোমরা এমন কোন জিনিসকে না-পছন্দ কর আর আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখেন। - সূরা আন-নিসা ঃ ১৯

অর্থাৎ তারা কি জানে, এ সব অপছন্দনীয় স্ত্রীদের মধ্যে কোন বড় কল্যাণকর দিকও নিহিত থাকতে পারে আর আল্লাহ এ কল্যাণের ভান্ড থেকে তাদেরকে উপকৃত করতে চান। তাই তা হাতছাড়া করা তাদের জন্যে সিদ্ধ নয়। তারা যদি তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে না পারে এবং তার মর্যাদা উপলব্ধি করতে না পারে, তখন অন্তত ধৈর্য-স্থৈর্যের পরিচয় তো দেবে! অবচেতন মনের আকর্ষণকে লজ্জাশীলতায় উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করা এবং অপছন্দনীয় ব্যাপারেও ধৈর্য ধারণ এবং এর তীব্রতা হ্রাসের জন্যে এর চেয়ে উন্নত কোন প্রকাশ ভঙ্গি হতে পারে না।

কিন্তু পছন্দ, না-পছন্দের বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়ে যখন ঘৃণা-বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছে, তখনও ইসলামের নিকট এর একমাত্র সমাধান তালাক নয়; বরং ইসলাম বলে, এখন অপর কিছু লোকের উচিত বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করা আর ভালো লোকদের উচিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা সৃষ্টির চেষ্টা করা ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

- আর যদি তোমাদের ভয় হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে সালিশ নিযুক্ত কর। তারা উভয়ে সংশোধণ কামনা করলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে আনুকূল্য সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বাভিজ্ঞ। - সূরা আন্-নিসা ঃ ৩৫

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْاِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط

- আর কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ বা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে উভয়ে আপোষে সন্ধি করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। আর সন্ধি খুবই মঙ্গলজনক। - সূরা আন্-নিসা ঃ ১২৮

এ সালিশীও যদি কল্যাণকর প্রমাণিত না হয়, তবে বিষয়টি চরমে পৌঁছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, এখন আর এদের মধ্যে জীবনের শান্তি-সুস্থিতি অবশিষ্ট থাকতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীকে এ অবস্থায় ধরে রাখার চেষ্টা করা এক অন্তঃসারশূন্য ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। আর ধরে রাখতে বাধ্য করা এর অন্তঃসারশূন্যতায় আরও সংযোজন করে।তখন বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অনিচ্ছা, অনাগ্রহ এবং অপছন্দনীয় হলেও ইসলাম এহেন দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটাতে চায়। কারণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ জিনিস হচ্ছে তালাক। এ তালাক স্বামী-স্ত্রীকে নতুনভাবে পুনরায় জীবন শুরু করার জন্যে তাদের মধ্যে নতুন আগ্রহ-আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে- এমনটিও মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এমনটি বহুবার ঘটেছে যে, কোন কিছু হারালে আমরা তা খোঁজ করি আর তা থেকে বঞ্চিত হলে তার ভালো দিকগুলোকে স্মরণ করি। কারণ এই যে, ভালো সুযোগ নষ্ট হয় না।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط

- তালাক দু'বার। অতঃপর হয় ভালোভাবে কাছে রাখবে, না হয় ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে। - সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৯

স্বামী-স্ত্রীতে মিলন ঘটে থাকলে প্রথম তালাকের পর ইদ্দতের অবকাশকাল থাকে। স্ত্রী অন্তঃসত্তা না হলে এ মুদ্দতের মেয়াদ হয় সাধারণত তিন মাস আর অন্তঃসত্তা হলে এ মুদ্দত হয় শিশু জন্মগ্রহণ করা

পর্যন্ত। পুরুষের ফরয হচ্ছে, এ অবকাশকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা এবং এতে কার্পণ্য না করা। এ সময় স্বামী লজ্জিত-অনুতপ্ত হলে প্রত্যাবর্তনও করতে পারে। প্রত্যাবর্তনের পর নবপর্যায়ে বিয়ে ব্যতীত উভয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। এ হচ্ছে 'রাজঈ তালাক' এবং অতি সহজেই নতুন করে সম্পর্ক বহাল করার যোগ্য।

ইদ্দতের অবকাশকাল যদি প্রত্যাবর্তন ছাড়াই অতিক্রান্ত করে, তবে বায়েন তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এরপরও সুযোগ থাকে। স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে নতুন বিয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারে।

প্রথম তালাক স্বামী-স্ত্রীর জন্যে যেন প্রথম অভিজ্ঞতা- যা তাদের আবেগের রহস্য উন্মোচন করে দেয়। আর যে সব কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার মূল্যও স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণ যদি বারবার সৃষ্টি হয় বা নতুন কোন কারণ দেখা দেয়, আর দ্বিতীয় দফা তালাক দিয়ে দেয়, তবে এখন কেবল মাত্র একটা সুযোগ, তৃতীয় তালাক অবশিষ্ট থাকে। আর তৃতীয় তালাকে নিহিত থাকে এর ভয়ংকর পরিণতি। দ্বিতীয় তালাকের পরও স্বামী-স্ত্রী যদি অনুভব করে যে, নতুনভাবে জীবন শুরু করার শক্তি তাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের আবেগ-অনুভূতিতে ভালোবাসার কোন অংশ এখনও বর্তমান রয়েছে, অবশিষ্ট রয়েছে মনের গভীরে সুপ্ত ভালোবাসা, তাহলে নতুনভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয় তালাকও যদি সংঘটিত হয় তবে এখন ব্যধি গভীরে পৌঁছে। এখন আর চিকিৎসা অর্থহীন। এখন নিজ নিজ পথ ধরাই উভয়ের জন্যে মঙ্গলকর। স্বামী যদি কোন অর্থহীন কর্মে লেগে থাকে, তবে সে কর্ম এবং তাড়াহুড়ার ফল ভোগ করাই এখন তার জন্যে মঙ্গল।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط

- অতঃপর সে যদি (তৃতীয়) তালাকও দিয়ে দেয়, তাহলে অপর কোন স্বামীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত সে স্ত্রী তার জন্যে হালাল নয়। - সূরা আল- বাকারা ঃ ২৩০

কিন্তু জনসাধারণ্যে যে 'হিল্লা' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এ বিবাহ সে 'হিল্লা' হিসেবে হতে পারবে না। ইসলাম এ হিল্লা সমর্থন করে না, ইসলামী আইন তাকে বৈধ বলে স্বীকার করে না; বরং এ বিবাহ হতে হবে সত্যিকার বিবাহ। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিয়্যত হতে হবে স্থায়ীত্বের; কোন নির্দিষ্ট সময়ের নয়। এরপর কখনো কোন কারণে যদি এমন হয় যে, নতুন স্বামীও উক্ত মহিলাকে তালাক দিয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে, তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এরা পরস্পর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে, পারবে নতুন করে জীবন শুরু করতে।

ইসলাম প্রতি পদে প্রতি পর্যায়ে পারস্পরিক সদাচার এবং পুরো ভরণ-পোষণ আদায় করার যে বিধান দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে তা বিস্মৃত হওয়া আমাদের জন্যে মোটেই জায়েয নয়। ইদ্দতের অবকাশকালে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে যাতে প্রেম-প্রীতি গড়ে উঠতে পারে, এ জন্যেই ইসলাম এ নির্দেশ দিয়েছে।

কারণ হতে পারে, একে অন্যের প্রতি পুনরায় ভালোবাসা জাগবে, ব্যবধান হ্রাস পাবে এবং আবার নতুনভাবে শুরু হবে পাক-সাফ জীবন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ج وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط

- আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের ইদ্দত সমাপ্তির নিকটবর্তী হয়, তখন হয় তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে রাখবে, না হয় ভালভাবে বিদায় দেবে। তাদের ক্ষতিসাধনের জন্যে তোমরা তাদেরকে ধরে রাখবে না। যে কেউ এমনটি করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। -সূরা বাকারা ঃ ২৩১

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ - لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

- হে নবী! তুমি যখন নারীদেরকে তালাক দেবে, তাদের ইদ্দতের খাতিরে দেবে এবং ইদ্দত শুমার করবে আর তোমাদের পরওয়ারদিগার আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করবে না আর তারা নিজেরাও বের হবে না। অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করে, তবে স্বতন্ত্র কথা। এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। তোমরা জান না যে, এরপরও আল্লাহ্ হয়ত কোন পথ বের করবেন। অতঃপর তারা যখন নিজেদের ইদ্দতে উপনীত হয়, তখন তোমরা তাদেরকে ভালভাবে বরণ করে নেবে অথবা ভালভাবে বিদায় করে দেবে। এবং নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত সাক্ষী রাখবে এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী কায়েম করবে। যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, এ সব বিধান দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে বের হওয়ার পথ করে দেবেন। -সূরা আত্-তালাক ঃ ১-২

একথাও বিস্মৃত হওয়া ঠিক নয় যে, বিবাহে নারীকে এ শর্ত আরোপ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তার ব্যাপারটি তার নিজের হাতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন মতভেদ দেখা দেবে, তখন স্ত্রীর অধিকারও ঠিক পুরুষের অনুরূপ।

সুতরাং ইসলামে তালাকের স্থান হচ্ছে এই যে, এটা শান্তির একটা পাকাপোক্ত দলীল। কারণ এর প্রয়োগ কেবল তখনই হয়, যখন এ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এরপরও দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্যে একের পর এক চেষ্টা চলে। স্বামী-স্ত্রীকে অবস্থার পরিবর্তন-সংশোধন এবং পরস্পারে প্রত্যাবর্তনের জন্যে বারবার আকৃষ্ট করা হয়। তারা একের পর এক সুযোগ পায়, যাতে নিজেদের আবেগ-অনুভূতির সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারে, পারস্পারিক সম্পর্কে যে ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করতে পারে, একে অপরকে বুঝতে এবং মন-মেজাজ যাচাই করতে যদি ভুল হয়ে থাকে তা তদারক করবে এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করতে পারে।

এখন বলুন, ইসলামের তালাক বিধির সমালোচনা, তাকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত করা এবং বিকৃত আকারে পেশ করার জন্যে গন্ড-মুর্খের দলের গলা কেন গরমে জ্বলে যাচ্ছে? এরা বলে ঃ এটা এমন এক ব্যবস্থা, যাতে পুরুষের ওষ্ঠ থেকে নির্গত একটিমাত্র শব্দ নারীকে সারা জীবন ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী আদর্শবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আসলেই কি এ ব্যবস্থা তাই? না ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু থেকে মানুষের মন দূরে সরে যাওয়ার কারণে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে সমাজের বিচ্যুতির কারণে এবং ইসলামের হাত থেকে শাসন-কর্তৃত্ব দূরে সরে যাওয়ার কারণে এমনটি দেখায়?

সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত বস্তু হচ্ছে তালাক। এটা এমন এক অপছন্দনীয় বস্তু, কেবল প্রয়োজনই যাকে মুবাহ (আইনসিদ্ধ বা অনুমোদিত) করতে পারে। কিন্তু মনে যখন বিকৃতি দেখা দেয়, চরিত্রে যখন ঘটে অধঃপতন, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন এবং বেলেল্লাপনা যখন বিস্তার লাভ করে, তখন দায়িত্ব পরিবর্তিত সমাজের, বিজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত বিধানের নয়। এখন চিকিৎসার উপায় এ নয় যে, মুবাহ বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে, হালালকে করতে হবে হারাম; বরং চিকিৎসার সঠিক উপায় হচ্ছে শাসন-কর্তৃত্ব, আইন-শৃংখলা এবং প্রতিষ্ঠানিক প্রশাসন ইসলামের হাতে প্রত্যর্পণ করা। এমনটি হলে ইসলাম গোটা সমাজকে তার শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে পারবে। ইসলামের আইন-বিধান সে দুনিয়ার জন্যে, যার কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে; সে ব্যবস্থার জন্যে, যার বুনিয়াদ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর সে সমাজের জন্যে ইসলামের আইন-কানুন, যে সমাজের লালন করছে ইসলাম।

এখন শাসন-কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে ন্যস্ত করা হোক, যাতে মানুষের মনকে গড়ে তুলতে পারে, জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের হৃদয়কে, বেয়াড়া এবং উদাস মানুষের হাতকে পারে রুখতে, ইসলামের পূর্ণ অভিপ্রায়কে পারে প্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলামের আইন এরই অংশবিশেষ।

এরপরও আমি মনে করি, আমাদের মত পথভ্রষ্ট এবং ব্যধিগ্রস্থ সমাজকে তালাকের গন্ডিতে আবদ্ধ করে রাখার দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নারী তার জীবন এবং মান-সম্মানের কি করবে? সে কি চাইবে যে, পুরুষ তাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিক আর আইন তাকে জোর করে ধরে রাখুক? সে কি এটাও চাইবে যে, পুরুষ তালাককে একটা খেলনায় পরিণত করুক কিন্তু কোন অবস্থায়ই তার তালাক না হোক? এ সব অর্থহীন কর্মকান্ড এবং তামাশার পরিণতি কি এ হবে না যে, নারীকে সে গৃহে

জোরপূর্বক প্রবেশকারিণী বলে মনে করা হবে? আফসোস! এসব কর্মহীনা উদাস-প্রাণা নারীরা নারীদেরকে কোন্ ধরণের সম্মান ও মর্যাদা দিতে চায়? আল্লাহ তা'আলা তো চান নারীরা সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা লাভ করুক, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে, আল্লাহর বিধান থেকে পলায়ন করে মূল্যহীনা মর্যাদাহীনা হয়ে রয়েছে।

বিবাহ একটা পবিত্র সম্পর্ক। সন্তুষ্টি এবং গ্রহণের মাধ্যমে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেবল এ সন্তুষ্টি আর গ্রহণের ওপরই টিকে থাকতে পারে। এ পবিত্র সম্পর্ক তার উন্নত নীতির ওপর টিকে থাকুক- কেবল তালাকের ব্যবস্থাই তার গ্যারান্টি দিতে পারে। এ সব কিছুর পরও যদি তার জিঞ্জির খুলে যায়, তবে তার স্পষ্ট অর্থ এ দাঁড়াবে যে, এটা টিকে থাকার যোগ্য ছিল না, স্বামী-স্ত্রীর জন্যে এখন সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে মর্যাদাকর কাজ হচ্ছে, তারা এক নতুন জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ুক ঃ

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ০

- আর তারা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আপন অসীম ভান্ডার থেকে আল্লাহ সকলকে ধনী করবেন। আল্লাহ বিশাল ব্যপ্তির অধিকারী মহা কুশলী। - সূরা আন্-নিসা ঃ ১৩০

বহু বিবাহ

বহু বিবাহের অনুমতি আর একটি প্রয়োজন, যা আপন বৃত্তে শান্তি সুদৃঢ় করার দায়িত্ব পালন করে, যেমন তালাকের প্রয়োজন দাবি অনুযায়ী এ কাজ করে থাকে। ইসলামে এর স্থান হচ্ছে নিছক একটি সামাজিক রক্ষাকবচের মত, যার মাধ্যমে তা ব্যক্তির সংমিশ্রণ এবং স্বামী-স্ত্রীর খাহেশের চেয়েও বড় আশংকা থেকে রক্ষা করে।

পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ 'সমাজের শান্তি' হচ্ছে এ প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনার উপযুক্ত স্থান। কারণ সে অধ্যায়ের সাথেই এর নিকটতম এবং উপযুক্ত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘরের শান্তির সাথে তার যে একেবারে সম্পর্ক নেই, কোন পরিচয় নেই, তা নয়। কারণ বাস্তবতার বিচারে ব্যক্তি, গৃহ, সমাজ এবং মানবতা-এ সবই একে অপরের সংগে সংশ্লিষ্ট, একে অন্যের সহায়ক এবং একই নিয়ম-শৃংখলার অধীন। এ সত্য কেবল বাস্তবেই নয়; বরং এটি হচ্ছে জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

ইসালামে বহু বিবাহের অনুমতিকে কেন্দ্র করে এক দীর্ঘ প্রলাপ বিস্তার লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজ-জীবনে এ অনুমতি সত্যিই কি এক মহা-আপদ? এটা কি কখনো এক বিরাট শংকায় পরিণত হতে পারে? আর ইসলাম যে এর অনুমতি দিয়েছে, তা রদ বা কোণঠাসা করার জন্য কি কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে?

আমি যতটা চিন্তা করে দেখেছি, যে কোন সামাজিক সমস্যা আইনের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী, যাতে সে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায় বা তাকে আইনের অনুসারী করা যায়। একমাত্র বহু বিবাহ সমস্যাটি

এর ব্যতিক্রম। তা নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করে। সমাজে যখন এর প্রয়োজন পড়ে, সামাজিক কাঠামো, রীতি-নীতি এবং প্রয়োজন যখন এটা দাবি করে, তখনই তা অস্তিত্ব লাভ করে।
এটা এমন এক সমস্যা, যাতে অংক শাস্ত্রের সংখ্যার কর্তৃত্ব চলে, দর্শন বা আইনের নয়। মানুষের মুখে তাকে চিবিয়ে রসিয়ে আলোচনা করা কিভাবে বৈধ হয়েছে আর কিভাবে তা গ্রহণ-বর্জন এবং আলোচনা-সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তা আমার জানা নেই।

সব জাতির মধ্যে নারীও থাকে, পুরুষও থাকে। আর যখন বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা-যারা এ জন্যে প্রস্তুত এবং আগ্রহী, বিবাহযোগ্য নারীদের, যারা বিয়ের প্রত্যাশী-সংখ্যার সমান হয়, এমন পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক নারী হাসিল করা কার্যত অসম্ভব। কারণ এ ক্ষেত্রে আসল কর্তৃত্ব হচ্ছে অংকের সংখ্যার।
একজন পুরুষের একাধিক নারী অর্জনের সামর্থ্য থাকার অর্থ অন্য কথায় এ হতে পারে যে, সেখানে বাড়তি নারী বর্তমান রয়েছে, যারা নিজেদের জোড়া খুঁজে পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে এমন পুরুষের সত্যিকার বা কাল্পনিক অনুপস্থিতি এক সমান। মানে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী বা বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশী এবং সকল বিবেচনায় এ জন্যে সক্ষম বা সামর্থ্য থাকাকালে তারা বিয়ের জন্যে আগ্রহীও।

বিবাহযোগ্য নারীর সংখ্যা যদি কার্যত বা কাল্পনিকভাবে পুরুষের চেয়ে বেশী না হয়, যেমন আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি, একজন পুরুষের একাধিক নারী অর্জন করা সেক্ষেত্রে অসম্ভব। পুরুষ এমনটি করতে চাইলেও পারবে না। এ অবস্থায় গণিতের ধারায় আপনা-আপনিই বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু পক্ষান্তরে যখন জাতীয় ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর তুলনায় হ্রাস পায়, এ সংখ্যাস্বল্পতা আদম শুমারীর বিবেচনায়- যেমন যুদ্ধ এবং মহামারীর পর হয়ে থাকে, অধিকন্তু পুরুষই যার শিকার হয়ে থাকে বা অপর কোন কারণে এটি হোক বা অর্থনৈতিক, বংশগত বা সাধারণ সামাজিক কারণে বিয়ের সামর্থ্য না থাকার কারণে এ সংখ্যা স্বল্পতা হোক। কেবল এ পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ একাধিক নারী গ্রহণ করার সুযোগ পায়।
এখন আমরা বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখব। অধুনা এর নিকটতম উদাহরণ হচ্ছে জার্মানী, যেখানে বিবাহযোগ্যা তিনজন যুবতীর জন্যে রয়েছে একই বয়সের মাত্র একজন পুরুষ (২০ এবং ৪৫ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়সের)। স্পষ্ট যে, এ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে আইন প্রণেতার সম্মুখে সমাজ, নারী-পুরুষ এবং মানব-মন-এ সবের ভালোমন্দ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে তিনি কি করবেন। এ ক্ষেত্রে সমস্যার তিনটি সমাধান সম্ভব ঃ

প্রথম সমাধান

প্রথম সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রতিটি পুরুষ কেবল একজন নারীকে বিয়ে করবে এবং অবশিষ্ট দু'জন নারী বিবাহ মুক্ত থাকবে। তারা জীবনে কোন পুরুষ-ঘর-বাড়ী-পরিবার কিছুই চিনবে না, দেখবে না কোন শিশুর মুখও!

দ্বিতীয় সমাধান

সমস্যার দ্বিতীয় সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে আর অপর দু'জন বা তাদের কোন একজনের সাথেও মিলিত হবে। এর ফল হবে এই যে, উক্ত নারী তার জীবনে পুরুষের সাথে তো পরিচিত হবে, কিন্তু গৃহ, পরিবার এবং সন্তান সম্পর্কে অপরিচিতা থাকবে। গভীর নারীসুলভ উত্তেজনার কারণে তার সন্তান জন্ম নিলেও এর ফলে সে অপরাধের পথ সম্পর্কে অবহিত হবে। এ শিশুকে নানা অপবাদের সম্মুখীন হতে হবে; আর সে পরিণত হবে সন্দেহ-সংশয়ের লক্ষ্যবস্তুতে। কোন পরিচিত পিতাকে সে চিনতে পারবে না। এ নারী এবং তার মা'সুম শিশু কলংকের বোঝা বহন করে যাবে, কেবল দুর্ভাগ্যই হবে তাদের ললাটের লিখন।

তৃতীয় সমাধান

সমস্যার তৃতীয় সমাধান হচ্ছে এই যে, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে বিয়ে করবে এবং এদের সকলকে স্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে। ফলে উক্ত নারী পাবে ঘরের শান্তি, পরিবারের গ্যারন্টি এবং শিশুদের দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ। আর স্বয়ং উক্ত পুরুষও তার মনকে রক্ষা করতে পারবে পাপ-পংকিলতার আবর্ত, পাপের অস্থিরতা এবং চিত্তের অশান্তি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজকে আইন-শৃংখলাহীনতার পংকিলতা, বংশধারার সংমিশ্রণ এবং অশ্লীল জীবন থেকে হিফাযত করতে পারবে। সে জাতিকে এক নতুন বংশ উপহার দিয়ে সংকট উত্তরণের সুযোগ করে দেবে, যাতে এ বিপর্যয়ের কারণ, যুদ্ধ এবং মহামারীর পর পরিপূর্ণ ভারসাম্য ফিরে আসবে!

তিনটি সমাধান পাঠকের সামনে পেশ করা হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ অবস্থায় কোন্ সমাধানটি মানবতার জন্যে অধিক উপযোগী, পৌরুষ শক্তির জন্যে অধিক সমীচীন এবং স্বয়ং নারীর ইযযত-আবরুর জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর?

এ এমন এক পর্যায়, যেখানে কোন একটিকে বেছে নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে না যে, এ সমাধান গ্রহণ করবো, না ও সমাধান, দ্বিতীয়টি অবলম্বন করবো না তৃতীয়টি। এখানে কবির আবেগ, ব্যক্তির অভিলাষ বা অন্তঃসারশূন্য প্রলাপের কোন স্থান নেই। এটা একটা সামাজিক, আত্মিক এবং বস্তুগত প্রয়োজন। এর মুকাবিলা করতে হবে বাস্তবতা এবং কার্যসীমার মধ্যে, কল্পনা জগত এবং স্বপ্নরাজ্যে নয়। এসব বাস্তবতার আলোকে খ্রীষ্টবাদী জার্মান- যার ধর্ম বহু বিবাহকে অবৈধ মনে করে- অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সে পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ইসলাম উপস্থাপন করেছে। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জার্মানী ইসলামকে স্বীকার করে না, কিন্তু সমস্যাটির যে সমাধান ইসলাম উপস্থাপন করেছে, তাকেই গ্রহণ করে।

কেউ হয়ত বলতে পারে : নারী এখন নিজে জীবিকা উপার্জন করে চলতে সক্ষম। তাই জীবন যাপনের জন্যে পুরুষের কোন প্রয়োজন নেই তার, পুরুষের সহায়তা ছাড়াই সে এখন জীবন যাপন করতে সক্ষম।

এ উক্তি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং বাস্তবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় মিথ্যা উক্তি। কারণ, নারীর জন্যে পুরুষের এবং পুরুষের জন্যে নারীর প্রয়োজন কেবল পানাহার বরং কেবল দৈহিক দাবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও একথা যথাস্থানে সত্য যে, অর্থ-সম্পদ এবং খাদ্য ও পানীয় বস্তু এই দাবির বিনিময় হতে পারে না, বরং প্রত্যেক নারীর অস্তিত্বে নিহিত রয়েছে একজন পুরুষকে গ্রহণ করার এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন। নারী যেমন তার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তেমনিভাবে সে স্বীকার করে এ প্রয়োজনটিও। অনুরূপভাবে পুরুষের অনুভূতিও এ থেকে ভিন্ন নয়। এ কারণে একজন পুরুষের জন্যে কোন নারীর প্রণয়াসক্ত হওয়া তার কাছে বড় কথা। নারীর জন্যে পুরুষের প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে সে নারীর বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে- কোন কোন বস্তুবাদী দর্শন ও ধর্মের বাহ্য প্রবক্তাদের অর্থনৈতিক কারণের এহেন অলীক ধারণা এ থেকেই অসার প্রমাণিত হয়। কারণ, নারীর তো পুরুষের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন কোন নারী একজন পুরুষকে পছন্দ করে, তখন সে কেন এতটা আনন্দ-স্ফূর্তি অনুভব করে, কেন নিজেকে সবচেয়ে ভাগ্যবান এবং গৌরবান্বিত মনে করে- যতটা অপর কিছুতে অনুভব করে না। এর কি-কারণ? নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর অসীম শক্তির মহান ইচ্ছা, যিনি নারী-পুরুষের মধ্যে এ প্রয়োজনটি নিহিত রেখেছেন, যাতে উভয়ের মাধ্যমে জীবন অস্তিত্ব লাভ করে, এবং পুনর্গঠন ও ক্রমবৃদ্ধির কাজে উভয়কে নিয়োজিত রাখেন। সুতরাং বিশ্বে যতদিন এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি বজায় থাকবে, যেখানে নারী-পুরুষের সংখ্যায় ভারসাম্য হ্রাস পাবে অথবা একেবারে বিলীন হয়ে যাবে, ততদিন সবচেয়ে সম্মানজনক সমাধান, উত্তম চিকিৎসা এবং নিরাপদ উপায় হবে ইসলামের উপস্থাপিত এ অনুমতিকে গণিতের সংখ্যার ওপর ছেড়ে দেয়া। এ অনুমতি নিজেই নিজের চিকিৎসা করে। কারণ এটা তখনই পাওয়া যায়, যখন সঠিক সংখ্যাতত্ত্ব তার অস্তিত্ব দাবি করে। যখন গাণিতিক প্রয়োজন থাকবে না, তখন মানুষ চাইলেও এ অনুমতির অস্তিত্ব থাকবে না।

যে সব নারী-পুরুষ অর্থহীন প্রলাপোক্তি করে, একান্ত স্পষ্ট বাস্তবও যারা উপলব্ধি করতে পারে না, আমি এখন অগ্রসর হয়ে এসব লাগামহীন উক্তির প্রবক্তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই ঃ তোমরা কি এমনটি ঘটতে দেখেছ বা শুনেছ যে, মিসরের একজন নওজোয়ান বিয়ে করতে চায় কিন্তু সেখানে অপর একজন বিলাসী, অভিলাষী, কামুক, বিত্তবান ব্যক্তি একাধিক মেয়ে বিয়ে করে বসে থাকার কারণে উক্ত নওজোয়ান বিয়ে করার জন্য কোন পাত্রী খুঁজে পায়নি, উক্ত পুরুষ আর একজনকে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, কারণ সেখানে যুবতী নারীর সংখ্যা অপ্রতুল?

হাঁ, এমন পরিস্থিতি আমার জানা আছে, যেখানে উত্তেজনা, হঠাৎ অর্জিত টাকা বা পাশবিক বৃত্তিই এর কারণ হয়েছে যে, মানুষ বহু বিবাহের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা আমরা একটু পরেই স্পষ্ট করে তুলে ধরবো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি ঃ উক্ত ব্যক্তি কি কারো হাত থেকে নারী ছিনিয়ে নিয়েছে, না পরিস্থিতি এমনি ছিল যে, সে সমাজ একজন অবিবাহিতা নারী পেয়েছে, যে বিয়ের জন্যে কোন পুরুষ খুঁজে পাচ্ছিলো না? আমি নিশ্চিত যে, উক্ত ব্যক্তি যদি এ অবিবাহিতা নারী না পেতো তাহলে পাশবিক বৃত্তি, ক্ষণেকের উত্তেজনা বা হঠাৎ অর্জিত টাকার গরমের দাবিতে বিয়ের মাধ্যমে সাড়া দিতে পারত না। এ বিষয়ে কি কোন বিরোধ থাকতে পারে?

এখানে বলা যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক বা অন্য কোন সামাজিক কারণ কোন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে বাড়তি শক্তি যোগাতে সহায়ক হয় এবং অন্যদেরকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ অবিবাহিতা নারীদের অস্তিত্ব এ কথার প্রমাণ নয় যে, কোন কোন পুরুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিতে স্বল্পতা রয়েছে।

সত্য বটে! কিন্তু এর উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে সমাজ দেহে বিকৃতি সাধনকারী সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করা। বিয়ের অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এর চিকিৎসা নয়। এটা একটা সাময়িক চিকিৎসা, যা ব্যাধির গোপন কারণের মূলোৎপাটন করে না।

বিষয়টি ইসলামের হাতে ছেড়ে দেয়া হলে ইসলাম সামাজিক বিকৃতি এবং অর্থনৈতিক শূন্যতা পূরণ করবে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম সমাজে সার্বিক ভারসাম্য স্থাপন করে, সমাজের সকল সদস্যের জন্য সরবরাহ করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা। এসব নিরাপত্তার অন্যতম হচ্ছে এই যে, বিয়ের সময় স্ত্রী এ শর্ত আরোপ করতে পারবে যে, স্বামী তার ওপর আর একজন স্ত্রী এনে তাকে উত্যক্ত করবে না। সুতরাং এ শর্ত অনুযায়ী পুরুষ হয় দ্বিতীয় বিয়ে করতেই পারবে না, বা করলেও করতে পারে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়েই! কারণ শর্ত অনুযায়ী তালাক দাবি করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে।

অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, ইসলাম বিষয়টির চিকিৎসা করে সামগ্রিকভাবে। খুঁটিনাটি বিষয় আপনা-আপনিই সেরে যায়। ইসলাম খণ্ডিত অংশের মামুলী এবং খণ্ডিত সমাধান দিয়ে চিকিৎসা করে না। অজ্ঞ-মূর্খ এবং লাগামহীন প্রলাপোক্তির প্রবক্তা নারী-পুরুষের অভিলাষ অনুযায়ী এমন সংকীর্ণ-সংক্ষিপ্ত পরিসরের চিকিৎসা করে না, যা দু'কদমের বেশী অগ্রসর হতে পারে না।

ইসলাম এ বাস্তব তত্ত্ব সম্পর্কেও উদাসীন নয় যে, কোন কোন পুরুষের মধ্যে এমন অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিও থাকে, যা এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, বরং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্রীর সন্ধানে থাকতে বাধ্য হয়। এরা যদি ভদ্রভাবে, প্রকাশ্যে বিয়ের মাধ্যমে অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করতে না পারে, তবে কোন না কোন প্রকারে পাপাচারের মাধ্যমে হলেও সে তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে। এমনিভাবে সমাজ কেবল অশান্তিরই শিকার হয় না; বরং প্রথম স্ত্রী এবং পরিবারও মানসিক অশান্তি এবং বিশৃংখলার ভাগাড়ে পরিণত হয়। পরিবারে সন্দেহ-সংশয় লালিত হবে এবং তার পরিবেশ থেকে শান্তি-স্বস্তি বিদায় নেবে।

সতর্কতা এবং মুক্তির দাবি কি এই নয় যে, এহেন প্রকৃতির জন্যে আমরা সুশৃংখল দাম্পত্য জীবনের পরিধিকে আরও কিছুটা বিস্তৃত-সম্প্রসারিত করবো? না তাদেরকে চুরি, ষড়যন্ত্র, নিজেকে এবং অন্যদেরকে পংকিলতার আবর্তে নিমজ্জিত করার জন্যে ছেড়ে দেব; যাতে করে জনগণের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করতে পারে, যেমনটি কার্যত ঘটেছে ইউরোপে? ইউরোপে বহু বিবাহের ভদ্র ব্যবস্থার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু আজ সেখানে সব দিক থেকে ব্যভিচার এবং অশালীন বন্ধুত্বের মুকাবিলা করতে হচ্ছে।

এ ধরণের মনস্কামনার মুকাবিলা যদি বাস্তব জীবনে নারী-পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তনের আকারে দেখা দিত, তাহলে এ সব মনস্কামনাকে আদৌ গ্রাহ্য না করে তা দমন করা ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হতো। এমন হলে ইসলাম শান্তির বিধান করে স্বামীকে এক স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ রাখত এবং শেষ পর্যন্ত এ সব মনস্কামনার বিনাশ ঘটাতো। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত অংকের পরিসংখ্যান পর্যন্ত গড়ায়। এ ব্যাপারে এ-ই হচ্ছে চূড়ান্ত কথা, নিছক সীমা নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ শেষ কথা নয়।

সম্ভবত এখানে তর্কের খাতিরে প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ ব্যাপারটি যখন এমন, যা আপনি উল্লেখ করেছেন, তাহলে ইসলাম বহু বিবাহের শেষ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে কেন? ইসলাম কেন বিষয়টিকে সরাসরি জীবনের প্রকৃতি এবং গাণিতিক সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়নি?

এটা নিছক একটা দ্বান্দিক বিতর্ক। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামে এ অনুমতির বিধান আর প্রয়োজনের কাল-ক্ষণ-সময়ের দাবির ওপর নির্ভর করে। আর প্রয়োজনের শেষ দাবির পরিমাণ হচ্ছে চার। আর এর কারণ হচ্ছে, সংখ্যার বিচারে সমাজের বিকৃতি সাধারণত এ সীমার চেয়ে বেশী হতে পারে না; বরং এ সীমা পর্যন্তও কমই পৌছে থাকে। উপরন্তু চার-এর সীমাবদ্ধতা এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রয়োজনের তাগিদেই বহু বিবাহের স্বাধীনতা, এটা কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ অনুমতি আদল বা ন্যায় বিচারের শর্তসাপেক্ষে, শর্তমুক্ত নয় ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً –

- অতঃপর তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা আদল বা সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রী (নিয়েই তুষ্ট থাকবে)। - সূরা আন্-নিসা ঃ ৩

এখানে 'আদল'-এর অর্থ খোরপোশ, সহবাস এবং আর্থিক, দৈহিক ও মনস্তাত্বিক, সকল প্রকারের সুবিচার। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি মনের বিশেষ আকর্ষণ- যা জীবনের বাহ্যিক আচরণে প্রভাব বিস্তার করে না- ক্ষেত্রে সুবিচার করা মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। এ ক্ষেত্রে কেবল এটুকু কাম্য যে, এ আকর্ষণ প্রকাশ করা যাবে না, যাতে অপর স্ত্রী ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط

- আর তোমরা যতই লোভ কর না কেন, স্ত্রীদের মধ্যে (সব দিক থেকে) সুবিচার কখনো করতে পারবে না। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে একদিকে ঝুঁকে পড়বে না, যাতে অপর স্ত্রীকে ওদিকে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখবে। - সূরা আন্- নিসা ঃ ১২৯

যারা বিষয়টিকে কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তারা ভুল করে। দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে প্রথম স্ত্রীর উপলব্ধি করা আদৌ অসম্ভব নয়। কিন্তু সে স্ত্রীকে কখনো ইনসাফপরায়ণ বলা যায় না, যতক্ষণ না সে নিজেকে বিয়ের জন্যে পড়ে

থাকা নারীর স্থানে রেখে বিবেচনা করে। সে তার স্থানে হলে এমন পুরুষকে কিগ্রহণ করতো না, যে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন শরীফ স্ত্রী করার জন্যে তার প্রতি অগ্রসর হয়, অভিযুক্তা এবং নীচ দাসী হিসেবে নয়? এমনিভাবে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেমন, সে রোগাক্রান্ত স্ত্রীর কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, যার স্বামী তাকে তালাকও দিতে চায় না, আবার তার সাথে সুষ্ঠু জীবনও যাপন করতে পারে না। সে বন্ধ্যা স্ত্রীর কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে স্বামীর অতি প্রিয়, অথচ সে সন্তানও জন্ম দিতে পারে না। আর স্বামী তাকে তালাকও দিতে পারে না! ইত্যাদি ইত্যাদি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। অনুমতি দিয়েছে জীবনের সকল দিক-বিভাগকে সুষম এবং সুশৃংখল করার জন্যে। ইসলাম জীবনের সকল আশা-আকংখা এবং প্রয়োজনের সঠিক মূল্যায়ণ করে, দুঃখ-ব্যাথা-বেদনা এবং অসুবিধার তুলনা করে সবচেয়ে কম ক্ষতি এবং সম্মানজনক ক্ষতিকে গ্রহণ করেছে। দায়িত্বহীন নারী-পুরুষকে ইসলাম গ্রাহ্য করে না। কারণ ইসলাম এ সবের অর্থহীন উক্তি থেকে অনেক উর্ধে।

পারিবারিক নিরাপত্তা

স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব থেকে সামনে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম গোটা পরিবারের শান্তি-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, যারা এক গৃহে অবস্থান করে। ইসলাম পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুবিন্যস্ত করে এবং সকলের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগত করে। এতে কিছু অধিকার ও কর্তব্য থাকে, থাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা এবং কিছু দায়-দায়িত্ব। এ সবেরই ফল হয় পারস্পরিক আস্থা, জীবন ও ভবিষ্যতের শান্তি-নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অনুভূতি।

শিশুর লালন-পালন এবং দেখাশুনায় মাতার আদর-যত্নের অনুভূতিই যথেষ্ট আর তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং অর্থ ব্যয়ের জন্যে পিতার পিতৃসুলভ অনুভূতিই যথেষ্ট। কিন্তু ইসলাম এ গভীর আদর-যত্নের অনুভূতির ওপরও স্পষ্ট বিধান সংযোজন করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি জীবনের অন্যান্য বিভাগের মত। ইসলাম মানব অস্তিত্বে আকীদা বিস্তার করে, অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এরপর বিধানকেও গোপন বা অস্পষ্ট রাখে না। নিছক আবেগ-অনুভীতির উপরও তা ছেড়ে দেয় না। ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা তাকে সীমায়িত করে এবং আইন প্রণয়ন দ্বারা তার সহায়তা করে। এমনিভাবে শিশুর অধিকার সম্পর্কেও ইসলাম এসব কিছু করে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق

আর মায়েরা শিশুদেরকে পূর্ণ দু'বৎসর দুধ পান করাবে, যে দুধ পান করনোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর যারা দুধ পান করায়, তাদের খোরপোষের দায়িত্ব নিয়ম মাফিক পিতার। শক্তি-সামর্থ্যের বেশী

যেন কাউকে কষ্ট দেয়া না হয়। শিশুর জন্যে মাতাকে এবং সন্তানের জন্যে পিতাকে কষ্ট না দেয়া হয়।
- সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩

এ-তো হচ্ছে পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য। এর বিপরীতে তাদের কিছু অধিকারও রয়েছে, আর ইসলামে প্রত্যেক অধিকারের বিপরীতে রয়েছে দায়িত্ব-কর্তব্য। তাদের দায়িত্বের তুলনায় এ অধিকার কিছুটা বেশী। কারণ, পিতৃ-মাতৃ-সুলভ সম্মান-মর্যাদা এবং আদরও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যথার্থ পরিমাণে। এমনিভাবে বার্ধক্যে তাদের প্রতি দয়ানুগ্রহও রয়েছে। কুরআন যে ভাষায় এসব অর্থ ব্যক্ত করে, তা থেকে মেহেরবানী, দয়া, অনুগ্রহ, নম্রতা, কোমলতা এবং স্বচ্ছতা ফুটে ওঠে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ٥

- এবং তোমার পরওয়ারদিগার ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ধমক দেবে না। কোমল ও বিনয় সহকারে কথা বলবে তাদের সাথে এবং দয়া-অনুগ্রহের কারণে তাদের জন্যে বিনয়ের বাহু অবনত করবে এবং বলবে ঃ পরওয়ারদিগার! তাঁরা আমাকে শৈশবে যেমনিভাবে (আদর-যত্ন করে) লালন-পালন করেছেন, তুমিও ঠিক তেমনি তাদের প্রতি মেহেরবানী কর। -সূরা আল-ইসরা ঃ ২৩-২৪

মাতার অতিরিক্ত কষ্ট ও দয়ার কারণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّه وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُه فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ٥

- আর আমরা মানুষকে তাদের মাতাপিতার ব্যাপারে ওসীয়ত করেছি। মা দুঃখের ওপর দুঃখ ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তাকে দুধ ছাড়িয়েছে। (আমরা নির্দেশ দিয়েছি) যে, তুমি আমার এবং মাতাপিতার শুকরিয়া আদায় কর। ফিরে আসতে হবে তো আমার দিকেই। -সূরা-লুকমান ঃ ১৪

আর একটি দিক থেকে আয়াতদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরী। প্রথম আয়াতে মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর ইবাদতের সাথে একাকার করা হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে তাঁদের প্রতি শুকরিয়াকে আল্লাহর শুকরিয়ার সাথে সংযোজিত করা হয়েছে। এ সংযোজন দ্বারা যে তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

পরিবারের সকল সদস্য পারস্পরিক দায়িত্ববোধের অন্তর্ভুক্ত। এর বিধান প্রথমে নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তায়, এরপর আসে দূরবর্তী আত্মীয়ের পালা। উত্তরাধিকার আইনও এভাবে শুরু এবং শেষ হয়। এটা এজন্যে, যাতে পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি এবং সরকারের ওপর যে সামাজিক নিরাপত্তা অর্পিত হয়েছে, এ দায়িত্ববোধ তার অতিরিক্ত। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

এ বিস্তৃত পারিবারিক দায়িত্ববোধ এবং গার্হস্থ্য বিষয়ের উপরে বর্ণিত ইসলামী বিধি-বিধান গার্হস্থ্য বিষয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিমূল। এ সম্পর্কে ইসলামের নীতি- যা আমরা ইতোপূর্বেও আলোচনা করেছি, এই ঃ যে ব্যক্তি ঘরে শান্তি পায় না, সে শান্তির মূল্য বুঝতে পারে না কখনো, পারে না শান্তির স্বাদ আস্বাদন করতেও। যে ব্যক্তির রগ-রেশায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মনে অশান্তি আত্মায় অস্থিরতা বিরাজমান, সে কি করে শান্তির নিষ্ঠাবান কর্মী হবে ?

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজের শান্তি

সমাজে সদস্যদের স্বার্থ পরস্পর বিজড়িত। তাদের আশা-আকাংখা বিপরীতধর্মী, বিভিন্নমুখী। সেখানে টানা-হেঁচড়া চলে দেদার, আদান-প্রদানের চলে পুনরাবৃত্তি! সেখানে ব্যক্তির মধ্যে চিন্তাধারা এবং পণ্য-সামগ্রীর বিনিময় হয়, দল-গোষ্ঠী একে অপরের সাথে কাজ-কারবার চালায়। বিভিন্ন শক্তি মিলে মিশে কাজ করে, একে অপরকে প্রভাবিত করে, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি-গৃহ-পরিবার সবই সমাজে লীন হয়ে যায়। সমাজের বিশাল প্রাচীর সকলকে বেষ্টন করে নেয়, সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কার্যকর থাকে। সমাজ এ সব কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়, সবকিছুকেই সে প্রভাবিত করে।

কোন কোন সমাজ দর্শনের ধারণা এই যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর চিরন্তন সংঘাত এবং শত্রুতার সম্পর্ক পাওয়া যায়। আর ব্যক্তি এবং ক্ষমতার মধ্যে থাকে সবসময় শক্তি পরীক্ষার সম্পর্ক। পক্ষান্তরে ইসলাম ঘোষণা করে যে, তাদের সকলের মধ্যে রয়েছে প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক। ইসলামের নির্ধারিত নীতি এই যে, যে ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে দায়িত্ব কর্তব্যের পারস্পরিক ভারসাম্য, সাযূজ্য, মুনাফা ও দায়িত্বের ইনসাফভিত্তিক বন্টন, শ্রম ও বিনিময়ের মধ্যে সত্যিকার ভারসাম্য। ইসলাম একথাও বলে যে, তাদের সকলের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে জীবনে বেঁচে থাকা, জীবনকে বিকশিত করা, উন্নতি-অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া। তাদের যে কোন ক্রিয়া-কর্ম, চিন্তা-চেতনায় জীবনের স্রষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্মুখে থাকতে হবে।

এখান থেকেই সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টা-সাধনা-সংস্থা-সংগঠন, উৎপাদন-উন্নয়ন-সবকিছুরই দিক নির্ণীত হয় সর্বাত্মক শান্তির পানে। বিভিন্নমুখী আশা-আকাংখা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শক্তি-সামর্থ্য ব্যক্তি-সমাজ এবং সংগঠনের মধ্যে আইন-শৃংখলা ও ভারসাম্য স্থাপন করে এ সর্বাত্মক শান্তি। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতা সৃষ্টি করে এমন সাময়িক স্বার্থের দিগন্ত ছাড়াও এখানে রয়েছে আরও এক উন্নত দিগন্ত।

যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তার লালন হয়েছে, তারই যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি হচ্ছে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। এ পরিবেশ হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার পরিবেশ, যা জীবনের তাৎক্ষণিক এবং নিকটতম স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার করে না কখনো। মানুষের দৈহিক সত্তার বাইরে বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশীলতার একটা সত্তাও রয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাও স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে। এহেন বস্তুবাদী দর্শন যখন মানুষের গোটা জীবনের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়া আর কিসের অবকাশই বা থাকতে পারে? সমাজে থাকতে পারে না কাজ আর উৎপাদনমুখী আইন ছাড়া অপর কোন আইনের অবকাশ। এ কারণে শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়টি একটা

বাস্তব বস্তুগত তত্ত্বে পরিণত হয়েছে, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব, তা থেকে দূরে থাকারও কোন অবকাশ নেই। আর এমনিভাবে এ সম্পর্কে অনবহিত থাকারও কোন উপায় নাই।

কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শন যখন জীবনের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে, ইসলামের সমাজ দর্শন যখন কার্যত প্রতিষ্ঠার রূপ নেয়, আল্লাহর আইন ঠিক তেমনিভাবে ব্যাখ্যা করে, যেমনিভাবে আল্লাহ চাহেন- পেশাদার ধর্মীয় ঠিকাদাররা তার যে ব্যাখ্যা করে সেভাবে নয়- তখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিহার্যতা এমন বিষয়ে পরিণত হবে, বাস্তবতা এবং যুক্তি-বুদ্ধির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ হচ্ছে এই যে, ওসব সমস্যার ভিন্ন এক পরিবেশে, এ সবের জীবন ব্যবস্থাও তাদের নিজেদের তৈরী। সে পরিবেশে রয়েছে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কর্তৃত্ব। এ সব বিষয় তা থেকেই জীবন-রস গ্রহণ করে। এ সব বস্তুবাদী দর্শন জীবনের উন্নততর লক্ষ্যকে করে অস্বীকার।

ইসলাম কোন ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা দলবিশেষের সুযোগ-সুবিধার ওপর এ শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে না। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের কর্তৃত্ব ইসলামের সম্মুখে থাকে না। ইসলাম সকলের জন্যে সকলের ওপর এ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সকল শ্রমজীবিকে তার ন্যায্য পাওনা দেয়, সকল অভাবী ব্যক্তির অভাব পূরণ করে, সকল ব্যক্তি-গোষ্ঠী এবং সকল কর্তৃত্বের জন্যে কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেয়, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বাত্মক শান্তি। কোন ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা কোন রাজনৈতিক দল ইসলামী আইন প্রণয়ন করে না। কেবল ইসলামী আইনই এমন এক আইন, যা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব এবং রাজনৈতিক সমঝোতা থেকে মুক্ত। এ কারণে তা এক শ্রেণীর ওপর অপর শ্রেণীর যুলুম-সিতমের পথে প্রতিবন্ধক হয়। আজকের বস্তুবাদী দর্শন যে শ্রেণীসংগ্রামকে অপরিহার্য প্রয়োজন বলে মনে করে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামী আইন গ্রহণ করা। এসব বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তারা যেহেতু পাশ্চাত্যে শ্রেণী সংগ্রাম অপরিহার্য দেখতে পেয়েছে, বরং ইসলামের দাবিদার সমাজেও এমনটি ঘটছে- অথচ ইসলাম তা থেকে মুক্ত, এজন্যেই তারা এমনটি ভেবে বসেছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এটা কোন বিশেষ পরিবেশের জন্য সাময়িক এবং সীমিত ব্যাপার মাত্র। আর এ বিশেষ পরিবেশ মৌলিক উপাদানের বিচারে ইসলামী জীবন দর্শনের মৌলিক উপাদান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একেবারেই ভিন্ন।

জীবন-বৃত্তে পরিপূর্ণ সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি সম্পর্কে ইসলাম তার সর্বাত্মক চিন্তাধারা কিভাবে কার্যকর করে, এখন আমাদেরকে তাই দেখতে হবে।

দয়া-ভালোবসার অনুভূতি

ইসলাম ব্যক্তির মন এবং অনুভূতিতে সমাজের ভিত স্থাপন করে সর্বপ্রথম। সেখানে হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার বীজ বপন করে প্রবাহিত করে দয়ার শীতল সমীরণ। এ হচ্ছে নির্মল মানব-প্রীতি, মানুষের প্রতি নিষ্কলুষ ভালোবাসা। ইসলাম প্রথম সৃষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা এক প্রাণ থেকে উৎসারিত। সে মানব মনের গভীরে বংশধারা এবং আত্মীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর অভিন্ন সৃষ্টি হিসেবে বিকাশ-বৃদ্ধি এবং তাঁরই হুযূরে শেষ প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তারা সকলেই ভাই ভাই। এসব কোমল অনুভূতিতে যখন তাদের প্রাণ বিগলিত হয়, তখন তারা

পারস্পরিক উদারতার অতি নিকটবর্তী হয়, এমনিভাবে তারা হয়ে ওঠে শান্তি-নিরাপত্তার নিকটতর। বিরোধ এবং সংঘাতের কারণ হ্রাস পায় বহুলাংশে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম যেসব সংগঠন এবং আইন প্রণয়ন করে, সম্ভাবনা দেখা দেয় সে সবের সাফল্যের। হৃদয়ের এ অনুভূতি আইন-কানুন এবং বিধি-বিধানের জন্য সুদৃঢ় নিশ্চয়তা স্বরূপ। আর এরই ফলে জীবন-তরী ভেসে চলে ধীরে-সুস্থে নিরাপদে-নিরূপদ্রবে ঃ

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

-মানব মন্ডলী! তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ভয় কর; যিনি তোমাদেরকে একপ্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, আর এতদোভয় থেকে বিস্তার করেছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে একে অপরকে জিজ্ঞেস কর আর আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর নেগাহবান। - সূরা আন্-নিসা ঃ ১

এমনিভাবে গোটা মানবতা গ্রথিত হয় এক বংশধারা এবং এক মা'বুদে। অনৈক্য ও বিবাদের কারণ লোপ পায়, যাতে সবচেয়ে বড় এবং গভীর সম্পর্ক প্রকাশ পায়, জাতি-ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যা সকলকে আচ্ছন্ন করে আছে। এতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণের কোন পার্থক্য নেই।

এটা স্পষ্ট যে, ঈমানদাররা পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনায় একে অপরের অতি নিকটবর্তী।

আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের কারণে তাদের ভ্রাতৃত্ব অতি সুদৃঢ়, এ আকীদার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মযবুত। ইসলাম এ সম্পর্ককে রক্ত-বংশের সম্পর্কের চেয়েও সুদৃঢ় বলে অভিহিত করেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

-সন্দেহ নেই, ঈমানদাররা পরস্পরে ভাই ভাই। - সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১০

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد با لسهر والحمى -

-পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসায় ঈমানদারদের উদাহরণ হচ্ছে এক দেহের মত। যখন এর কোন একটি অংশ অসুবিধা বোধ করে, তখন গোটা দেহ বিনিদ্র রজনী যাপনে তার সাথী হয়। - বুখারী, মুসলিম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন ঃ

لاتباغضوا ولاتحاسدوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا –

-পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একে অপরকে ঈর্ষা করবে না, একে অন্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। আল্লাহর বান্দারা! তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। - বুখারী, মুসলিম

ঈমান তাদের মধ্যে ভালোবাসার এমন এক সম্পর্ক স্থাপন করে যে, মানুষ তার নিজের জীবন এবং ভাইয়ের জীবনের মধ্যে পার্থক্য করে না ঃ

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه –

- তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারে না,যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করে। - বুখারী, মুসলিম

ইসলাম তিন দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছে করাকে তাদের জন্যে হারাম করে। এ সময়ে তাদের গোস্‌সা দূর হয়ে যায়, তারা পুনরায় ভালোবাসা এবং নৈকট্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ঃ

لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعــــرض هــذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام –

- কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করে রাখা হালাল নয় যে, তারা পরস্পর মিলিত হলে একজন এ দিকে অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে সালাম দ্বারা সূচনা করে। - তিরমিজি-ইবনে মাজা

দয়া হচ্ছে ভালোবাসার জোড়া। আল্লাহ তা'আলা বারবার নিজেকে এগুণে ভূষিত করেন আর তাঁর পয়গম্বরের প্রতি এজন্যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে রহমত সৃষ্টি করেছেন যে, আপনি কোমল আচরণের অধিকারী এবং স্নেহশীল দয়ালু হয়েছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَضًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِــــنْ حَوْلِكَ ص

- এটা আল্লাহর কতো বড়ো মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্যে কোমল হয়েছেন। আপনি কঠোর ব্যবহার এবং পাষাণ হৃদয়ের হলে এরা আপনার আশপাশ থেকে দূরে সরে যেত। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯

মুসলমানদের প্রতি এমন দয়ালু-মেহেরবান নবী পাঠিয়েছেন, এজন্যে আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন ঃ

لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

- তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্টে তিনি বিচলিত হন। তোমাদের কল্যাণ বিধানে তিনি অতি আগ্রহী। মু'মিনদের জন্যে অত্যন্ত মেহেরবান, অতি দয়াময়। - সূরা আত-তাওবা ঃ ১২৮

ইসলাম পাষাণ-হৃদয়তাকে কুফরী এবং দীনকে অস্বীকার করার লক্ষণ বলে অভিহিত করে ঃ

اَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○

- তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে য়াতীমকে বিতাড়িত করে এবং অভাবীকে আহার্যদানে উৎসাহিত করে না। - সূরা আল-মাউন ঃ ১-৩

কেবল মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং সকলের জন্যে ঃ

ارحموا اهل الارض يرحمكم من فى السماء -

- তোমরা যমীনবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। - আবু দাউদ,তিরমিযী

কেবল এটুকু নয়; বরং ইসলাম দয়ার অনুভূতির সাথে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মানব-জগত অতিক্রম করে সকল প্রাণীকুল পর্যন্ত তা বিস্তৃত-প্রসারিত করে। সকল প্রাণী সম্পর্কে ইসলাম মানব মনে এ অনুভূতির প্রফুল্লতা, কোমলতা, আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش - فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بى فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له - قالوا

يارسول الله وان لنا فى البهائم اجرا ؟ قال نعم فى كل ذات كبد رطبة اجر -

- একদা এক ব্যক্তি পথ অতিক্রম করছিল। তার ভীষণ পিপাসা পেলো। সে একটি পানির কূপ দেখতে পেয়ে তাতে অবতরণ করে (পানি পান শেষে) বেরিয়ে এসে দেখতে পেল, একটা কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে হাঁফাচ্ছিল আর কাদামাটি চাটছিল। লোকটি মনে মনে বলল, আমার যে অবস্থা হয়েছিলো, পিপাসায় কুকুরটির সে দশাই হয়েছে। লোকটি কূপে নেমে মোজায় করে পানি তুলে মুখে পুরে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ্ লোকটির এ নেক কাজ কবুল করেন এবং তাকে মা'ফ করে দেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুর প্রতি দয়ার জন্যেও কি আমরা পূণ্য লাভ করবো? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন ঃ হাঁ, সকল জীবিত প্রাণীর ব্যাপারে পূণ্যলাভ হয়।

দয়ার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার এটা শেষ সীমা। কেবল সে দৃঢ় বিশ্বাসই ঐ পর্যন্ত পৌছতে পারে, যা সকল জীবন্ত বস্তুর মধ্যে উন্নত সম্পর্কের ওপর ঈমান রাখে এবং এ বিশাল বিশ্বে স্রষ্টার একত্ব এবং সৃষ্টির ঐক্যে বিশ্বাস করে। এ আকীদাই মানব-মনকে আচ্ছন্ন করার হকদার। কারণ, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষ সবচেয়ে উন্নত এবং আল্লাহর যমীনে সকল প্রাণীর ওপর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।

ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত শিষ্টাচার

মানব-মনে ভালোবাসা এবং স্বচ্ছতা সৃষ্টির জন্য ইসলাম মুসলমানদেরকে কিছু ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, যাতে তারা এ লক্ষ্যে একে অন্যের সাহায্যকারী হতে পারে। অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা-শত্রুতা পোষণ থেকে ইসলাম বারণ করে। আইন-কানূনের সাহায্য নেয়ার পূর্বে ইসলাম দয়া-অনুগ্রহের এসব মহান শিক্ষাকে কাজে লাগায়। আবার প্রয়োজন পড়লে ইসলাম শাস্তি এবং দন্ডবিধির সাহায্য নেয়। কিন্তু চরিত্র এবং শিষ্টাচারের ওপরই গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশী। কারণ, ভদ্র ব্যবহার, সুন্দর আচরণ,- সর্বোত্তম লেন-দেন- এসব এমন জিনিস, যা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সন্তুষ্টি, প্রফুল্লচিত্ততা এবং শান্তি-স্বস্তি ছড়িয়ে দেয়। ফলে আইন এবং বিধি-বিধানের প্রয়োজন খুব কমই দেখা দেয়। অপরের ওপর বাহাদূরী করা এবং দম্ভ-স্পর্ধাকে ইসলাম পছন্দ করে না ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٥ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ٥

- অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবেনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবেনা। নিশ্চয়ই দাম্ভিক অহংকারী লোকদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং স্বর নীচু কর। সন্দেহ নেই, সবচেয়ে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গাধার স্বর। - সূরা লুকমান ঃ ১৮-১৯

وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○

- এবং মাটির বুকে দম্ভভরে পদচারণা করবে না। তুমি তো মাটিকে বিদীর্ণ করতে পার না আর কখনো পৌছতে পারবে না পাহাড়ের উচ্চতায়। - সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخز احد على احد -

- আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করবে। এমন কি কেউ কারুর ওপর বাড়াবাড়ি করবে না, কেউ কারুর ওপর দম্ভ করবে না। - মুসলিম, আবু দাউদ

ইসলাম এ ব্যাপারে স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। মানব প্রকৃতি দাম্ভিকদেরকে না-পছন্দ করে, অহংকারীদেরকে ঘৃণা করে, গর্বকারী-অহংকারীদের সম্পর্কে সংকীর্ণতা বোধ করে এবং এসব স্বভাবের লোকেরা কারো ব্যক্তিগত ক্ষতির চিন্তা-চেষ্টা না করলেও সকল মানব প্রকৃতিই এমন স্বভাবের লোকদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে, এদের সম্পর্কে শত্রুতার ভাব পোষণ করে। কারণ হচ্ছে এই যে, এমন স্বভাবের লোকদের কেবল এ সব স্বভাব প্রকাশ করাই অন্যদের মনে গর্বের ভাব জাগিয়ে তোলে এবং অবচেতনভাবেই এদের জবাব দেয় এবং গর্ব প্রকাশের জন্য এদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অপরের কষ্টের কারণ হতে পারে, এজন্য ইসলাম গর্ব-অহংকার এবং লোক-প্রদর্শনীকে না-পছন্দ করে। সুতরাং অপরের অনুভূতি এবং মান-সম্মানকে আহত করতে পারে- এমন কাজ ইসলাম কি করে বরদাশত করতে পারে? এ কারণে অপরের অনুভূতিকে পদদলিত করা, তাদের মান-মর্যাদায় হাত দেয়া এবং আবেগ-অনুভূতি ও মূল্যমানকে নিয়ে খেলা করা যে হারাম, তা ব্যক্ত করে এভাবে ঃ

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا

تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوْا اللهَ ط اِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ٥

- ঈমানদাররা! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে, ওরা এদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারী যেন অপর নারীকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে ওরা এদের চেয়ে উত্তম। একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, কাউকে খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। ঈমানের পরে অপকর্ম খারাপ নাম। আর যারা তওবা করবে না, এমন লোকেরাই যালিম। ঈমানদাররা! অধিক ধারণা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা গুনাহ এবং অপরের পিছেনে গোয়েন্দাগিরী করো না। একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা কর। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় তওবা কবূলকারী, বড় দয়ালু। - সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১-১২

ইসলাম মানব মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতির প্রতিও লক্ষ্য রাখে; তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে দু'ব্যক্তি কোন গোপন আলাপ করবে, যাতে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে না, ইসলাম এটাও নিষেধ করে ঃ

اذا كان ثلث فلا يتناجى اثنان دون الثا لث فان ذلك يؤذيه –

- যখন কোথাও তিন ব্যক্তি থাকে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'ব্যক্তি যেন কানে কানে কোন কথা না বলে। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তির কষ্ট হয়। - বুখারী, মুসলিম, আব দাউদ, তিরমিযী

এ হচ্ছে এক সূক্ষ্ম উন্নত মনস্তাত্ত্বিক শিষ্টাচার। ভালো কাজ এবং দানের জন্য খোঁটা দেয়া এ পর্যায়েরই কাজ। তাই এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ভালো কাজের খোঁটা দেয়া এমনিইতেই একটা খারাপ স্বভাব। যাদের সাথে ভালো কাজ করা হয়েছে, এতে তাদের কষ্ট হয়। এজন্য এর ফলে দান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, নেকী বরবাদ হয়ে যায়। শুকরিয়া এবং স্বীকৃতির পরিবর্তে অসন্তুষ্টি এবং ঘৃণার সৃষ্টি হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ط كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَا لَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ٥

-ঈমানদাররা! দানের জন্য খোঁটা দিয়ে কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে নষ্ট করো না, সে ব্যক্তির মতো; যে মানুষকে দেখাবার জন্য অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ এবং শেষদিনে বিশ্বাস করে না। তার উদাহরণ হচ্ছে

একটা পিচ্ছিল পাথরের মতো, যার ওপরে রয়েছে কিছু মাটি, মুষলধারে বৃষ্টি এলেই তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। এরা নিজেদের কামাই-রোযগারের কোন কিছুরই মালিক নয়। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে সত্য-সরল পথ দেখান না। - সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৪

এমন শিষ্টাচার সম্পর্কে ইসলাম শুধু নেতিবাচক সীমায়ই অবস্থান করে না; বরং প্রীতি-ভালবাসার অনুভূতি জাগ্রত করার জন্যে ইতিবাচক রূপও ধারণ করে। এ লক্ষ্যে ইসলাম মানুষকে ভালো কথা প্রসারের আহ্বান জানায়।

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

- আর আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন এমন কথা বলে, যা উত্তম। - সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا –

-আর তোমাদেরকে যখন সালাম জানান হয়, তার চেয়ে উত্তম সালাম জানাবে অথবা তাই ফিরিয়ে দেবে। -সূরা আন্-নিসা ঃ ৮৬

সর্বত্র সকল মানুষের নিকট সালাম পৌঁছাবার জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়, তার সাথে জানা-শোনা থাকুক বা না থাকুক। পরিচয় হিসেবে মানবীয় সম্পর্কই যথেষ্ট। মনে সম্প্রীতি -সন্তুষ্টি প্রকাশের নিমিত্ত সালাম দেয়ার জন্য এটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير –

- ছোট বড়কে সালাম করবে, পথচারী উপবেশনকারীকে আর অল্প লোক বেশীলোককে। -বুখারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ

أى الاسلام افضل ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف –

- ইসলামের কোন্ স্বভাবটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করবে। -বুখারী

ইসলাম ন্যায় দ্বারা অন্যায়ের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেয় ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ –

-উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিরোধ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, যাদের সাথে তোমার শত্রুতা ছিল, তারা তোমার আন্তরিক বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। -সূরা হা-মীম-সাজ্দাহ ঃ ৩৪

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

- আর দয়াময়ের (আল্লাহর) বান্দা তারা, যারা যমীনের বুকে ধীরে-সুস্থে চলাচল করে আর জাহিল-অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করলে (গালি-গালাজ করলে) তারা বলে-সালাম। - সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩

ইসলাম খারাপ কাজ ক্ষমা করার এবং গোস্বার সময় আত্মসংযমের নির্দেশ দেয়। ইসলাম বলে যে, মনকে ক্ষমা ও দানে অভ্যস্ত কর, ঘৃণা এবং শত্রুতায় নয়। এমনিভাবে তার প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যাবে, তার স্থান দখল করবে সুস্থতা এবং উদারতা ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

- আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাহসের কাজ। -সূরা আশ-শূরা ঃ ৪৩

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

- আর তোমরা যদি মাফ করে দাও, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। - সূরা আত-তাগাবুন ঃ১৪

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط

- আর (মু'মিন) গোস্বা দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। - সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৪

وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ○

- আর যখনই তারা রাগন্বিত হয়, ক্ষমা করে দেয়। - আশ-শূরা ঃ ৩৭

ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণের তাগাদার ব্যাপারে ইসলাম প্রশস্ত চিত্ততার আহ্বান জানায়। মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

رحم الله رجلاسمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى –

-ক্রয়-বিক্রয় এবং তাগাদাকালে প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। -বুখারী, মুসলিম

ইসলাম লেন-দেনে আমানতদারীর নির্দেশ দেয় ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ –

-তোমাদের কেউ যদি অপরের নিকট আমানত রাখে, তবে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে, সে যেন তা ফেরত দেয়। -সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৩

ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভেচ্ছার নির্দেশ দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما –

-ক্রয়-বিক্রয়কারী উভয়ের এক্তিয়ার রয়েছে তা বাতিল করার, যতক্ষণ না একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সত্য বলে এবং আসল কথা খুলে বলে, তাদের কাজ-কারবারে বরকত দেয়া হবে। আর যদি গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে কাজ-কারবারের বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। -বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ

বিদ্বেষ-শত্রুতা সৃষ্টি করে এমন বিষয় থেকে ইসলাম মুসলামানদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়; যেমন জুয়া খেলার আড্ডা, হারাম উপার্জন এবং সংক্রামক ক্ষতির কারণে এতে অন্তরে শত্রুতা জন্মে। যেমন, মদের আসর, এতে উত্তেজনা এবং প্রলাপের ওপর বুদ্ধিবৃত্তির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ٥

-মদ-জুয়ার মাধ্যমে শয়তান নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণা সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত থেকে বারণ করতে চায়। তবে কি তোমরা বিরত থাকবে? -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯১

জীবনের পরিমন্ডল সুস্থ-সুন্দর করা এবং মানব-মনে প্রীতি-ভালোবাসা সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত শিষ্টাচার এমনিভাবে আপন ভূমিকা পালন করে থাকে এবং আবেগ-অনুভূতি ও বাস্তবতার জগতে শান্তি-নিরাপত্তার ওপর সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্বানুভূতি

অতঃপর ইসলাম সমাজে ব্যক্তিকে যৌথ স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাদের অন্তরে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্বানুভূতি ও জন-স্বার্থের জন্য তাদের ওপর ন্যাস্ত কর্তব্যের অনুভূতিকে তীব্র করে এবং যৌথ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে। সকলের মধ্যে এ অনুভূতি জাগিয়ে

তোলে যে, সমাজে এমন কিছু যৌথ স্বার্থ আছে, যা ব্যক্তি এককভাবে পূর্ণ করতে পারে না। এজন্য সহযোগিতা অপরিহার্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته - الامام راع ومسئول عن رعيته - والرجل راع فى اهله ومسئول عن رعيته - والمراة راعية فــــى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته والرجل راع فى مال ابيه ومسئول عن رعيته- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته -

-তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল, সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হবে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম বা শাসনকর্তা দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার ঘরে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। খাদিম তার কর্তার সম্পদে দায়িত্বশীল, তার-সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর পুরুষ তার পিতার সম্পদে দায়িত্বশীল, তাকে প্রশ্ন করা হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। সুতরাং তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল আর সকলকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। **-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী,** নাসাঈ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على ســفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها - فكان الذين فى اســفلها اذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا - وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا

-আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ওপর অটল-অবিচল এবং তা লংঘনকারীদের উদাহরণ এরূপঃ যেমন কিছু লোক একটি জাহাজে লটারীর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে। কেউ উপরে স্থান পায় আর কেউ নীচে। যারা নীচে অবস্থান করছিল, পানির প্রয়োজনে তাদেরকে ওপরওয়ালাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। তারা বললো, আমরা যদি আমাদের অংশে ছিদ্র করি, তাহলে আমাদের কারণে ওপরওয়ালাদের অসুবিধা হবে না। ওপরওয়ালারা এদেরকে তাদের ইচ্ছা সফল করতে দিলে ধ্বংস হবে আর এদেরকে বাধা দান করলে নিজেরাও রক্ষা পাবে, অন্যরাও বেঁচে যাবে। - বুখারী, তিরমিযী

নিজেদের মধ্যকার দুর্বলদের দেখা-শুনা, তাদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য দলকে জবাবদিহি করতে হবে ঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ٥ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ٥

-সুতরাং তুমি য়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না, আর সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবে না। - দুহা ঃ ৯-১০

اَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ٥ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ٥ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٥

-তুমি কি তাকে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে-ই তো য়াতীমকে বিতাড়িত করে আর মিসকীনকে খাবার দানে উৎসহিত করে না। -সূরা আল-মাউন ঃ ১-৩

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ - وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا - وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط

-আর বিয়ের বয়সে পৌছা পর্যন্ত তোমরা য়াতীমদেরকে পরীক্ষা করবে। যখন দেখবে, তাদের মধ্যে বোধশক্তি জন্মেছে, তখন তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদেরকে ফেরত দেবে। তোমরা তা অপচয় করবে না আর এ আশংকায়ও খাবে না যে, এরা বড় হয়ে যাবে। যে ধনী, (য়াতীমের মাল থেকে) সম্পূর্ণ বেঁচে থাকাই তাঁর উচিত। আর কেউ গরীব হয়ে থাকলে নিয়ম মুতাবিক খেতে পারে। - সূরা নিসা ঃ ৬

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وان اربع فخامس اوسادس -

-যার নিকট দু'ব্যক্তির খাবার আছে, সে তৃতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গী করবে, যার নিকট চারজনের খাবার আছে, যে পঞ্চম ব্যক্তিকে সঙ্গী করবে, যার নিকট চারজনের খাবার আছে, সে পঞ্চম ব্যক্তিকে আর যার নিকট পাঁচ ব্যক্তির খাবার থাকে, যে ষষ্ঠ ব্যক্তিকে সাথে নেনে। -বুখারী,মুসলিম

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له - ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لازادله -

-যার কাছে ফালতু সওয়ারী আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত সফর খরচ আছে; সে যেন তা এমন লোককে দিয়ে দেয়, যার কাছে খরচ নেই। - বুখারী,আবু দাউদ

সহযোগিতার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। কারণ, তা দলের মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে। কারণ হচ্ছে এই যে, অভাবী ব্যক্তি বিত্তবানের সহযোগিতা লাভের জন্য তার কাছে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু যে বিত্তবান ব্যক্তি এ সুযোগ এবং প্রয়োজনকে দুর্লভ মুহূর্ত মনে করে তার অভাবী ভাইয়ের ওপর একটা হারাম ট্যাক্স ধার্য করবে এবং ঋণের মূল্য আদায় করবে, এর চেয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী আর কিছু হতে পারে না।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ

-যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) ঠিক এমনভাবে উঠবে, যেমনভাবে উঠে শয়তানের আসর করার পর মোহাবিষ্ট ব্যক্তি। -সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৫

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج

-ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। অতঃপর তা না করলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হও। - সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৮-৭৯

অভাবী ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থভাবে টাকা-পয়সা ঋণ দেয়া ওয়াজিব, যাতে সমাজে প্রীতি-ভালোবাসা বিস্তারলাভ করে, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্বানুভূতি বিকশিত হয় ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط

-আর ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তাকে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। বাকারা ঃ ২৮০

ঋণের তাগাদায় উদারচিত্ততার ভাবধারা অপরিহার্য, যাতে ঋণ গ্রহীতার অসুবিধা না হয়, তার ওপর চাপ না পড়ে। এহেন নৈতিকতাই মানব সমাজের উপযোগী।

অনুরূপভাবে উপরিউক্ত লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্ত ইসলাম গুদামজাতকরণকে হারাম করে। গুদামজাতকরণের ওপর ইসলাম অভিসম্পাত করে। কারণ এসব মুনাফাখোর ব্যক্তি নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে বিপন্ন মানুসের রক্ত চুষে অবৈধভাবে মুনাফা অর্জন করে। তাদের বিবেককে নাড়া দেয়, দলের মধ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ায় এবং সহযোগিতার বীজ দলিত-মথিত করে। মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من احتكر فهم خاطئ -

-যে ব্যক্তি গুদামজাত করে, যে মহাপাপী। - মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী

ইসলাম প্রতারণা এবং মাপে-ওজনে কম দেয়াকে হারাম করেছে ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٥ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٥

-যারা মাপে-ওজনে কম করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ। যারা মানুষের কাছ থেকে নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয়, কিন্তু তাদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়ার সময় কম দেয়। -আত-মুতাফফিফীন ঃ ১-৩

من غشنا فليس منا –

-যে ব্যক্তি আমাদেরকে প্রতারিত করে, সে আমাদের পর্যায়ভুক্ত নয়। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী

মানুষের জিনিসপত্র ক্ষতি করা এবং যে মূল্য পাওয়ার সে হকদার, তার চেয়ে কম দেয়াকেও ইসলাম হারাম করেছে। ইসলাম এটাকে 'ফাসাদ ফিল-আরদ' বা 'দুনিয়ার বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছে ঃ

وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِىْ الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ٥

-লোকজনের জিনিসপত্রে কম দেবে না এবং দুনিয়ায় গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। -সূরা হুদ ঃ ৮৫

ইসলাম মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছে সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্যে, এ বৃত্তে সকলকে মিলিত হওয়ার জন্যে এবং এ কড়াকে শক্তভাবে ধারণ করার জন্যে। এ নির্দেশ তাদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে তারা সকলে এক ও অভিন্ন। তাঁর পথে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, তাঁর আনুগত্যে সকলকে এক হতে হবে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ط

-এবং তোমরা সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা দুশমন ছিলে (এক অপরের),তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোভাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص

-এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিত করো এবং গুনাহ্ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না। - সূরা মায়েদা ঃ ২

এ হচ্ছে সকল কেন্দ্রের বড় কেন্দ্র এবং সকল সম্পর্কের বড় সম্পর্ক, যেখানে সকলে এসে মিলিত হয়। অতঃপর তারা ঐক্য অনুভব করে, যা তাদেরকে একত্রিত করে। সে দায়িত্বের কথাও স্মরণ করে, যা তাদেরকে টেনে নিয়ে আসে। সন্দেহ নেই যে, এ হচ্ছে সামাজিক শান্তি-নিরাপত্তার ইমারতে একটা ইঁট। এ ইমারতে এ ইঁটের মূল্য অনেক বেশী।

জীবনের উন্নত লক্ষ্য

এ সব কিছুর পরে, অথবা এসব কিছুর আগে ইসলাম সমাজের ব্যক্তি এবং সমষ্টির জন্য একটা বিপ্লব এনে শান্তি স্থাপন করে। ইসলাম তাকে সীমিত ব্যক্তি-সত্তার জগত থেকে উন্নত ও প্রশস্ত দুনিয়ায় নিয়ে যায়। ব্যক্তির চাপাপড়া শক্তি বিকশিত হতে পারে না, অধিকিন্তু এ কারণেই সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয়। এ শক্তির সামনে থাকে প্রতিযোগিতার অনুপযোগী এক সংকীর্ণ ক্ষেত্র। এ হচ্ছে এমন সময়, যখন ঋণের দিগন্ত সংকীর্ণ হয়, জীবনের লক্ষ্য হয় নীচ; ব্যক্তির ক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্রে বা সমষ্টির সীমিত জগতই পরিণত হয় কর্মক্ষেত্রে এবং চিন্তাধারার বিকাশস্থলে।

ইসলাম এসব পরিস্থিতিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে। ইসলাম ব্যক্তি এবং সমষ্টিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সীমিত লক্ষ্যের ক্রোড় থেকে বের করে, যাতে তাদেরকে স্বাধীন জীবনের উন্নত লক্ষ্যের পরিমন্ডলে নিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা দিতে পারে, ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বের করে তাকে সামাজিক জীবনের বৃহত্তর পরিমন্ডলে পৌছতে পারে এবং জাতিয়তার সংকীর্ণ দর্শনের আবর্ত থেকে মানবতার উন্নত এবং ব্যাপক দর্শনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এ সময় ব্যক্তি অনুভব করে যে, নিছক ব্যক্তি-সত্তার জন্য নয়; বরং গোটা মানবতার স্বার্থেই সে বেঁচে থাকে। এ সময় সমষ্টিও অনুভব করে যে, কেবল গোষ্ঠি-বিশেষের জন্যই সে বেঁচে থাকে না; বরং সে বেঁচে থাকে গোটা মানবতার জন্য। আর মুসলমান এ সময় উপলব্ধি করে যে, সে বিশ্বের বুকে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। তারা নিজেরা নিজেদের মালিক নয়, তাদের চেষ্টা-সাধনা কেবল নিজেদের জন্য নয়, তাদের জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়; লক্ষ্যের পথে উপলক্ষ্য মাত্র। যখন পরিস্থিতি হয় এমন উন্নত এবং পরিপূর্ণ লক্ষ্যে সকলে হয় উদ্বুদ্ধ; তখন সীমিত ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাতের অবকাশই বা থাকে কোথায়?

ইসলাম মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ط

-তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্ব-মানবতার কল্যাণের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০

ইসলাম তাদেরকে বলে ঃ

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط

-নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, অতঃপর হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাঁর যিম্মায় সত্য-সঠিক ওয়াদার কথা তাওরাত-ইঞ্জিল এবং কুরআনে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। -সূরা তওবা ঃ ১১১

ইসলাম আরও বলে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

-তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ন্যায়ের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় থেকে বারণ করবে। আর এরাই তো হবে সফলকাম। -সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪

এমনিভাবে ইসলাম মুসলমানের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বের চেয়েও উন্নত বস্তুর প্রতি প্রসারিত করে, তাদেরকে নিয়ে যায় ব্যক্তি-সত্তা এবং স্বার্থ চিন্তার চেয়েও উন্নত মার্গে। কী সে উন্নত লক্ষ্য? বিশ্বের সার্বিক সংস্কার-সংশোধন, ন্যায় ও কল্যাণের প্রসার-বিস্তৃতি, অন্যায়-অকল্যাণের মূলোৎপাটন এবং গোটা বিশ্ব-মানবতার সার্বিক স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। অবশিষ্ট রয়েছে তাদের জান-মাল এবং সীমিত নিকটতম স্বার্থ, এসব তো তারা স্বেচ্ছায় উদারচিত্তে বিক্রয় করে দিয়েছে। কিন্তু এ বিক্রয় করেছে তারা এক উৎকৃষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী বস্তুর বিনিময়ে। আল্লাহ স্বয়ং এ বিক্রয়ের ক্রেতা।

আল্লাহর পথে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঈমানদারদেরকে, যাতে আল্লাহর বাণী বুলন্দ হয়, বিশ্ব পরিণত হয় শান্তি-নিরাপত্তার পূণ্যভূমিতে, অবশিষ্ট থাকে না কোথাও ফিতনা-ফাসাদ, গোলযোগ-বিপর্যয়। এ উন্নত লক্ষ্যের পথে ব্যক্তির আপন সত্ত্বা-স্বার্থ-আকাংখা এসব কিছুই মূল্যহীন, তুচ্ছ।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنَ كُلُّهُ لِلّٰهِ –

-এবং তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়ে যাও, যতক্ষণ ফিতনা নির্মূল না হয়ে যায় এবং সকল প্রকার আনুগত্য আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। -সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من جاهد لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله –

আল্লাহর বাণী বুলন্দ হবে- এ উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করে। - মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী,নাসাঈ

আল্লাহর নবীর একান্ত বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ

لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا ضربهم الله بالذل –

- যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ সে জাতির ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন।

দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের কষ্ট দূর করা এবং শান্তি-নিরাপত্তা বিধান করার জন্যেও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যে কোন বংশ-গোত্র-বর্ণের হোক না, কেন, তাদের আকীদা-বিশ্বাস যা কিছু হোক না কেন, যতক্ষণ তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, এদের সাহায্য-সহায়তা, করা তাদের ফরয। তাদের প্রতি অত্যাচারী-বিদ্রোহী, সে যে কেউ হোক না কেন, তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا – وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ٥

-আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না? লড়াই করছ না দুর্বল পুরুষ-নারী এবং শিশুদের জন্যে, যারা বলে ঃ পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে সে জনপদ থেকে বের করে আনো, যার অধিবাসীরা যালিম। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে বন্ধু এবং সাহায্যকারী দাও। - সূরা আন-নিসা ঃ ৭৫

মু'মিনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অন্যায় নিশ্চিহ্ন করার জন্যে, তা যে কোন শাসক-প্রজা বা যে কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে হোক না কেন। কারণ মু'মিন হচ্ছে বিশ্বের বুকে আল্লাহর সৈনিক, বিশ্বের সংস্কার-সংশোধন তাদের ওপর নির্ভরশীল, পৃথিবী থেকে পাপ-তাপ মুছে ফেলা তাদেরই কর্তব্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من رأى منكم منكرا فليغيره –

-তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায়-অনাচার দেখলে তার উচিত তা নির্মূল করা। -বুখারী

অন্যথায় তাদের ওপর ধ্বংস এবং আযাব নাযিল হবে ঃ

ان الناس اذا راو الظالم فلم ياخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله تعالى بعقابه –

-লোকরা যালিমকে দেখেও যদি তাদের হাতকে যুলুম থেকে নিবৃত্ত না করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে পারেন। আবু দাউদ, তিরমিযী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

والله لتاومرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على يدى الظالم ولتاطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق أصرا اوليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض –

-আল্লার শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই কল্যাণের নির্দেশ দিতে হবে, অকল্যাণ থেকে বারণ করতে হবে, যালিমের হাত ধরে তাকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে, সত্যের জন্যে বাধ্য করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের সকলের অন্তরকে শতধা বিভক্ত করে দেবেন। -আবু দাউদ, তিরমিযী

ইসলাম যখন মুসলমানদেরকে এসব মহান বিধানের নির্দেশ দেয়, তখন তাদের মন এবং লক্ষ্যকেও উন্নত করে তোলে এবং তাদের সুপ্ত যোগ্যতা-প্রতিভাকেও মুক্ত করে মানবতার অঙ্গনে। এটাকে নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখে না। সন্দেহ নেই যে, এ স্পষ্ট স্বাধীনতা তাদেরকে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুতা থেকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। লোভ-লালসা এবং বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট শত্রুতা থেকে তাদেরকে অনেক ওপরে নিয়ে যায়। ইসলাম একেবারে সূচনা-পর্ব থেকেই এসব লক্ষ্যকে মানদন্ডের এক পাল্লায় এবং ব্যক্তিগত আশা-আকাংখাকে অপর পাল্লায় রেখে তাদেরকে বিচার-বিবেচনার ইখ্তিয়ার দেয় ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ

اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهٖ . وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ٥

-বল, তোমদের পিতা-পুত্র, ভাই-স্ত্রী-বংশ, সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতে মন্দার আশংকা কর তোমরা এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান, এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ নাফরমান জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না। -সূরা আত-তওবা ঃ ২৪

এসব বিধান দেয়া হয়েছে মানবতার প্রতিনিধি হিসেবে। আর এ প্রতিনিধিত্বকে করেছেন আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٥

-(এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি) যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। -সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪১

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

-আর এমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ করেছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পার আর রাসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর স্বাক্ষী। -সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৩

এ হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের সে দায়িত্ব, যা জীবনকে সম্পৃক্ত করে এক উন্মুক্ত দিগন্তের সাথে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ٥ مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ ٥

-আমি জ্বিন এবং ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট জীবিকা চাই না, এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার যোগাক। -সূরা আয্-যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৭

এহেন পরিবেশে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং আভ্যন্তরীণ সংকট আর কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়াই ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পুরিপুষ্টি সাধন করতে পারে, প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত করতে পারে তার আভ্যন্তরীণ

পরিপুষ্টির আকাংখাকে। এ ক্ষেত্রে সকলের প্রতিযোগিতার অবকাশ থাকে। কারণ পৃথিবীতে জীবনের এত উপকরণ রয়েছে, যা মোরগ পালকে সংঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

শাসন ব্যবস্থা

ইতোপূর্বে আমরা আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যার ওপর ইসলাম সমাজে শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে। এসব হচ্ছে এমন উপাদান-উপকরণ, যার মূল্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু ইসলাম কেবল এসবের ওপরই নির্ভর করে না, আর এসবের কারণে সামাজিক জীবনে ব্যাপক সংগঠনকে পরিত্যাগ করে না। কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় নির্দেশ আর সন্তুষ্টি, আইন প্রণয়ন আর তার যথার্থ প্রয়োগকে একাকার করে দেখে। ইসলাম সামজকে আইন-বিধান এবং সংগঠন দেয় আর এজন্য উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিতও করে। সামাজিক শান্তির ব্যাপারেও ইসলাম এ নীতি অনুসরণ করে। ইসলাম শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে, আইনগত সুবিচার ন্যায়-নীতির নিরাপত্তা দেয় এবং সামাজিক নিরাপত্তারও গ্যারান্টি দেয়। ইসলাম এসব কিছুকে সমাজে আইন প্রণয়ন এবং সংগঠনের পথে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য বলে মনে করে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা শাসক-শাসিতের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুবিচার, ন্যায়-নীতির সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সামাজিক শান্তির ইমারত সুস্থ সুঠাম এবং মজবুত বুনিয়াদের ভিত্তিতে।

শাসনকর্তা তাঁর মর্যাদায় পৌছতে পারেন কেবল একটি উপায়ে। আর তা হচ্ছে জনগণের মুক্ত স্বাধীন অভিরুচি এবং তাদের স্বাধীন ইচ্ছা-ইক্তিয়ার। জনগণের সন্তুষ্টি এবং ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকারই কেবল জনমনে আস্থা এবং শান্তি-নিরাপত্তা বিস্তার করতে পারে। এ সরকার কেবল জনমনে শান্তি-সুস্থিতি প্রসারিত করে বিধায় এর বিরুদ্ধে অবাধ্যতার কোন অবকাশ থাকে না, তার ব্যাপারে কেউ মনক্ষুন্নও হতে পারেনা। এমন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা কল্পনা করা যায় না। অবশ্য এজন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, সরকারকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে, ইসলাম নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামে সরকার প্রতিষ্ঠার উপায় কি? জবাব হচ্ছে শূরা বা পরামর্শের মাধ্যমে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ ص

-এবং তাদের কাজ-কারবার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়। -সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৮

وَشَاوِرْهُمْ فِىْ الْأَمْرِ

আর কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করবে। -সূরা আলে-ইমরান ঃ১৫৯

শরীয়ত যেহেতু শূরার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়নি, তাই এটাকে যুগের প্রয়োজন, দাবি এবং জীবন-ধারার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মৌলিক দর্শন এবং শাসন ব্যবস্থার ধারা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। শূরার মৌল দাবি হচ্ছে এই যে, জনগণের কর্মকান্ড নিষ্পন্ন করার কাজে তাদেরকে অংশীদার করতে হবে। জনগণ যখন এ কাজে শরীক হবে, তখন তাদের অসন্তুষ্টির প্রশ্নই ওঠে না।

এখন দেখা দরকার, শাসন কার্যে ইসলামে নির্ধারিত সীমারেখা কি, কি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, ইসলামী শাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী আইন জারী করা, যা আল্লাহ তাঁর সকল বান্দার জন্যে নির্ধারণ করেছন। তিনি এ আইনে এক ব্যক্তির ওপর অপর ব্যক্তির মর্যাদার প্রাধান্যকে স্থান দেননি, কোন শ্রেণীবিশেষের স্বার্থকেও অপর শ্রেণীর ওপর প্রাধান্য দেননি, এক দলের জন্য অপর দলের স্বার্থকেও বিসর্জন দেননি। এখানে শাসক আর শাসিতের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। সকলেই আল্লাহর বান্দা আর শরীয়ত আল্লাহর বিধান, তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই এক সমান।

জনগণের জন্যে শাসনকর্তার আনুগত্য করা, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আইন জারীর শর্তে শর্তায়িত। এ সীমারেখা লংঘন করলে তার আনুগত্য করতে হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان راسه زبيبة – ما اقام فيكم كتاب الله تعالى –

-শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর, যদি হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসনকর্তা করা হয়, যার মাথা কিসমিসের দানার মত; যতক্ষণ সে তোমদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব কায়েম রাখে। -বুখারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে আনুগত্যকে আল্লাহর কিতাব কায়েমের শর্তে শর্তায়িত করেছেন। অন্য কোন শর্ত আরোপ করেননি।

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায় শাসনকার্য পরিচালনা করে না, বিচার-ফয়সালা করে না, কুরআন তাদেরকে স্পষ্ট কাফির বলে অভিহিত করে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

-আর আল্লাহর নাযিল করা কিতাব অনুযায়ী যারা শাসন-ফয়সালা করে না, তারাই তো কাফির। - সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪৪

কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব আর কোন মুসলমানের জন্য কাফিরের আনুগত্য করা সম্পূর্ণ হারাম, ইসলামের এ বিধানেও কোন অস্পষ্টতা নেই।

আল্লাহর আইন যেহেতু কারো সাথে পক্ষপাতিত্ব করে না, কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর প্রতি ভেদাভেদ করে না, সে ব্যক্তি শাসক হোক বা শাসিত, সে শ্রেণী বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন- তাই এ আইন জারী করাই একমাত্র প্রমাণ যে, সমাজে তা শান্তিস্থাপন করবে। কারণ তা সমাজের সকল মানুষকে পরিচলিত করবে গোটা সামজের স্বার্থে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মনোনীত এবং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শাসনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও আপন পূত-পবিত্র সত্তাকেও প্রতিশোধের জন্যে পেশ করতেন। এ কথা উল্লেখ করেছেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে বলতেন ঃ

يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغنى عنكم من الله شيئا يا بنى عبد مناف لا اغنى عنكم من الله شيئا ياعباس بن عبد المطلب لا اغنى غنك من الله شيئا ياصفية عمة رسول الله لا اغنى غنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا اغنى غنك من الله شيئا –

-হে কুরাইশের দল! নিজেদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা কর। আল্লাহর হুযূরে আমি তোমাদের কোন কাজে আসবো না। হে বনী আবদে মানাফ! আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের কাজে আসবো না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তলিব! আমি আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না। হে সফীয়া, নবীর ফুফু! আমি আল্লাহর হুযূরে তোমার কোন কাজে আসবো না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে যা খুশী, চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর হুযূরে আমি তোমার কোন কাজে আসবো না।

মহানবীর অন্তরঙ্গ সূহৃদ মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর বায়'য়াত শেষে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

اما بعد ايها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينونى وان اسأت فقومونى.......... اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فان عميت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم –

-অতঃপর লোক সকল! আমাকে তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি ভালো কাজ করলে আমার আনুগত্য করবে, আর ভুল করলে আমাকে সোজা করে দেবে। যতক্ষণ আমি আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য করি, তোমরাও আমার আনুগত্য করবে; আমি আল্লাহ-রাসূলের নাফরমানী করলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব- অবশ্য করণীয় নয়।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এমনিভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সরকার এবং তার সীমারেখা।

শাসকদের সোজা করা এবং প্রজাদের সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দেয় ইসলামী শাসন। শাসক এবং জনগণের মধ্যে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত হতে পারে, ইসলামী শাসন সে জন্য জিম্মাদার। কিন্তু এ কাজ হতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে, আনুগত্যের সাথে, জোর-জবরদস্তি এবং অবাধ্যতায় নয়, পাষাণ-হৃদয়তা এবং কঠোরতায় নয়, ভয়-ভীতি এবং সন্ত্রাসের সাধ্যমেও নয়। আনুগত্য এবং প্রশান্ত চিত্তে মেনে নেয়া উৎসারিত হয় হৃদয়ের গভীর থেকে, লোক দেখানো ভাব, মুনাফিকী, প্রতারণা এবং মিথ্যার দ্বারা নয়।

এ শাসন-ব্যবস্থা শান্তি সুস্থিতির উপায়। অন্য কোন মাধ্যম এর চেয়ে উন্নত, শ্রেষ্ঠ বা তার সমকক্ষ নয়। এ হচ্ছে পরিপূর্ণ শান্তি-নিরাপত্তার অন্যতম পর্যায়, জীবন সম্পর্কে ইসলামের মহান দর্শনের মযবুত কাঠামো থেকে তা পৃথক নয়, মুক্ত নয়।

আইনগত সুবিচারের গ্যারান্টি

ইসলামী শাসন সর্বপ্রথম আইনের নিকট থেকে সুবিচার লাভ করে। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামী আইন কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা দল-বিশেষের প্রণীত নয় যে, এ সম্পর্কে নানা ধারণা-কল্পনা জন্ম নেবে। এমন আশংকাও করা যায় না যে, তা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মনস্কামনা চরিতার্থ করবে। এতে ভুল-ভ্রান্তির সংমিশ্রণও থাকতে পারে না, যার দ্বারা সত্যিকার সুবিচার ব্যাহত হয়।

ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালার বিষয়টিকে ইসলাম আইনের স্বচ্ছতা-স্পষ্টতা, কাযীর বিবেক এবং দলের পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ইসলামী উম্মাহর সকল সদস্য এ পর্যবেক্ষণ কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। যুলুম সংঘটিত হলে তা দূরীভূত করা, শাসনকর্তা অন্যায় করলে তাকে হুশিয়ার করা এবং কাযী বিচার-ফয়সালায় ভুল করলে তাঁর ভুল ধরিয়ে দেয়া সকলের কর্তব্য। সত্য গোপন করলে, ভুল করতে দেখেও চুপ থাকলে এবং সংশোধনের চেষ্টা না করলে গুনাহগার হতে হবে।

ইসলাম যে সুবিচার চায়, তা হচ্ছে নিরপেক্ষ ইনসাফ। ঘৃণা আর ভালোবাসা কোন কিছু দ্বারাই তা প্রভাবিত হয় না। প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-সম্পত্তি এবং শাসক শ্রেণী কাউকেই ভয় করে না ইসলামী সুবিচার। কুরআনুল করীমে আদল-সুবিচারের আয়াত দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট এবং ব্যাপক ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا – فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥

-ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ইনসাফের ওপর ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মাতাপিতা এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হোক না কেন।

চাই সে ধনী হোক, কি গরীব; তাদের উভয়ের সাথে আল্লাহর যোগ-সম্পর্কই তো সবচেয়ে বেশী। সুতরাং সুবিচারের ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল-খুশীর অনুসারী হবে না। তোমরা যদি নুয়ে পড় বা এড়িয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। -সূরা নিসা ঃ ১৩৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥

-ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্যে সুবিচার স্থাপনকারী, ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন বে-ইনসাফীর জন্যে প্ররোচিত না করে; বরং সর্বাবস্থায় সুবিচার করবে। এটা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ج وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥

-আর য়াতীমের মালের নিকটেও যাবে না, কিন্তু চমৎকার পন্থায়, যতক্ষণ সে যৌবনে উপনীত না হয়। আর ইনসাফের সাথে মাপ-ওজন পূরা করবে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। আর তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে; যদি কোন আত্মীয়ও হয় না কেন। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূরা করবে। আল্লাহ্ তোমদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর -আন'আম ঃ ১৫২

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥

-আর তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করলে তা করবে ইনসাফের সাথে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪২

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ج وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط

-সুতরাং তুমি সেদিকেই আহ্বান করবে এবং তোমাকে যেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেভাবে সুদৃঢ় থাকবে। আর তাদের খাহেশের অনুসরণ করবে না এবং বলবে, আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করছেন, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। সূরা আশ্-শূরা ঃ ১৫

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

-আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের মাল খাবে না, আর তা শাসনকর্তার নিকট পৌছাবে না, যাতে পাপের সাথে জনগণের মালের একাংশ খেয়ে নেবে; অথচ তোমরা জান। - সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

হাদীস শরীফে আছে ঃ

احب الناس الى الله يوم القيا مة واقربهم منه مجلسا امــــام عــادل –
وابغض الناس الى الله يوم القيا مة وابعدهم منه مجلسا امام جائر –

-ন্যায়-বিচারকারী শাসনকর্তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবে। তার স্থান হবে আল্লাহর নিকটে। আর যালিম শাসনকর্তা হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি। আর তার স্থান হবে আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে। -তিরমিযী

ইসলামের ইতিহাস নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করে রেখেছে, যা কায়েম করেছিল ইসলামী হুকুমত। এমন কি সেদিনগুলোতেও, যখন তথাকথিত খলীফারা ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কারণ কাযীর বিবেক এবং মুসলিম উম্মার সচেতনতা ছিল সুবিচার, ন্যায়-নীতির পর্যবেক্ষক। আল্লাহর ভয় এবং তাঁর শাস্তির শংকা নিয়ে তাঁরা ক্ষমতা গ্রহণ করতেন। তাঁদের মন সদা সন্ত্রস্ত ছিল এই ভেবে যে, সুবিচার, ন্যায়-নীতিতে যদি অলসতা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় বা যুলুম-অবিচার দেখেও যদি খামুশ থাকা হয়, তাহলে আল্লাহর আযাব অবশ্যই নিপতিত হবে।

এখানে ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়-নীতি বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। ইসলামের ইতিহাসে সংরক্ষিত ঘটনাবলীর মধ্যে কেবল দুটি উদাহরণস্বরূপ পেশ করছি।

এক ঃ হযরত আলী (রাঃ) জনৈক খ্রীষ্টানের নিকট তাঁর লৌহবর্ম দেখতে পেয়ে তাকে কাযীর দরবারে হাযির করে বলেন ঃ এ লৌহবর্ম আমার, এটা আমি কাউকে দান করিনি, কারো কাছে বিক্রয়ও করিনি। কাযী শোরাইহ্ অভিযুক্ত খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি ? সে বলল ঃ নিঃসন্দেহে এ লৌহবর্ম আমার। অবশ্য আমি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদী বলি না। অতঃপর কাযী হযরত আলী (রাঃ)-র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কাছে কি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে? হযরত আলী (রাঃ) হেসে বললেন ঃ শোরাইহ্ ঠিক বলেছে। আমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

অতঃপর কাযী শোরাইহ্ উক্ত খ্রীষ্টানের পক্ষে রায় দিলেন। সে লৌহবর্মটি নিয়ে চলে গেলো। কিন্তু কয়েক কদম গিয়েই ফিরে এলো। বললো ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটা নবীদের ফয়সালা। আমীরুল মুমিনীন! আমাকে কাযীর নিকট নিয়ে আসেন আর সেখানে ফয়সালা হয় আমার পক্ষে! "আশহাদু আল্লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" আমীরুল মুমিনীন! লৌহবর্মটি নিশ্চিত আপনার। আপনি যখন সিফ্ফীন থেকে ফিরে আসছিলেন, আমি সৈন্যদের পেছনে ছিলাম। আপনার মেটে রঙের উষ্ট্রের পিঠ থেকে লৌহবর্মটি পড়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ যেহেতু এখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ, তাই এটা তোমার!

দুইঃ কাযী আবূ ইউসুফ বিচার মজলিসে উপবিষ্ট। তাঁর সামনে ফয়সালার জন্যে পেশ করা হলো এক ব্যক্তির মোকদ্দমা। একটা বাগানের ব্যাপারে। এর মালিকানা নিয়ে বিবাদ ছিল আব্বাসীয় বাদশাহ হাদী'র সাথে। ইমাম আবু ইউসূফ দেখলেন, সত্য লোকটির পক্ষে, কিন্তু এ সত্ত্বেও হাদীর কাছে রয়েছে সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমাম আবূ ইউসূফ বললেন ঃ দ্বিতীয় পক্ষ চায়, হাদী শপথ করে বলুক যে, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। এতে হাদী শপথ করতে অস্বীকার করেন। কারণ এতে তাঁর কিছুটা অপমান বোধ হচ্ছিল। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ বাগানটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়ার ফয়সালা দেন।

সামজের লোকেরা যখন নিশ্চিত হবে, যে আইন অনুযায়ী তাদের বিচার-ফয়সালা করা হয়, তা তাদের ন্যায়পরায়ণ মা'বুদের তৈরী, আর যে শাসক এ কাজের কর্মকর্তা, তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেন আল্লাহর ভয়-ভীতিকে সম্মুখে রেখে, তখন তাদের মন সুদৃঢ় এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, এক সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক শান্তি, মানে শাসন বিভাগ আর বিচার বিভাগের মধ্যে সুবিচারের গ্যারান্টির ভিত।

শান্তি-নিরাপত্তার গ্যারান্টি

যতক্ষণ কোন জনগোষ্ঠিতে সাধারণ শান্তি এবং সে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পর্যাপ্ত শান্তি না থাকে, ততক্ষণ সেখানে শান্তি-নিরাপত্তা স্থাপন করা সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে মনের শান্তি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম সামাজিক জীবনে ব্যক্তির জন্যে শান্তি-নিরাপত্তার গ্যারন্টি দেয়, যাতে এর মাধ্যমে তার মন-মানস এবং চিন্তাধারায় শান্তি-নিরাপত্তা স্থাপন করতে পারে।

এ শান্তি-নিরাপত্তা সমাজের দায়িত্বও। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি এবং সমষ্টি পরস্পর দুশমন এবং একে অপরের বিরোধী নয়; বরং এক দেহ দু'প্রাণ। ব্যক্তির দু'টি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে ব্যক্তি সত্তা আর অপরটি সামাজিক সত্তা। ইসলাম আল্লাহর নিকট থেকে আইন-বিধান গ্রহণ করে, কোন মানুষের কাছ থেকে নয়; ইসলামের এ প্রকৃতি থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি সমষ্টির জন্যে আইন প্রণয়ন করে না, সমষ্টিও করে না ব্যক্তির জন্যে। ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়ে আল্লাহর আইনের সামনে মাথা নত করে, যা সকলকেই হিফাযত করে, সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

এ নিগূঢ় তত্ত্ব যখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ব্যক্তির শান্তি সমাজের সার্বিক শান্তিতে পরিণত হয়, আর সমষ্টির শান্তি পরিণত হয় ব্যক্তি-বিশেষের শান্তিতে। এতদোভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে না।

সাধারণ সামাজিক শান্তি বিস্তারে সকল সুস্থ ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কারণ এ শান্তি বর্তমান থাকলে তার ওপরে জোর-জবরদস্তি চলতে পারে না, কেউ তার পথরোধ করতে পারে না, পারে না কেউ তার বৈধ লক্ষ্য এবং শুভ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধক হতে। সমষ্টি যখন তার সকল সদস্যকে

শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা দিয়ে আশ্রয়স্থলে স্থান দেয়, তখন সে নিজ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে। ব্যক্তির ওপর যুলুম-সিতম এবং জোর-জবরদস্তি করায় তার কোন স্বার্থ থাকে না। তাদের পথরোধ করায়ও থাকে না কোন কল্যাণ নিহিত।

স্বভাববিরুদ্ধ ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও পরিবেশকে উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত করা যায় না। কারণ মানবীয় এবং পার্থিব আইনের অনুসারীরা এতে বিঘ্ন ঘটায়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের স্বার্থে এ আইন প্রণয়ন করে। এমন ব্যক্তিরা আল্লাহ্ এবং তাঁর আইনের বিরোধী-বিদ্রোহী, অথচ তা প্রণীত হয়েছে তাদেরই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বার্থে। এ আইন অনুযায়ী যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন তা কোন ব্যক্তি বা দলের নামে দেয়া হবে না; বরং তা দেওয়া হবে আল্লাহর নামে, তাঁরই আইন অনুযায়ী। তাদের শাস্তির অর্থ এ নয় যে, সমষ্টির হাতে তাদেরকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে; কারণ তারা সমষ্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। বরং তা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করার জন্যে জনস্বার্থের নিমিত্ত, যা আল্লাহ্ পূরা করতে চান। এ শাস্তি যতই কঠোর হোক না কেন, তাতে প্রতিশোধের ছায়ামাত্রও থাকবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রণয়নকালে তাঁর বিশেষ কোন স্বার্থ সামনে রাখেন না। তাঁর সম্মুখে থাকে কেবল বান্দার সাধারণ স্বার্থ। আর সে স্বার্থের বিরুদ্ধে উদ্ভূত কারণ দূর করতে চান তিনি। এতে কোন বিশেষ স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব বা কোন আপন খাহেশ পূরণ করার বিষয়টি সামনে থাকে না।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের ওপর যে সব দায়িত্ব ফরয করেছেন, তাতে এ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর রয়েছে। বিশ্বে গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা যে শাস্তিলাভ করে, তাতেও এ চিন্তাধারা কার্যকর দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা ব্যাপক কল্যাণাভিসারী আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে পাপাচার-অনাচার এবং বাড়াবাড়ি করেছে।

এসব নিরাপত্তা-নিশ্চয়তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে জীবনের গ্যারান্টি ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ –

-যে প্রাণ সংহারকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সত্য ছাড়া তা হত্যা করবে না। -সূরা আন'আম ঃ ১৫১

এ নির্দেশে প্রতিটি জীবন-প্রাণ এক সমান। কোন শর্ত এবং কোন বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই এ অধিকার তার রয়েছে। অবশ্য ন্যায় ও সত্যের জন্যে প্রাণ সংহার হলে তা ভিন্ন কথা। একজন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষের হত্যার সমান। কারণ হচ্ছে, মূল সত্তার অধিকারের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। প্রাণ সংহারের মানে হচ্ছে জীবনের অধিকার হরণ করা। আল্লাহর চিরন্তন শরীয়তে সকল যুগে এ নীতি কার্যকর ছিল ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

-এ কারণে আমরা বনী ইসরাঈলের ওপর এ নির্দেশ ফরয করেছি যে, কিসাস এবং বিশ্বে গোলযোগ ছাড়া যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে; সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কোন মানুষকে জীবন দান করে, সে যেন সকল মানুষকে জীবন দান করে। - সূরা -আল-মায়েদা ঃ ৩২

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

-আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল বাস করবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও লা'নত। আর তার জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট শাস্তি। -সূরা আন্-নিসা ঃ ৯৩

এ ধরনের মৌলিক অধিকারের জন্যে ইসলাম কেবল মনের নিরাপত্তা বিধানই করেনি, পরকালের শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেই শেষ করেনি, বরং স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে আইনের গ্যারান্টিও দিয়েছে। ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস নির্ধারণ করে দিয়েছে, আর ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে ফিদাইয়া এবং রক্ত-মূল্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। জীবনের ওপর কৃত বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ করেছে কিসাসকে। এ বাড়াবাড়ি যদি হত্যা পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তার প্রতিশোধ হবে হত্যা। আর তা যদি আঘাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার কিসাসও হবে সে অনুপাতে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط

-ঈমানদারগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমদের ওপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। - সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৮

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

-জ্ঞানী মন্ডলী! তোমাদের জন্যে কিসাসে জীবন নিহিত রয়েছে। সম্ভবত তোমরা বিরত থাকবে। -বাকারা ঃ ১৭৯
বনী ইসরাঈলকে দেয়া তাওরাতের বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط

-এবং আমরা তাদের ওপর তাওরাতে ফরয করেছিলাম যে, জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বিনিময়ে

চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং অন্যসব আঘাতের ব্যাপারে কিসাস হবে। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪৫

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبدة جدعناه ٥

-যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো, আর যে ব্যক্তি তার গোলামের নাক কাটবে, আমরা তার নাক কাটবো। -বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী,নাসাঈ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلَايُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ٥

-আর অন্যায়ভাবে যাকে হত্যা করা হবে, আমরা তার ওলীকে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; অবশ্যই তার সাহায্য করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥

-কোন মু'মিনের জন্য অপর মু'মিনকে হত্যা করা সমীচিন নয়। অবশ্য যদি ভুল হয়ে যায়, সে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি ভুল করে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তাকে একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করতে হবে এবং রক্ত-মূল্য দিতে হবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে। অবশ্য সে যদি ক্ষমা করে দেয়; তা ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি এমন জাতির মধ্য থেকে হয়, যে তোমদের দুশমন কিন্তু সে মু'মিন, তবে একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করতে হবে। আর সে যদি এমন জাতির মধ্যে থেকে হয়ে থাকে, যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তবে তার ওয়ারিসকে রক্ত-পণ দিতে হবে। আর একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তা পারবে না, তাকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবা (হিসাবে নির্ধারিণ করা হয়েছে)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি কুশলী। - সূরা আন্-নিসা ঃ ৯২

জীবনের নিরপত্তার পরই পালা আসে ইযযত এবং সম্পদের নিরাপত্তার ঃ

كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله –

-মুসলমানের সব কিছুই অপর মুসলমানের জন্যে সম্মানার্হ, তার রক্ত, তার ইযযত এবং সম্পদও। -বুখারী, মুসলিম

রক্তের গ্যারন্টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে ইযযত-আবরুর গ্যারান্টি। ব্যভিচার এবং অপবাদ আরোপের শাস্তি এর অন্তর্ভুক্ত ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَاتَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ০

- ব্যাভিচারী নারী হোক, কি পুরুষ- তাদের প্রত্যেককে একশ' ঘা চাবুক মারবে। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে কোন অনুগ্রহ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে, আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তোমাদের যদি ঈমান থাকে, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি কোমল আচরণ করবে না। তাদের শাস্তিস্থলে ঈমানদারদের একটি দল উপস্থিত থাকা উচিত। -সূরা আন্-নূর ঃ ২

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ০

-এবং যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী হাযির করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে আশি ঘা চাবুক মারবে এবং এদের সাক্ষ্য কখানো গ্রহণ করবে না, আর এরাই তো হচ্ছে ফাসিক-পাপাচারী। -সূরা আন্-নূর ঃ ৪

অবশিষ্ট রয়েছে অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা। এখানে অর্থ-সম্পদ মানে ইসলাম সমর্থিত বৈধ পন্থায় অর্জিত হালাল অর্থ-সম্পদ। প্রতরণা, সুদ, গুদামজাতকরণ, চুরি, লুট-তরাজ ইত্যাদি পন্থায় অর্জিত টাকা-পয়সা নয়। অপারগ অবস্থা ছাড়াই 'চুরি' করার শাস্তির মধ্যে এ সবের দায়িত্ব নিহিত রয়েছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ০

-চোর-পুরুষ-নারী যে হোক না কোন, তাদের দু'হাত কেটে দাও, তাদের কর্মফল হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি এবং শিক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকুশলী। মায়েদা ঃ ৩৮

জান-মাল-ইযযত, আব্রুর নিরাপত্তার পরই আসে বাসস্থানের সম্মান-মর্যাদার প্রশ্ন। বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা যায় না, তার গৃহের জানালা, আলোর পথ বা দেয়াল পথে উঁকি মারা যায় না, যায় না তা টপকানো ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

- ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। সেখানে যদি ঘরে কাউকে না পাও তবে তোমরা অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। - সূরা আন-নূর ঃ ২৭-২৮

وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

-তোমরা পেছন দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করবে, এতে কোন পূণ্য নেই। বরং পূন্য তার, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। -সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৯

এরপর আসে ব্যক্তি-স্বাধীনতর নিরাপত্তা। এর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি চালানোর কথা অকল্পনীয় ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوا۟ –

-একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি করবে না। -সূরা আল-হুজরাত ঃ ১২

পরনিন্দা থেকে মুক্তির গ্যারান্টিও রয়েছে ইসলামে ঃ

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا –

-আর একে অপরের নিন্দা করবে না। - সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১২

একের নিকট অন্যের মান-সম্মানের নিরাপত্তাও রয়েছে ঃ

يَآ يُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ٥

-ঈমানদারগণ! এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। হতে পারে, তারা ওদের চেয়ে উত্তম। এক নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস করবে না, হতে পারে এরা ওদের চেয়ে উত্তম। একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, একে অপরকে খারাপ নামে ডাকবে না। -সূরা হুজুরাত ঃ ১১

কুরআন মজীদে এসব অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এ জন্যে তা'জীর (দন্ডবিধি) নির্ধারণ করেছে। আর তা'জীর বলতে এমন সব দন্ডবিধি বুঝায়, যা হুদূদ বা কুরআন-হাদীস নির্ধারিত দন্ডবিধির চেয়ে ন্যূনতম। আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা কাযীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু যারা বিশ্বে সাধারণ গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং সমাজে অপরাধ করে, এদের বিরুদ্ধে কঠোর দন্ডের ব্যবস্থা করে তাদের হাত থেকে সমাজকে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম। এ সব দন্ড কারো ব্যক্তিগত অপরাধের দন্ডের চেয়ে কঠোর। কারণ গোলযোগ সম্পর্কে সামাজিক আশংকা এক ধরনের বিশেষ আশংকা, এর শাস্তিও অসাধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥

-যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের নিশ্চিত শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, শূলীবিদ্ধ করা হবে, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কাটা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটা হচ্ছে তাদের জন্যে লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩৩

অতঃপর এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলাম অপবাদ আরোপ থেকেও নিরাপত্তা বিধান করেছে। এ ক্ষেত্রে এসব নিরাপত্তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ মানুষের জন্যে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত থাকা, নিছক সন্দেহের কারণে গেরেফতারী থেকে হিফাযতে থাকা এবং অনিশ্চিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থাকাও একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে ইসলাম এমন সব সুদৃঢ় নীতিমালা উপস্থাপন করে, যার ভিত্তিতে অপরাধ তদন্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, নিছক ধারণার ভিত্তিতে কাউকে গেরেফতার করা যাবে না।

সাক্ষ্যদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। দলীল-প্রমাণ হতে হবে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং সন্দেহের কারণে দন্ড মওকুফ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا

-ঈমানদারগণ! অধিক ধারণা থেকে বিরত থাকবে।কারণ অনেক ধারণা গুনাহের কাজ। একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না। -সূরা হুজুরাত ঃ ১২

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

-ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক-পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে এলে তোমরা ভালোভাবে তদন্ত করে নেবে, যাতে অজ্ঞতার কারণে কোন জাতির ওপর হামলা না করে বস, আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হতে হয়। -সূরা হুজুরাত ঃ ৬

মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ادرأوا الحدود بالشبهات -

-তোমরা সন্দেহের কারণে দন্ড মওকূফ কর। -মুসনাদে আবূ হানীফা

আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি যে, ব্যভিচারের শাস্তির জন্যে চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষী প্রয়োজন। যে ব্যক্তি কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে কিন্তু চারজন সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হবে, তাকে আশি ঘা চাবুক মারতে হবে।

স্বীকারোক্তিকে ইসলাম দলীল-প্রমাণ বলে স্বীকার করে। অবশ্য শর্ত হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে যেন কোন সন্দেহ না থাকে। সন্দেহের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রথম পর্যায়ে ফিরে যাবে এবং দন্ড কার্যকর করা হবে না। হাদীস শরীফে আছে সাহাবী হযরত মায়ায ইবনে মালিক (রাঃ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেন এবং তাঁর ওপর শরীয়ত নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগের দাবি জানান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকাপোক্তভাবে স্বীকার না করিয়ে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেননি। তিনি চারবার তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। সাহাবী বারবার ফিরে এসে অপরাধের কথা স্বীকার করেন, চতুর্থ দফা স্বীকার করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, লোকটি কি পাগল? জবাব এল, না। আবার তিনি জানতে চাইলেন, লোকটি কি মদ্যপান করেনি? এক ব্যক্তি উঠে গিয়ে তার মুখ শুঁকে বললো ঃ না, মদের দুর্গন্ধ তো তার মুখে নেই।

অতঃপর মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? লোকটি বললো, হাঁ। এতটুকু সন্দেহমুক্ত এবং স্পষ্ট হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দন্ড দেন। কারণ, এখন তার স্বীকারোক্তির সত্যতায় আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট নেই।

ইসলামী আইন অনুযায়ী ইযতিরার বা অনন্যোপায় একটা অবকাশকাল। এ অবস্থায় শরীয়ত নির্ধারিত দন্ডদান নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلآَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط

-অতঃপর কেউ যদি অনন্যোপায় হয়, কিন্তু বিদ্রোহী এবং সীমালংঘনকারী নয়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। -সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৩

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রসিদ্ধ রামাদা'র দুর্ভিক্ষে সাধারণ চুরির দন্ড মওকুফ করে দিয়েছিলেন। এমানিভাবে তিনি হাতিব ইবনে আবি বালতা'আর ভৃত্যের উষ্ট্রী চুরির ঘটনায়ও- যা ছিল একটা বিরল ঘটনা -চুরির শাস্তি রহিত করেছিলেন। কারণ তাঁর নিকট এ সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল যে, তাদের মুনিব তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য দিত না। তাই তিনি উষ্ট্রীর মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য মুনিবের ওপর জরিমানা হিসেবে আরোপ করার ফয়সালা দেন এবং ভৃত্য চোরদেরকে তিনি মুক্ত করে দেন।

ফলকথা, ইসলাম এমনিভাবে ব্যক্তি এবং সমষ্টির জন্য জানমাল-ইযযত এবং অন্যসব অধিকারে অনেক নিরাপত্তা দিয়েছে। এর সাথে সাথে রয়েছে এসব নিরাপত্তার যথার্থ প্রয়োগের অধিকার এবং অপবাদকালে নির্ভুল দলিল-প্রমাণের অধিকার। সমাজবৃত্তে এসব নিরাপত্তার স্থান হচ্ছে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তাসুলভ ইমারতে ইঁটের মত। এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামী আইনে, যা সকলের জন্য প্রণীত। এতে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, নেই কোন ব্যক্তিস্বার্থ এবং কারো মনস্কামনার কোন স্থান।

অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা

ইসলাম ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে অর্থনীতিকে তার সকল দিক এবং বিভাগসহ পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে কোন বস্তুবাদী দর্শন থেকে মোটেই পিছিয়ে নেই। পার্থক্য শুধু এই যে, ইসলাম মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখে না যে, মানুষ কেবল অর্থনীতির পেছনেই ছুটে বেড়াবে। জীবনের অন্যান্য দিক-বিভাগ এবং আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কেও ইসলাম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে জানে। ইসলাম মানুষের প্রয়োজনের ব্যাপারে তার অস্তিত্বে অর্থনীতির গভীরতা এবং তার স্বভাব-প্রকৃতিতে এর গুরুত্ব এবং মৌলিকত্বকে স্বীকার করে। সাথে সাথে ইসলাম এটাও জানে যে, মানুষের আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাংখা তার অস্তিত্বে কতটা গভীর এবং তার স্বভাবে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে ইসলাম মানুষের আবেগ এবং প্রয়োজনের প্রতি পূর্ণ

লক্ষ্য রাখে এবং তাকে যথার্থ স্থান দেয়ার প্রতি বিরাট গুরুত্ব দেয়। এর গভীরতা-ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রাখে। এর ফল হয় এই যে, জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হয় সম্পূর্ণ যথার্থ, মানবতা সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা হয় অত্যন্ত সত্য। অনুরূপভাবে মানুষের জন্যে ইসলামের যত্ন হয়ে থাকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ আর তাদের চাহিদার জবাব হয়ে থাকে সব দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ।

ইসলাম এ ব্যাপারে উদাসীন নয় যে, ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করতে না পারলে সকল আইন আর সকল নিরাপত্তা ভেঙ্গে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করতে না পারলে তার আত্মার চাহিদা এবং আশা-আকাংখা সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার মনের চাকচিক্যও যাবে মলিন হয়ে। এ কারণেই ইসলাম প্রথমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে ব্যাপক করার প্রেরণার সাথে সাথে তার নিরাপত্তাও বিধান করে এবং শেষে গোটা সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করে।

এখন আমরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, ইসলাম তা বিস্তার করে কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ধারণের প্রথম মাধ্যম হচ্ছে কাজকর্ম এবং শ্রম। ইসলাম শ্রমের মর্যাদা দিয়ে তাকে উন্নত স্থান দিয়েছে; শ্রমিককে দিয়েছে উচ্চ মর্যাদা। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেনঃ – ان الله يحب العبد المؤمن المحترف

-নিশ্চয়ই আল্লাহ কাজ-কর্ম এবং কোন পেশা অবলম্বনকারী মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন। -তাফসীরে কুরতুবী

অপর এক হাদীসে আছে ঃ – ما اكل احد طعاما قط خيرا من عمل يده –

-আপন হাতে অর্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ খায় না। -বুখারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়ে বলেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগে তাকে তার মুজুরী দাও- তার প্রাপ্য পুরোপুরি দাও। মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ-এর মতে শ্রমিকের মজুরী হতে হবে কাজের লভ্যাংশের অর্ধেক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরবাসীদের সাথে অর্ধেক খাদ্যের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

যাই হোক, ইসলাম শ্রমকেই মালিকানার কারণ বলে গণ্য করে আর শ্রমকেই মনে করে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তার উপায়। ব্যক্তি কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম হলে তার ব্যয়ভার বহন করা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কর্তব্য হয়ে যায়।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) শিশুর জন্যে এক শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। শিশু একটু বড় হলে দু'শ দিরহাম ভাতা পাওয়া যেত। শিশু যৌবনে পদার্পণ করলে ভাতা আরও বৃদ্ধি করতেন। লা-ওয়ারিশ

শিশুর জন্যে এক শ' দিরহাম আর তার লালন-পালনকারীর জন্যে মাসিক ব্যয় নির্ধারণ করতেন। তাকে দুধদায়িনীর বিনিময় এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বায়তুলমালের যিম্মায় থাকত। শিশুটি বড় হলে তাকে অন্যান্য শিশুর সমপর্যায়ের করে নেয়া হতো। বার্ধক্য এবং রোগ-ব্যধি ইত্যাদি কারণে যে সব য়াহূদী-নাসারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ত, মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তাদেরকে ভাতা দেয়া হতো। কারণ তাদেরকে মুসলিম সমাজের সদস্য মনে করা হতো।

কারো শ্রম এবং কাজ-কর্ম তার প্রয়োজন পূরণ করতে অসমর্থ হলে বায়তুলমাল তারও দায়িত্ব গ্রহণ করত। যেমন ফকীরের ব্যাপার। ফকীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই। আর মিসকীন হচ্ছে কপর্দকহীন- যার নিকট কিছুই নেই। মুসাফির হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার অর্থ-সম্পদ আছে, কিন্তু সে তা থেকে দূরে। আর ঋণগ্রস্থ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার সমুদয় অর্থকেই ঋণ আচ্ছন্ন করে ফেলে। অবশ্য এ জন্যে শর্ত হচ্ছে, সে যেন পাপের কাজে অর্থ ব্যয় না করে। এরা সকলেই যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার যোগ্য। সরকার বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করবেন এবং অভাবগ্রস্থদের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যয় করবেন।

ইসলাম ব্যক্তির জন্যে এটাও বৈধ করেছে যে, কেউ যদি কারো কাছ থেকে তার দানা-পানি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এবং সে ব্যক্তি ছিনতাইকারীর সাথে লড়াই করে, এমন কি তাকে হত্যাও করে, তাহলে এটা নাজায়েয হবে না। অবশ্য শর্ত হচ্ছে এই যে, উক্ত বস্তু তার জন্যে একান্ত জরুরী হতে হবে। কারণ উক্ত বস্তুও জীবন প্রতিরোধের অধিকারের সমতুল্য। ইমাম ইবনে হাযম-এর মতে কোন মহল্লায় ডাকাত হানা দিয়ে যদি কারো জীবন-জীবিকার উপকরণ ছিনিয়ে নেয় এবং লোকটি অভুক্ত মারা যায়, তার রক্তপণ পরিশোধের দায়িত্ব মহল্লাবাসীদের। এর কারণ এই যে,সমাজ তার সকল সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্যে দায়িত্বশীল। আর তার এ দায়িত্ব পালন কোন অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার জন্যে লাযিম বা অবশ্য করণীয়।

এ ছাড়াও ইসলামে পরিবারের ভরণ-পোষণেরও স্পষ্ট বিধান রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবিকা উপার্জনে অক্ষম এবং অভাবী, তার ব্যয় নির্বাহের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করা তার নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য, যাতে তার প্রয়োজন নির্বাহের ব্যবস্থা হতে পারে। এ দিক থেকে খান্দানের সাধারণ বিত্ত তার সকল সদস্যের বৈধ প্রয়োজন নির্বাহের যিম্মাদার। এটাও দান বা অনুগ্রহ নয়; বরং নির্দেশ এবং বাধ্যতামূলক।

এ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা সরকারের অধিকার (কার ইত্যাদি) নয় সরকার ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত কর আরোপের প্রস্তাব করতে পারে। সরকার এ উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানা, কোম্পানী এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে, যাতে সাধারণ নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান হতে পারে, তাদের রুটি-রুযীর ব্যবস্থা হতে পারে। সরকার এছাড়া অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে। সামাজিক ভারসাম্য অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জাতির যেসব সদস্য সক্ষম বা অক্ষম, ইসলামী সংগঠন, সরকার তাদের সকলের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের যিম্মাদার- এটা বর্ণনা করাই এখানে আমাদের লক্ষ্য। তাদের এ অক্ষমতা স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী অথবা আংশিক। আমরা এ কথা প্রমাণ করতে চাই যে, এ দায়িত্ব পালনে সমাজে শান্তি-সুস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ থেকে দূর হয় ক্ষুৎ-পিপাসাজনিত অস্থিরতা।

অবশিষ্ট রয়েছে সাধারণ বিত্ত বন্টনে কাটা অসমতার ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা এবং সমাজের বৃত্তে অধিকার ও কর্তব্যকে এক বিশেষ ছকে বন্টনের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব।

সামাজিক ভারসাম্য

ইসলামের সামগ্রিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব মানুষের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং সকলের জন্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বিধান করা নিছক প্রাথমিক পদক্ষেপ। ইসলামের অন্যতম মৌলনীতির ওপর এ প্রাথমিক পদক্ষেপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

الرجل وبلائه والرجل وحاجتة

-সত্য পথে মানুষকে যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে আর তার প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ নীতির ভিত্তিতে গনীমতের মাল বিলি-বন্টন করেছিলেন। মানবতা আজও সে স্থানে পৌছার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে; কিন্তু সফল হয়নি। কারণ তারা এর উভয় দিককে গ্রহণ করেনি! সকল ধর্মমতই এর কোন একটি দিককে গ্রহণ করেছে। আর অপর মতবাদ গ্রহণ করেছে ভিন্ন একটি দিককে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলাম যে ব্যাপকতা অবলম্বন করেছে, অন্যান্য মতবাদ তা অবলম্বন করতে পারেনি।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, পরিপূর্ণ সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। ইসলামের এ সব পদক্ষেপ গোটা সমাজে শান্তি স্থাপন করে। যে প্রকান্ড ভিত্তির ওপর ইসলাম সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তা হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য। ইসলামের এ সামাজিক সুবিচারের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজের শান্তি ও সুস্থিতি। এ অধ্যায়ে ইতোপূর্বে যেসব নিরাপত্তা এবং দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা বা কার্যকারণ মাত্র।

শাসননীতি এবং শাসন প্রণালীতে এ ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। আইন এবং বিচার ব্যবস্থা, শান্তি স্থাপন এবং খাদ্য বন্টন ব্যবস্থায়ও। কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগে তা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এতে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন এবং তার নিয়ম-নীতি। ইসলাম বিভিন্ন উপায়ে এ উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পষ্ট উপায়গুলো আমরা এখানে

সংক্ষেপে পেশ করতে চেষ্টা করব। কারণ, আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম। ইসলামে সামাজিক সুবিচার সম্পর্কে আলোচনা করা এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য নয়।[১]

কয়েকটি সাধারণ মূলনীতির ওপর ইসলাম এ ভারসাম্য স্থাপন করে। ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সব মূলনীতিকে দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে।

প্রথম মূলনীতি ঃ সম্পদ যেন কেবল বিত্তবানদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়।

প্রথম মূলনীতি হচ্ছে এই যে, বিত্তহীনদেরকে বাদ দিয়ে কেবল বিত্তবান ব্যক্তিদের হাতেই যেন অর্থ-সম্পদ- পুঞ্জীভূত না হয়। আল-কুরআনের একটি স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াতের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকান্ডের মধ্য থেকে একটি বাস্তব কর্মের কার্যত প্রমাণ হিসেবে ইসলাম এ মূলনীতিকে এ ভাবে উপস্থাপন করেছে ঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ط

-যেন তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই (সম্পদ) আবর্তিত না হয়। -সূরা হাশর ঃ ৭

এ নির্দেশ একটি সাধারণ মূলনীতির স্থান গ্রহণ করেছে। য়াহূদী গোত্র বনী নযীর-এর নিকট থেকে অর্জিত সম্পদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবটুকুই বিত্তহীন মুহাজিরদেরকে দান করেছেন, বিত্তবান আনসারদেরকে নয়। অবশ্য এদের মধ্যে কেবল দু'জন লোককে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে মুহাজিরদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে এদের সাথে শামিল করা হয়। এর উদ্দেশ্য তখনকার মুসলমানদের দু'টি মেরুতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। অথচ আনসাররা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজেদের বিত্ত-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, অর্থ-সম্পদ এবং আসবাব-পত্রে তাদেরকে অংশীদার করেছিল এবং তাদের সাথে একটা পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিল, যা বংশগত ভ্রাতৃত্বে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। অথচ ইসলামের বিধান হিসেবে আনসারদের জন্যে এসব কিছু ফরয ছিল না। কেবল এতটুকুই ছিল যে, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অভাবী ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল।

এ ছাড়াও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) দৃঢ়তা এবং দ্ব্যর্থহীন কর্মধারাও এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট এবং সুদৃঢ় করে দেয়। যদিও প্রতারণা-প্রবঞ্চনায় আহত হওয়ায় তিনি এ অভিপ্রায় পূর্ণ করার অবকাশ পাননি, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে তা উপস্থাপন করেছেন এবং এ ব্যাপারে কোন মুসলমান তাঁর সমালোচনা করেননি। সুতরাং এটা একটা সাধারণ ইসলামী মূলনীতির মর্যাদা লাভ করছে। তিনি বলেছেনঃ

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে আমার প্রণীত 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' এবং 'ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য

لو استقبلت من امرى ما استدبرت لاخذت من الاغبياء فضول اموا لهم فرددتها على الفقراء -

-আমি পরে যা বুঝতে পেরেছি, তা যদি আগে বুঝতে পারতাম, তা হলে বিত্তবানদের নিকট থেকে তাদের বাড়তি বিত্ত উদ্ধার করে তা বিত্তহীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তী বৎসর এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে গনীমতের মালে মুসলমানদের হিস্সাও এক সমান করে দেবেন।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সম্পদ বন্টনের নিয়ম-নীতি নির্ণয় করা যায়। কিছু সময়ের জন্য এ নীতি কার্যকর ছিল না বটে, কিন্তু এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সকল যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কর্যকর করা এবং সকল অধ্যায়ে, সকল পর্যায়ে সামাজিক শান্তি-সুস্থিতির দাবির প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা ইসলামী সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত।

এ মূলনীতি ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে এবং তা কিছু শর্তের আওতাভূক্ত করে। উপরন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এটাকে রাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের পর্যায়ভূক্ত করে দেয়।[১]

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ যে সবক্ষেত্রে কোন স্পষ্ট বিধান নেই

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় এসব বিষয়কে বলা হয় 'মাসালেহে মুরসালা'- মানে এমন সব সাধারণ বিষয়, যে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পাওয়া যায় না। ইসলাম তা রাষ্ট্র-সরকারের হাতে ন্যস্ত করে। বরং স্থান-কাল-পাত্রের দাবি অনুযায়ী এ সবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলাম সরকারের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আমার রচিত 'আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়া ফিল-ইসলাম' (ইসলামের সামাজিক সুবিচার) গ্রন্থে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে আমি কেবল এটুকু স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ইমাম মালিক (র)-এর উক্তি অনুযায়ী এ মূলনীতির আলোকে মুসলমানদের সাধারণ প্রয়োজনে ব্যয় করার নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যতটুকু প্রয়োজন হয়, সমাজকে রক্ষা করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার হয়, আর রাষ্ট্রের সাধারণ উপায়-উপকরণ দ্বারা তা পূরণ করা যদি সম্ভব না হয়, ধনীদের মূলধন থেকে- তাদের ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে ট্যাক্স হিসেবে নয়; বরং প্রয়োজনে গ্রহণ করা সরকারের জন্যে কর্তব্য। প্রয়োজনে সরকার যা কিছু গ্রহণ করেছে, তা ফেরত দেয়া জরুরী নয়।[২]

---

১. মানে ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানা অস্বীকার করে না, আবার লাগামহীন ব্যক্তি-মালিকানার অনুমতিও দেয় না। অন্য কথায় ইসলামে ব্যক্তি-মালিকানা শর্তমুক্ত নয়, বরং শর্তযুক্ত। প্রয়োজনে এতে হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। -অনুবাদক

২.বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু যোহরা প্রণীত 'ইমাম মালিক (রঃ) গ্রন্থের 'মাসালেহে মুরসালা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

এ মূলনীতিতেও ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার সীমিত ও শর্তায়িত। এ মূলনীতি ব্যক্তি-মালিকানাকে সর্বদা সরকারের সাধারণ প্রয়োজন, অন্য কথায় গণ-প্রয়োজন-এর অধীন এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিধি-বিধানের অনুসারী করে। এতে কেবল গণ-সামাজিক প্রয়োজনের শর্ত রয়েছে। এর আলোকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সরকারের এ ক্ষমতা রয়েছে। কেবল ট্যাক্স আকারেই নয়; বরং ব্যক্তি-মালিকানা থেকে যুক্তিসংগত অংশ সরকার আদায় করবে এবং তা ফেরত দেয়াও দরকারী নয়। উদ্দেশ্য কেবল এটুকু যে, সমাজের সাধারণ প্রয়োজনে তা ব্যয় করতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ উপকরণ-মাধ্যমের পথ বন্ধ করা

এর অর্থ হচ্ছে অন্যায়-অপকর্মের কার্যকারণ দূর করা এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা; আর ন্যায় ও কল্যাণের উপায়- উপকরণ-মাধ্যমকে জরুরী বলে গণ্য করা। এ ব্যাপারে সার কথা হচ্ছে এই যে, হারামের উপায় হারাম আর ওয়াজিবের উপায়ও ওয়াজিব। ব্যভিচার হারাম, তাই বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম, কারণ তা হচ্ছে অপকর্মের উপায়। জুমু'আর নামায ফরয, তাই সেদিকে ধাবিত হওয়াও ফরয। আর এজন্যে কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য (মানে হাতের কাজ)ছেড়ে দেয়াও ফরয। বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয আর আল্লাহর ঘরের জন্যে হজ্জের সকল অনুষ্ঠানও ফরয। এ ব্যাপারে আসল বিষয় হচ্ছে কাজের পরিণতির প্রতি নযর দেয়া, এসব কর্মের শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখা। বনি আদমের যে সব কর্মকান্ড লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত, সে সব কর্মকান্ড যে পরিমাণ কাংখিত, স্বয়ং এ লক্ষ্যে-উদ্দেশ্য- যদিও উভয়ে সমান কাংখিত নয়। কিন্তু এর লক্ষ্য যদি বিপর্যয়মুখী হয় তবে তা'ও সে পরিমাণই হারাম হবে; মূল ফিতনার হারামের সাথে যতটুকু তার সামঞ্জস্য থাকবে।[১]

সামাজিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এখানে যে জিনিসটি আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে, গণ-সম্পদ বন্টনে ভারসাম্যহীনতার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এর ফলে অনেক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এসব বিপর্যয়ের মধ্যে এটাও কম নয় যে,তা ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং বিপদকালে প্রতিরক্ষার সাহসহীনতা প্রকাশ পায়। কারণ যে রাষ্ট্র বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর যুলুম-বঞ্চনা চাপিয়ে দেয়, সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় তাদের কি আগ্রহ থাকতে পারে? এমন রাষ্ট্রের জন্যে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করায় নিজেদের কি কল্যাণই বা তাদের দৃষ্টিগোচর হবে? সুতরাং যে মাধ্যম নিশ্চিত বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তার পথরোধ করা সরকারের কর্তব্য।

ব্যক্তি-মালিকানা সম্পর্কে ইতোপূর্বে যেসব শর্ত ও বাধ্য-বাধকতা আলোচিত হয়েছে, প্রথম মূলনীতিদ্বয়ের মত এখানেও আমরা তা-ই দেখতে পাচ্ছি। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। অন্যথায় সতর্কতা অবলম্বন করা সমাজেরও কর্তব্য। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে স্বার্থ রক্ষা করা, বিপথগামী সরকারকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আইন প্রয়োগে সরকারকে বাধ্য করা।

---

১. অধ্যাপক আবু যোহরা প্রণীত 'ইমাম মালিক (রঃ) দ্রষ্টব্য

চতুর্থ মূলনীতি ঃ সুদ হারাম

ইসলাম এটাকে একটা নীতি হিসেবে স্বীকার করে যে, শ্রম ও চেষ্টা-সাধনা ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময় পাওয়া যায় না। আর মূলধন যেহেতু নিজে কোন শ্রম নয়(বরং তা হচ্ছে শ্রমের ফল), সুতরাং তা আপনি বৃদ্ধি পায় না, পারে না তা কল্যাণকর হতে। কল্যাণ লাভের উপায় হচ্ছে কেবল শ্রম। এ নীতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন বিত্তবানের নিকট নিছক বিত্ত থাকা তার বিত্ত বৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। তাই ঋণ দিয়ে তাতে মুনাফা যে যোগ করা হয়, তা বৈধ নয়।

ইসলামের এ মূলনীতি অর্থ-সম্পদের আপনা আপনি বৃদ্ধির মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অধুনা পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় এ নীতিই কার্যকর রয়েছে। তাই ইসলাম সুদকে হারাম করে ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে পুঁজি করে সম্পদ বৃদ্ধির ওপর এক বিরাট বিধি-নিষেধ আরোপ করে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। (আপন খুশীতে কেউ তো সুদ দেয় না)। ইসলাম সুদকে হারাম করে সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমানকালের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধকেও প্রতিহত করেছে। ইসলাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমকে সঠিক মূল্য ও স্থান দেয়। সত্যিকার শ্রম এবং তার মজুরীর মধ্যে সুবিচার কায়েম করে। বসে বসে খাওয়া অলস ও কর্মবিমুখ ব্যক্তিদেরকে অন্যায়ভাবে কারো শ্রমের ফল লাভ করতে বারণ করে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় এ সব শেঠরা ব্যাংক ইত্যাদিতে টাকা লগ্নি করে মুনাফা গোণে। এমনিভাবে বসে বসে তারা হারাম মুনাফার অংশীদার হয়। তাদের বিত্ত ও পুঁজি দ্বিগুণ-চতুর্গুন বরং কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। পুঁতিগন্ধময় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এ মানসিকতাই দেখা যায়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যে এ মানসিকতা বাধ সাধছে।

পঞ্চম মূলনীতি ঃ গুদামজাতকরণ নিষিদ্ধ

সমস্ত বিশিষ্ট পণ্য সামগ্রীও এ গুদামজাতকরণের অন্তর্ভুক্ত । এ কাজটি গুদামজাতকারীর হাতে এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ক্ষমতার সৃষ্টি করে। নিজের প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাবলে সে এ ক্ষমতা অর্জন করে না কোন উন্নত সেবার বিনিময়েও সে তা অর্জন করে না। এ ক্ষমতা বরং সে লাভ করে এমন কর্মকান্ডের দ্বারা,যা বিশেষভাবে (বিপুল অর্থের কারণে)তার রয়েছে অথবা কোন বিশেষ পণ্যকে বাজারজাত না করে সে এ ক্ষমতা লাভ করে। এ উদ্ধত ক্ষমতাকে সব সময় ব্যবহার করা হয় অধিকাংশ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে অসহায় দলই এ যাঁতাকলে পিষ্ট হয়। আমরা জীবনের অনেক প্রয়োজনে গুদামজাতকারী কোম্পনীসমূহের কারণে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করছি। আমরা তাদের মুকাবিলা করতে অক্ষম। কারণ তারা আমাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং স্বয়ং প্রয়োজনকেও আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। শাসক শ্রেণী এবং তাদের তথাকথিত প্ররিদর্শকদের মুখ উৎকোচ দিয়ে বন্ধ করার ক্ষমতাও এদের রয়েছে। আর অসহায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এসব ঘুষের মূল্য আদায় করা হয় কয়েক গুণ বেশী। ভীষণ প্রয়োজনের সময় কোন পণ্য বা প্রয়োজনীয় বস্তু লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাও এ সব কোম্পানীর রয়েছে। এ সবের ফলে সামাজিক-ভারসাম্য ব্যাহত হয়।

কারণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ এমন শক্তি অর্জন করে বসে, যা বিপুল সংখ্যক লোকের নেই। এ সব কার্যকলাপের ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। কারণ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা সামান্য পরিশ্রমে সম্পদে বিপুল সংযোগের একটি উপায়। এ সামান্য পরিশ্রমের সাথে যোগ হয় হারাম উপায়-উপকরণ, সন্দেহজনক মাধ্যম, দায়িত্ব এবং বিত্ত ও চরিত্রের বিকৃতি। এমনিভাবে সর্বনাশ সাধিত হয় সমাজে বস্তুগত, আত্মিক এবং নীতি-নৈতিকতার ও চরিত্রের উপায়-উপকরণের।

ষষ্ঠ মূলনীতি ঃ সাধারণ কল্যাণকর বস্তুতে সকলের অংশীদারিত্ব

অধুনা এটাকেই বলা হয় অতীব প্রয়োজনীয় বস্তুর জাতীয়করণ। বলা হয়ে থাকে যে, স্বয়ং হাদীস শরীফে পানি, ঘাস এবং আগুনকে সাধারণ কল্যাণকর বিষয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এ সবকে কোন ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। এর ভিত্তিতে সাধারণ কল্যাণ-গুণের কারণে আরও কতিপয় বস্তুকে জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ বলে অভিহিত করে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য সাধারণ অংশীদারিত্বে দেয়া যেতে পারে। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই মালিকী মাযহাবের ফাকীহরা খনিজ দ্রব্য এবং ভূগর্ভস্থ সম্পদে সকলের অংশ রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এর ওপর কোনব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের অধ্যাপক আলী খফীফ লিখেছেন ঃ

ويرى مالكية فى اشهر اقوالهم ان ليس شئى من الانـــواع الثلاثـــة – المعادن والفلزات والسوائل فى محالها (مناجمها) من الا موال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها .... وانمـــا هـــى ملـــك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على ارضها لانها منها وثمرة من ثمرتها ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لها فلا تملك بامتلاكها – اذ ليس لتلها تملك الارض وتطلب عادة فبقيت للمسلمين –

-মালিকী ফকীহদের প্রসিদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী তাদের অভিমত এই যে, খনিজ দ্রব্য, ধাতব পদার্থ এবং তেল-পেট্রোল ইত্যাদি ত্রিবিধ দ্রব্য মুবাহ নয়, যে এসব অধিকার করে বসবে, সে-ই এগুলোর মালিক হবে না; বরং এগুলোর মালিক হচ্ছে সকল মুসলমান। ভূমি অধিকার করার ফলে তারাও এ সবের মালিক হয়েছে। কারণ এ সবও নির্গত হয় ভূমি থেকেই। এ গুলো ভূমিরই এক প্রকার ফল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এসব ভূমির অধীন বলে স্বীকৃত হবে না যে, ভূমির কালিকানার কারণে কেউ এসবেরও মালিক বনে বসবে। কারণ হচ্ছে এই যে, এসব বস্তুর কারণে ভূমির মালিকানা অর্জিত হয় না। সাধারণত এ জন্যে কেউ জমি ক্রয়ও করে না। তাই এগুলো সকল মুসলমানের যৌথ মালিকানাধীন থাকবে। -আহকামুল মুয়ামালাত

সন্দেহ নেই যে, মালিকী ফকীহদের এসব গণকল্যাণমূলক বস্তুকে গণমালিকানায় দান সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার অনুপস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণের পরিসমাপ্তি ঘটায়। কারণ এসব গণকল্যাণমূলক জিনিস সাধারণ সম্পদের সবচেয়ে বড় অথবা অন্যতম বড় অংশ হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এর মালিক হয় কোম্পানী বা ব্যক্তি। আর এ মালিকানা থেকে সমষ্টির মধ্যে অশুভ লক্ষণ দেখা দেয়। এমনিভাবে এটা পরিণত হয় দেশে দেশে বিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে।

সপ্তম মূলনীতি ঃ অপচয়-বিলাসিতা নিষিদ্ধ

ইসলাম মানুষকে বঞ্চনা-গঞ্জনায় নিক্ষেপ করতে চায় না; বরং পূত-পবিত্র বস্তু উপভোগ করার জন্যে ইসলাম মানুষকে আহ্বান জানায়। এ সবকে হারাম প্রতিপন্ন করা এবং বিনা কারণে এসব থেকে বিরত থাকাকে ইসলাম খারাপ মনে করে। এমনিভাবে ইসলাম অপব্যয়-অপচয় এবং বিলাসিতাকেও পছন্দ করে না। কারণ হচ্ছে এই যে, এগুলো পূত-পবিত্র ঈপ্সিত হালাল বস্তুরাজির পর্যায়ভুক্ত নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

-বনী আদম! সকল ইবাদতের সময় আপন আপন শোভা অবলম্বন কর আর পানাহার কর কিন্তু সীমালংঘন করবে না। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। বল, কে আল্লাহর শোভাকে হারাম করেছে- যা তিনি আপন বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছেন? বল, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা ঈমানদারদের জন্যে। এমনিভাবে আমরা জ্ঞানবান জাতির জন্যে নিদর্শনরাজি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করি। -সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩১-৩২

ইসলামের দৃষ্টিতে বিলাসিতা এক ধরণের গুনাহ্। কারণ তা ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে পতন ও অবনতি ডেকে আনে। ব্যক্তি ও জাতির অস্তিত্বে সৃষ্টি করে বিকৃতি এবং দুর্গন্ধ। মানব ইতিহাসে বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিরাই সমাজ এবং জাতির পতনের কারণ হয়েছে ঃ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ۝

-আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা-অভিপ্রায় করি, তখন সে জনপদের বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিদেরকে শাসনকর্তার স্থান দান করি। তারা সে জনপদে পাপাচার-অনাচার করে, অতঃপর সে

জনপদের ওপর আল্লার বাণী সপ্রামাণিত হয় আর আমরা তাকে ওলপ-পালট করে ছাড়ি। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬

এখানে যে বাস্তব তত্ত্বটি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, কোন জাতির মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা আসে জাতির অগণিত মানুষের দুঃখ-দৈন্যের বিনিময়ে। কারণ মুষ্টিমেয় বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি নিজেদের এবং ফালতু আসবাবপত্রের জন্যে যা কিছু ব্যয় করে থাকে, তা আসে জনগণের রক্ত, পরিশ্রম এবং তাদের প্রয়োজন-অভাব-অনটন থেকে। এর ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় হিংসা-বিদ্বেষ এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া আর সমাজ মুক্ত হয় শান্তি-নিরাপত্তার প্রাণ রস এবং সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি থেকে। এ পরিস্থিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর সমাজ মুক্ত হয় শান্তি-নিরাপত্তার প্রাণ রস এবং সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি থেকে। এ পরিস্থিতি সমাজের মানুষের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। কারণ তাদের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন, তাদের লক্ষ্যও এক নয়। উপরন্তু বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিরা সমাজে পাপ-পংকিলতা ছড়ায় আর নিজেদের ঘৃণ্য কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার নিমিত্ত অনেক দুর্গন্ধময় চিহ্ন এবং ঘৃণ্য নিদর্শন দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়।

যেহেতু এসব নফসের দাসদের হাতে অর্থের অস্তিত্বই হচ্ছে এমন এক অস্ত্র, যা তাদের জন্যে এসব পংকিল মনস্কামনা সরবরাহ করে; তাদের জন্যে প্রস্তুত করে এসব দুর্গন্ধময় মনস্কামনা, সঙ্গে সঙ্গে হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতার আগুনও প্রজ্বলিত করে সমাজের ভিতকে করে তোলে অন্তঃসার শূন্য, সমাজ প্রাসাদকে করে তোলে অবনত; তাই সেখানে এসে দাঁড়ায় উপকরণ প্রতিরোধের নীতি। এ নীতি আগুন নিয়ে খেলা করার। লোকদের হাত থেকে এ বিরাট অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়াকে রাষ্ট্র-সরাকারের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করে। এ দৃষ্টিতে উপায়-উপকরণ প্রতিরোধের এ নীতি অনাগতকালে দেখা দিতে পারে- এমন শংকা এবং সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নীতি। এ নীতি এমন সব মাধ্যমকে হারাম প্রতিপন্ন করে, যার পরিণতি হারামের আকারে দেখা দিতে পারে। যদিও স্বয়ং এ মাধ্যমটি হারাম না-ও হতে পারে। এ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব বিলাসপ্রিয় ব্যক্তির হাতে অর্থই হচ্ছে এমন একটা উপায়, যার কুফল থেকে রক্ষা করার মানসে তা প্রতিরোধ করা অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টম মূলনীতি ঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ٥

-এবং যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে, আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও। যে দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট,

পৃষ্ঠদেশে এবং পার্শ্বদেশে দাগানো হবে। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু পুঞ্জীভূত করে রেখেছিল, এ হচ্ছে তা-ই। সুতরাং তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে, তার স্বাদ আস্বাদন করো। -সূরা আত-তওবা ঃ ৩৪-৩৫

এর কারণ হচ্ছে এই যে, অর্থ-সম্পদকে জনগণের হাতে আবর্তিত হতে বারণ করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ সে সব প্রয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধার দাবি উপেক্ষা করা, যাদ্বারা আল্লাহর বাণী (কালিমাতুল্লাহ) পূর্ণত্ব লাভ করে, এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সাধারণত আর্থিক বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এছাড়া সাথে সাথে সামাজিক স্থিতিশীলতাও হয় বিপর্যস্ত। এর পরিণতিস্বরূপ সে সব হারাম এবং নাজায়েয বিষয় উদ্ভূত হলে, উপকরণ প্রতিরোধ নীতির আওতায় যা থেকে নিবৃত্ত করা এবং যার কার্য-কারণের মূলোৎপাটন সাধন ছিল অপরিহার্য কর্তব্য। এ যুক্তি-প্রমাণ অনুসারে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিষয়টি নিছক একটি ব্যক্তিগত বিষয় থাকে না। এটা একটা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেও অবশিষ্ট থাকে না, যার হিসাব নেয়ার দায়িত্ব পরকালে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা যায়, যেদিন কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। বরং এটা একটা আইনগত বিষয়ে পরিণত হয়। তাই সরকারের নিকট এ দাবি করা হয় যে, আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটাকে বন্ধ করা হোক, যাতে আমাদের উপরোল্লিখিত নীতি বহাল থাকতে পারে।

ইসলামী আইন-কানুন একটা পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একক (ইউনিট)। এর নীতি একে অপরের সাথে বিজড়িত। আর সব মিলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাত্মক দর্শনের সাথে যুক্ত। আইন প্রণয়নকালে বিষয়গুলোকে স্বতন্ত্র এবং বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়; বরং সব সময় ব্যাপক সর্বাত্মক দর্শনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা দরকার।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা থেকে বারণ করায় কার্যত স্পষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। এ বারণ যদি হয়ে থাকে কার্পণ্য-কঞ্জুসীর কারণে, তা আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণের আওতায় পড়ে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ –

-আর তোমার হাতকে গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯

আর যদি এ বারণ করা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে না-পছন্দ করার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের বিরোধিতার আওতায় পড়ে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج

-এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না। - সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকাকে ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়ের জন্যে ধ্বংস বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এখানে এসে উপায়-উপকরণ প্রতিরোধের মূলনীতি একেবারে সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ করে। কোন কোন পেশাজীবি দীনদার এ উক্তি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন ঃ

ما اديت زكوته فليس بكنز للتدليل على ان حق المال هـــو الزكـــوة وحدها وان لا حرج فى الكنزبعد ذالك –

-যে সম্পদের যাকাত দেবে, তা আর পুঞ্জীভূত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হবে না। এর প্রমাণ দিয়ে বলা হয় যে, সম্পদের হক হচ্ছে কেবল যাকাত। আর যাকাত আদায় করার পর সম্পদ পুঞ্জীভূত করায় কোন দোষ নেই।

কিন্তু হাদীসের বিপুল সম্ভারে একটি স্পষ্ট হাদীস বর্তমান রয়েছে, যা সম্পদ পুঞ্জীভূত করার সীমা বেঁধে দেয়। যাকাত পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদকে পুঞ্জীভূত করার আওতা থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, এই হাদীসে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

من جمع دينارا او درهما او تبرا او فضة ولا يعده لغريم ولاينفقه فى سبيل الله فهو كنزيكوى به يوم القيمة –

-যে ব্যক্তি একটা দীনার-দিরহাম বা স্বর্ণ্য-রৌপ্যের ইঁট বা রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, কোন ঋণদাতার জন্যে তা সঞ্চয় করে রাখে না, আর আল্লাহর নামে ব্যয় করে না, তা হবে পুঞ্জীভূত সম্পদ, যা দিয়ে কিয়ামতের দিন তাকে দাগ দেয়া হবে। -তাফসীরে কুরতুবী

এ হাদীসটি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে,কত পরিমাণ এবং কোন্ ধরনের মাল সঞ্চয় করা জায়েয, আর কোন্ উদ্দেশ্যে তা সঞ্চয় করা বৈধ। এ ছাড়া যে সম্পদ থাকবে, তা হবে কানয বা পুঞ্জীভূত সম্পদ, যা হারাম হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ইসলামকে বুঝতে হবে তার ব্যাপক-সর্বাত্মক নীতির আলোকে।

নবম মূলনীতি ঃ কোথায় পেয়েছো এত সম্পদ?

ইসলামে ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার সীমাহীন নয়, যেমন কোন কোন অজ্ঞমূর্খ এবং পেশাজীবি দীনদার মনে করে থাকেন। ব্যক্তি-মালিকানার বুনিয়াদ এমন কতিপয় বিশুদ্ধ শরীয়তসম্মত কার্যকারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামের সাধারণ অর্থনৈতিক বিধানের পরিপন্থী নয়। অনুরূপভাবে তা ইসলামের সাধারণ নৈতিক বিধানেরও পরিপন্থী হতে পারে না। সুতরাং লুটপাট, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি-রাহাজানি, প্রতারণা, সুদখোরী এবং গুদামজাতকরণ ইত্যাদি ব্যক্তি-মালিকানার ভিত্তি হতে পারে না। এ কারণে মালিকানার কারণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া, অনুসন্ধান করার অধিকার সব সময় সরকারের রয়েছে। অনুসন্ধানের পরই সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন, এ সব কারণ বৈধ ছিল, কি অবৈধ। বৈধ হয়ে

থাকলে সম্পদের মালিকের জন্যে এ মালিকানা সে সব শর্তের অধীন, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। 'মাসালেহে মুরসালা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ মালিকানা সর্বদা সরকারের এক্তিয়ারাধীন থাকবে। এ ছাড়া এ মালিকানাকে উপকরণ-উপলক্ষ প্রতিরোধের নিমিত্ত নেয়া যেতে পারে আর এজন্যে ব্যয়ও করা যেতে পারে। আরাম-আয়েশ-বিলাসিতার জন্যে সম্পদ ব্যয় করার অধিকার তার মালিকের নেই। কারণে-অকারণে তা উড়িয়ে দেয়ার অধিকারও তার নেই। সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং তা আটকিয়ে রাখা থেকেও তার মালিককে নিবৃত্ত করা হবে। সরকার প্রয়োজনে তা থেকে বায়তুলমালের জন্যে গ্রহণ করতে পারে। সরকার বাড়তি সম্পদ উসুল করে তা অভাবীদের মধ্যে বন্টনও করতে পারে। বাড়তি সম্পদের অর্থ, উপরের হাদীসে বর্ণিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

এ সব বিধান সে সময়ের জন্যে, যখন মালিকানার কার্য-কারণ বিশুদ্ধ এবং শরীয়তকসম্মত হয়ে থাকে। কিন্তু মূলেই যদি তা শরীয়তসম্মত না হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম মৌলিক ভাবে সে মালিকানার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তার হিফাযতের জন্যে ইসলাম সে সব অধিকার স্বীকার করেনা, যা করে থাকে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মালিকানার জন্যে। এ মালিকানাকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জনগণের সম্পদের সাথে মিলিয়ে দেয়ার অধিকারও রয়েছে সরকারের। খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে সংঘটিত পূর্বোক্ত উদাহরণগুলো সরকারকে পুরোপুরি এ অধিকার দিয়েছে। ইসলামের সর্বাত্মক মূলনীতির আলোকে বা বিগত বাস্তব এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে এ অধিকার বিবেচনা করা হোক।

এ হচ্ছে ইসলাম, যা ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার স্বীকার করে, যাতে মানব-মনের গভীরে নিহিত মালিক হওয়ার এবং প্রভাব বিস্তারের গভীর প্রাবৃত্তির মর্যাদা দিতে পারে, যেন মানুষ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বাত্মক সাহস ব্যয় করে তার মধ্যে আল্লাহ যে গোপন শক্তি নিহিত রেখেছেন, জীবনকে তার ফলদান করতে পারে আর জীবন বিকশিত হতে পারে আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী। ব্যক্তি-মালিকানার অধিকারের জন্যে ইসলাম কিছু সীমা-শর্ত আরোপ করে, যেমন জীবিকার অধিকারের ক্ষেত্রে কাউকে কোন কষ্ট দেয়া যাবে না। অবশেষে ইসলাম সমাজের সাধারণ স্বার্থে সরকারের মাধ্যমে ব্যক্তি-মালিকানাধিকারকে সমষ্টির অধিকারে পরিবর্তিত করে। ইসলাম এমনিভাবে ব্যক্তি-মালিকানার সেসব সুফল লাভের সুযোগ দেয়, পুঁজিবাদ যার ঢাক-ঢোল পিটায়। অপর পক্ষে তা ব্যক্তি মালিকানার সে সব দোষ-ত্রুটিও বিদূরীত করে, যা প্রচার করে বেড়ায় সমাজতন্ত্র। এমনিভাবে ইসলাম বাড়াবাড়ি এবং সীমালংঘনের উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়। ইসলাম যে স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে, তাতে কোন শত্রুতা নেই, নেই কোন বিচ্ছিন্নতা।

দশম মূলনীতি ঃ যাকাত

ঔদ্ধত্য পরায়ণ সমাজতন্ত্র ইসলামকে এমনভাবে পেশ করতে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যে, ইসলাম বড় জোর যে অর্থনৈতিক দাবিটি পূরণ করে, তা হচ্ছে যাকাত। তারা বাস্তব সত্যকে উহ্য রেখে মানুষের চোখে ধূলো দেয়ার নিমিত্ত এমনটি করে। যাকাতকে এভাবে পেশ করার ব্যাপারে

সমাজতান্ত্রিক চেষ্টা-সাধনা এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডা ছাড়াও খ্রীষ্টীয় প্রচার যন্ত্র এবং সংস্থা-সংগঠনও পিছিয়ে নেই মোটেই, যাতে ইসলামের বর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মর্যাদা হ্রাস করতে পারে।

আমি এ বিষয়টিকে ইচ্ছে করে ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক মূলনীতির শেষাংশে নিয়ে এসেছি, যাতে মানুষ জানতে পারে যে, পেশাদার ধার্মিকদের সহযোগিতা নিয়ে পুঁজিবাদী সংগঠনগুলো সত্যকে কিভাবে গোপন করে। এমনিভাবে সমাজতন্ত্র এবং খ্রীষ্টবাদও কখনো কখনো তথাকথিত ধার্মিকদের সেবা নিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে।

আমি সব শেষে যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করছি এজন্য নয় যে, এ মহান নীতির মর্যাদা হ্রাস করবো; বরং যুক্তি-প্রমাণ সহকারে সত্যকে উপস্থাপন করার জন্যেই এমনটি করেছি। আমার প্রণীত 'ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে যাকাতের নীতি সম্পর্কে আমি যে আলোচনা করেছি, এখানে তা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। সেখানে আমি বলেছিলাম ঃ

"এসব স্বভাবজাত কার্য-কারণের সাথে চিরন্তন ট্যাক্স-যাকাত-এর কার্য-কারণ সংযোজন করা সমীচীন মনে করি। এটা এমন এক কর্তব্য, যা একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় মূলধনের শতরা ২$^{১}/_{২}$ ভাগ হারে প্রতি বছর আদায় করতে হয়।"

এ কর্তব্য সম্পর্কে এখানে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। স্বার্থান্বেষী মহল এর বিকৃত ব্যাখ্যা করছে। তারা যাকাতের এমন এক চিত্র অঙ্কন করছে, যেন এটা একটা অনুগ্রহ- যা মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে।

কিন্তু অন্যান্য ট্যাক্সের মত এ ট্যাক্সও স্বয়ং সরকারই উসূল করে। অতঃপর সরকারের তত্ত্বধানেই একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তা ব্যয় করতে হয়। এ ব্যবস্থাপনায় সমাজের প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে কিছুটা রদ-বদল এবং হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। সুতরাং এহেন ব্যবস্থাপনায় অপমানের কি আছে? স্বার্থান্বেষী মহল যাকাতের বাস্তব দিক সম্পর্কে একটা স্বকপোলকল্পিত চিত্র অংকন করে। আর তা হচ্ছে এই,একজন বিত্তবান ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্বক সদকা করছেন আর একজন অভাবী ব্যক্তি সদকা গ্রহণ করছেন আর এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। এক হাত ওপরে, তা হচ্ছে দাতার হাত আর এক হাত নীচে, তা হচ্ছে গ্রহীতার হাত। এ দু'হাত একটা অপরটার পরিপন্থী। আর ব্যাপারটাই দু'ব্যক্তির মধ্যে সীমিত।

আমি বুঝতে পারি না, এরা নিজেদের মনগড়া এ বিকৃত চিত্র কোথা থেকে উপস্থাপন করছে। সরকার যখন শিক্ষা-কর আরোপ করেন এবং তা কেবল শিক্ষাখাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন; যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমারত নির্মাণ, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়া, ছাত্রদের জন্য শিক্ষার উপকরণ বই-পুস্তক খাদ্য ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা, তখন কি এমন কথা বলা যায় যে, এতো ভিক্ষাবৃত্তি সৃষ্টি করার ব্যবস্থা। তখন কি এটা বলা যায় যে এ-তো ছাত্র-শিক্ষকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে? কারণ এ অর্থ তো সংগ্রহ করা হয়েছে পুঁজিপতিদের নিকট থেকে? আর তা ব্যয় করা হচ্ছে অভাবীদের জন্যে।

সরকার যদি সেনাবহিনীকে সুসংগঠিত-সুসজ্জিত করার জন্যে ছোটবড় ব্যবসায়ীদের ওপর শতকরা ২১/২ ভাগ কর আরোপ করে এবং অন্যান্য খাত থেকে এ খাতকে পৃথক করে, তখন কি এমন কথা বলা যাবে যে, সেনাবাহিনী ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে ? সেনাবহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে ? কারণ সরকার বিত্তবানদের নিকট থেকে এদের ব্যয়ভার আদায় করে। অথচ এ কর আদায় করার ব্যাপারে ছোট-বড় সবাই অংশীদার ।

এ ধরনের করের মতো যাকাতও একটা কর। সরকার এ কর আদায় করে এবং বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় করে। সরকার এ সব কর উসূল করে এক সাথে এবং ব্যয় করে পৃথকভাবে। এটা কোন ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নয় যে, একটা বিশেষ হাত থেকে অপর একটা বিশেষ হাতে গিয়ে পৌছায়। আজ মানুষ নিজেই যাকাত দিচ্ছে আর নিজেই তা ব্যয় করছে, এটা ইসলাম নির্ধারিত বিধান নয়। সরকার এ কর(যাকাত) উসূল করছে না বিধায় মানুষ এ পন্থা অবলম্বন করছে। এমনটি না হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞান এবং শুভবুদ্ধি অনুযায়ী ব্যয় করার উপযুক্ত খাতে তা ব্যয় করতো।

কিন্তু মিসরে অজ্ঞতা অবহেলা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, কিছু লোক বলছে, যাকাত হচ্ছে এক ধরণের ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, যা মানব মনকে ক্ষুদ্র ও ক্ষুণ্ন করে, তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত করে তোলে।[১]

পাঠক মহল একান্ত অজ্ঞ বলে স্পষ্ট-প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্পর্কে এ সব লাগামহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও 'আল্লাহর ফযলে' মিসরে এ বস্তুদ্বয়ের কোন অভাব নেই; বরং এখানকার সমাজের যে শ্রেণীটিকে সুসভ্য সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত করা হয়, তাদের মধ্যে অজ্ঞতা অনেকাংশে বেশী। এরা ইসলামী জীবন বিধানের সমালোচনাকারীর বক্তব্য অনুগ্রহের সাথে শ্রবণ করে, যাতে নিজেদেরকে একান্ত সুসভ্য প্রতিপন্ন করতে পারে। আমরা কি বর্বরদের যুগে তাদের সমাজে জীবন-যাপন করছি না?

আইনের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা

সমাজে শান্তি স্থাপন করার জন্য ইসলাম সর্বশেষ যে উপায় অবলম্বন করে, এখন আমরা তা নিয়ে আলোচনা করবো। এটাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের প্রকৃতি, এর সাথে মানব-মনের সম্পর্কের প্রকৃতিও এটাই। আর এমনিভাবেই ইসলামী শরীয়ত তার দাবী পুরো করে। ফলস্বরূপ সামাজিক শান্তি স্থাপনে এ উপায়ের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রয়েছে বিরাট প্রভাব। ইতিপূর্বে যেসব নিরাপত্তা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা পূরণ করার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ভূমিকা রয়েছে। মানব গোষ্ঠীর সম্পর্ক সুসংগঠিত করা এবং নানাবিধ অবস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য কোন না-কোন আইন অপরিহার্য। এ আইন এমন হতে হবে, যা সব মানুষকে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্লকে রূপান্তরিত করতে পারে, তাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া অসংগঠিত ব্যক্তির আকারে থাকতে দেবে না।

---

১. শুধু মিসরেই নয়, অল্প-বিস্তর সকল মুসলিম দেশে একই অবস্থা বিরাজ করছে। দেশে দেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এহেন উক্তি একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। - অনুবাদক

আইন তার এ দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে পারে না, যতক্ষণ না এ আইনের প্রতি আনুগত্য করা হয়, তাকে বাস্তবায়িত করা হয়। আর আইনকে কখনো বাস্তবায়নযোগ্য এবং আনুগত্যের উপযোগী মনে করা হয় না, যতক্ষণ মানব মন তাতে পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত না হয়, মানব মন আইন এবং তার মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং গভীর সংযোগ-সম্পর্ক অনুভব না করে এবং এতে নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থ ও ভবিষ্যতের লক্ষ্যের জবাব দেখতে না পায়।

আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অধিকন্তু তিনটি কারণে ঘটে থাকে, অন্য সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ এ তিনটির মধ্যে শামিল।

প্রথম কারণ ঃ এ আইন ন্যায়ভিত্তিক নয়, মানুষের এ অনুভূতি। কারণ এ আইন কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে আর এজন্য অন্যদের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। এ অবস্থায় মনে করে যে, আইন হচ্ছে তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের অনুগত করে রাখার অন্যতম উপায়মাত্র। তারা নিজেদের চেষ্টা-সাধনার ফল পায় না। দায়িত্ব তাদের, আর ফল লুটছে অন্যরা- এ সব বেইনসাফীর হাতিয়ার হচ্ছে আইন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ আইনের প্রাণ-শক্তি এবং যে জনগোষ্ঠীর ওপর তা প্রয়োগ করা হয়, তার মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, এ অনুভূতি। এ আইন মানুষের আবেগ-অনুভূতি এবং তাদের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করে না। জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, তাদের প্রাণ শক্তি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং স্থান-কাল-পাত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যের কারণে তাদের জীবন দাবির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

তৃতীয় কারণ ঃ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা। কারণ, এ আইন প্রণেতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পার্লামেন্ট- যাই হোক না- কেন। আইনে কিছু বাধ্য-বাধকতা থাকে। আর এসব বাধ্য-বাধকতার ওপর প্রবল হওয়ার চেষ্টা করা, যখন কোন মানুষ অপর মানুষের জন্য এ আইন প্রণয়ন করে- ব্যক্তির ধারণায় তার ব্যক্তি সত্তার প্রমাণ উপস্থাপন করে- এ বিদ্রোহ-অবাধ্যতা প্রকাশ্য হোক বা গোপনে।

মানুষের গড়া কোন আইনই এ সব ত্রুটি বা এর কোন একটি থেকে ত্রুটিমুক্ত নয়, বিশেষ করে প্রথম এবং তৃতীয় ত্রুটি তো সকল মানব রচিত আইনে বিদ্যমান। জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্টের প্রণীত আইন এসব ত্রুটিমুক্ত নয়, আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক-শাসক শ্রেণীর প্রণীত আইনও এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে নয়।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জনগণ কর্তৃক স্বাধীন পার্লামেন্ট নির্বাচনের কাহিনী নিছক কল্প-কাহিনী বৈ কিছুই নয়। জনগণও অন্তরে অন্তরে এসব কল্পকাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। এর কারণ হচ্ছে, ভোটাররা নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে স্বাধীন নয়। ভোটাররা ভোট দিয়ে যে পুঁজিপতিকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত করে, তাদের হাতেই নিহিত থাকে ভোটারদের রুটি-রুযী এবং জীবনের নিরাপত্তা। তর্কের

খাতিরে যদি মেনে নেয়া যায় যে, পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটাররা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তাহলেও পার্লামেন্ট তার অস্তিত্বের বিচারে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ। এতে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নামে মাত্র। কেউ যদি এর বিরুদ্ধে দাবি করে, তা কেবল দাবিই থাকবে; বাস্তব নয়। নির্বাচিত যে শ্রেণীটি আইন প্রণয়ন করবে, তাদের সম্পর্কে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এতে পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হবে। এ বিশেষ প্রবণতা এবং খাহেশ থেকে এ শ্রেণীর মুক্ত হওয়া কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়।

শ্রমিক শ্রেণীর শাসন সম্পর্কে এটা গোড়াতেই স্বীকৃত যে, বুর্জোয়া শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করাই এ আইন প্রণয়নের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে শ্রমিক সৈন্যের সংখ্যা যতই অধিক হোক না কেন, সেখানে অপর একটি শ্রেণীও অবশ্যই বর্তমান থাকে। এদের জন্য নয়; বরং নিশ্চিতভাবে এদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়। এমনটি করা হয় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে।

এসবই ঘটে সে সব দেশে, যেখানে আইন প্রণয়ন করা হয় আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে। মিসর বা অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বাইরে থেকে তা আমদানী করা হয় না। যেখানে বাইরে থেকে আইন আমাদনী করা হয়, সেখানকার আইনে প্রথম এবং তৃতীয় ক্রটি ছাড়া দ্বিতীয় ক্রটিও শামিল থাকে। যেহেতু আইন থাকে জনগণের নিকট অপরিচিত, তাই আইনের স্পিরিট এবং জনগণের স্পিরিটের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। জনগণের স্পিরিট, তাদের আচার-আচরণ এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আইন প্রণীত হয়। ফল দাঁড়ায় এই যে, এই ধারকরা আইনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে হাস্যকর ঘটনা ঘটে। এ আইন প্রণেতাদের মধ্যে যদি সামান্যতম দূরদৃষ্টি থাকতো, থাকতো চিন্তা-গবেষণার সামান্যতম উপাদান, তাহলে তারা এতটা নিশ্চিন্তে বাইরে থেকে আইন আমদানী করতো না।[১]

প্রাচীন এবং আধুনিককালে কোন মানব-রচিত আইনই উপরে বর্ণিত দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত নয়। একমাত্র ইসলামী আইনই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আইনের ইতিহাসে এর নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী আইন সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এমন ধারণা করতে পারে না যে, এ আইন তার প্রতি সুবিচার করছে না। কারণ সুবিচার থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ এখানে আদৌ বর্তমান নেই, নেই তার অস্তিত্ব। এখানে সকলের জন্য যিনি আইন প্রণয়ন করেন, তিনি সকলের ইলাহ, সকলের মা'বুদ তিনি। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্বে তাঁর কোন স্বার্থ নিহিত নেই। এমনিভাবে ইসলামী সমাজ থেকে শ্রেণীগত চিন্তা-চেতনা নির্মূল হয়ে যায়। কারণ এখানে এমন কোন আইন নেই, যা কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। আর এজন্য অপর শ্রেণীর স্বার্থকে দেয় বিসর্জন। এখানে সকল শ্রেণীর অধিকার-কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। এসব অধিকার-কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ সামঞ্জস্য। এমনিভাবে ইসলামী সমাজ এমন সব ব্যক্তির সমষ্টিতে পরিণত হয়, আইনের দৃষ্টিতে যাদের অধিকার ও কর্তব্য এক সমান। এ সমাজ এমন শ্রেণীর সমষ্টি নয়, যাদের স্বার্থ একে অপরের সাথে সংঘাতপূর্ণ, আর আইন সেখানে

১.উস্তাদ তাওফীক আল-হাকীম রচিত 'নায়েবুন ফিল আরইয়াফ' এবং আব্দুল কাদের আওদা শহীদ রচিত 'আল ইসলাম ওয়া আওযাউনাল কানুনিয়্যাহ' দ্রষ্টব্য।

এদিক ওদিক বা এর পক্ষে ওর বিপক্ষে ফয়সালা করে। এমনিভাবে ইসলামে শ্রেণী-প্রথার কোন ছায়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে না, থাকে না এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব। এটা হয় তখন, যখন জীবনের আইনগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হয়। ইসলামী আইন আছে, অথচ আইনে ইনসাফ-সুবিচার নেই, এমন ধারণাও করা যেতে পারে না। এ অনুভূতির পরিণতিতে সৃষ্ট আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও দেখা দিতে পারে না। হ্যাঁ, কিছু ব্যক্তিগত বিরোধ-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। তবে এর তেমন গুরুত্ব নেই।

এমনিভাবে আইনের স্পিরিট এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্পিরিটের মধ্যেও এখানে কোন বৈসাদৃশ্য দেখা দেয় না। কারণ ইসলামী আইন তার পরিপূর্ণ ভারসাম্যের ভিত্তিতে- বিগত অধ্যায়গুলোতে আমরা যার অনেক উদাহরণ উপস্থাপন করেছি- মানুষের চিন্তা ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে। ইসলামী শরীয়ত সকল আচার -অনুষ্ঠানে, সকল আইন-বিধানে দেহ-আত্মা এবং চিন্তা-চেতনার প্রয়োজনের যথার্থ জবাব দেয়। ব্যক্তি যখন একা একা শ্রম করে বা গোষ্ঠী যখন দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে, উভয় অবস্থায়ই ইসলামী আইন তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। তাই তাদের সুস্থ-সুন্দর প্রকৃতির কামনায় কোন সংঘাত পরিদৃষ্ট হয় না। তাদের সুস্থ-সঠিক প্রাকৃতিক শক্তি-সামর্থ্যকেও দাবিয়ে রাখা হয় না। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী হিসেবে যেসব ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ও কর্ম মানুষের ক্ষতি সাধন করে থাকে, এ আইন সাথে সাথে তার সীমাও নির্ধারণ করে দেয়। দল-গোষ্ঠী যখন সরকারের রূপ গ্রহণ করে, তখন ইসলামী আইন গণমুখী চিন্তা-চেতনা এবং উৎপাদনমুখী শক্তি এমন সব এক্তিয়ার দেয়, যা সকলের জন্য সমভাবে কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। আর সকলের কল্যাণের খাতিরে সে সকল চিন্তা ও কর্ম প্রতিহত করার শক্তি দেয়, সুস্থ-সুন্দর প্রকৃতি যাকে অশ্লীলতা বলে অভিহিত করে। ইসলামী শরীয়তের বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী প্রকৃতির প্রমাণের জন্য বিগত অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত উদাহরণসমূহই যথেষ্ট।

শেষে আমাদেরকে একথাও বলতে হয় যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করা বা কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা গোটা সমাজের ওপর কর্তৃত্ব লাভের মানসে এ আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই। পেতে পারে না তারা এ সুযোগ। হ্যাঁ, কারো যদি এ হাস্যস্পদ অনুভূতি মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

ব্যক্তি এবং গোটা মানবতার শক্তির চেয়েও উচ্চতর একটা শক্তি রয়েছে। যে শক্তি আমার জন্য আইন প্রণয়ন করে- ব্যক্তির এ অনুভূতি তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে, তাকে দাবিয়ে রাখে না বা তা হ্রাসও করে না। এ এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা ইসলামী আইন ভিন্ন অপর কোথাও বর্তমান নেই। এ বৈশিষ্ট্য আইনের সামনে সকল মানুষকে সত্যিকার অর্থে বাস্তব সত্যে সমান করে, প্রতারণাপূর্ণ শব্দে নয়।

কেবল ইসলামই শাসনকর্তার আনুগত্যকে শরীয়ত-ভিত্তিক বলে অনুমোদন দেয়, শাসনকর্তা নয়; বরং সকল মানুষের মা'বুদ যে আইন প্রণয়ন করেছেন। এমনিভাবে এটা কেবল ইসলামী শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য যে, তার শাসনকর্তার আনুগত্যকে শর্তসাপেক্ষ করেছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এ আনুগত্য করতে হবে, যতক্ষণ শাসক নিজে সে আইন মেনে চলে এবং অন্যদের উপরও তা জারী করে। শাসক এমন

কোন আইন জারী করবে না, যা শাসক নিজে বা অপর কেউ উদ্ভাবন করেছে এবং যা মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ আইনের পরিপন্থী। অতঃপর শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কোন ব্যাপারে যদি বিরোধ দেখা দেয়, তখন তা নিরসনের পন্থা এ নয় যে, শাসনকর্তার মরযী এবং তার হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; বরং তার পন্থা হচ্ছে এই যে, শাসক এবং শাসিত উভয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ –

-ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের এবং তোমদের মধ্যকার ক্ষমতাসীনদেরও। কোন ব্যাপারে তোমাদের বিরোধ বাধলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নাও। -সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯

ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য বড় জোর যেটুকু কামনা করতে পারে, তা কেবল এটুকুই। অবশ্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতি হতে হবে সুস্থ-সুন্দর, তাতে বিকৃতি-বিচ্যুতি এবং বিচ্ছিন্নতা প্রীতি শিকড় গেড়ে না বসে যেন। মানবমন্ডলীতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই সুস্থ-সুন্দর প্রকৃতির অধিকারী। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্যই ইসলাম আইন প্রণয়ন করে আর এর বৃত্তেই স্থাপন করে শান্তি-সুস্থিতি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব-শান্তি

বিশ্ব চরাচর, জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে ইসলামের সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক দিকগুলো এ গ্রন্থের সূচনায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, তার আলোকে এবং ইসলামে শান্তির প্রকৃতির ছায়ায় আমরা এখন মানব সমাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি-সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা ও কর্মধারা নিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি। মনের শান্তি থেকে ঘরের শান্তি অতঃপর সমাজের শান্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশ্ব-শান্তি পর্যায়ে পৌঁছার জন্য আমরা পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে পথ পরিক্রম করেছি।

জীবন সম্পর্কে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয় যে, জীবন এক অবিভাজ্য একক। কাল পরিক্রমণের সাথে বাঁধা আমাদের জীবন। প্রতি ধাপে, প্রতি পর্যায়ে তা এগিয়ে চলছে। বংশ পরম্পরা ও জাতি-গোষ্ঠী পরস্পর শৃংখলার রজ্জুতে বাঁধা। এতে রয়েছে পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। জীবনে একের পর এক দেখা দেয় নানা পর্যায়, নানা আবর্তন। প্রকৃতির বিচারেও ইসলাম জীবনকে অভিন্ন-অবিভাজ্য মনে করে। জীবনের আশা-আকাংখা, কামনা-বাসনা পরস্পর সম্পৃক্ত। দেহ ও আত্মা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এর সুষ্ঠু লালন ও বিকাশ সাধন করলে তা উন্নতি-অগ্রগতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়, আর লালন-পালন, নেতৃত্ব ও পরিপুষ্টি সাধন খারাপ হলে তা ধ্বসে পড়তে পারে। এ বাস্তব তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে কুরআন এভাবে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ٥ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ٥ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ٥

-প্রাণের শপথ, আর শপথ সে সত্তার, যিনি তাকে সুসংহত করেছেন। অতঃপর তাকে দিয়েছেন ভালো-মন্দের অনুভূতি। যে তাকে পরিচ্ছিন্ন রেখেছে, সে নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে মলিন করেছে। -সূরা আশ্-শামস ঃ ৭-১০

উল্লেখিত শান্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি- যা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত- আমাদেরকে বলে যে, ইসলাম গোটা মানবতাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করে। দীনকেই একমাত্র জীবন বিধান বলে স্বীকার করে এবং সকল ঈমানদারকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায় বলে মনে করে। ইসলাম তার পূর্বে অতিক্রান্ত যুগকে স্বীকার করে এবং তার হিফাযত-সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। কারণ ইসলাম নিজেই তো তার সর্বশেষ পর্যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ –

-এবং আমরা যথার্থভাবে তোমার প্রতি আল-কিতাব নাযিল করেছি। এ অবস্থায় যে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে স্বীকার করে এবং তা সংরক্ষণ করে। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪৮

বিশ্ব-মানবতার পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কারণ এ জন্যই তাদের উদ্ভব হয়েছে আর তাদের কিতাবকে করা হয়েছে মানবতার অন্য সব কিতাবের হিফাযতকারী। বিশ্বে শান্তি-সুস্থিতি স্থাপন করতে তারা দায়িত্বশীল। মনের শান্তি,ঘরের শান্তি এবং সমাজের শান্তি পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ শান্তির ভিত্তি এবং মূলনীতি অর্থাৎ সাম্য, সুবিচার এবং স্বাধীনতা সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। বিদ্রোহ অরাজকতার অবসান এবং যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করার উপায় সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি। সামাজিক ভারসাম্য এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেছি। অনৈক্য ও মতদ্বৈততা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘাত সম্পর্কেও আলোচনার অবতারণা করেছি। যেসব কার্য-কারণ শ্রেণী সংঘাত সৃষ্টি করে এবং যার ফলে ভেদ-বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, তা দূর করার পথ-পন্থা সম্পর্কেও দিক-নির্দেশ করেছি। বক্ষ্যমান গ্রন্থের বিগত অধ্যায়গুলোতে এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহকে মধ্যপন্থী উম্মাহ করা হয়েছে অর্থাৎ জীবনের সকল পর্যায়ে তারা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীন-ইসলামের সীমা-সরহদ ও মূলনীতি-শান্তি পর্যায়ে আলোচনায় আমরা এর কোন কোন দিকের উল্লেখ করেছি; মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য সুবিচারমূলক পথ উপস্থাপন করে উম্মতের কর্তব্য হচ্ছে এ দায়িত্ব পালন করা, তা থেকে গা বাঁচিয়ে না চলা : কারণ জীবনের যিনি স্রষ্টা ও মালিক, তাঁর পক্ষ থেকে এটাই হচ্ছে তাঁর নির্ধারিত নীতি :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ

-এমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে উম্মাতে ওয়াসাত তথা মধ্যপন্থী উম্মাহ করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য হতে পারো, আর রাসূল সাক্ষ্য হতে পারেন তোমাদের জন্য। -সূরা আল-বাকারা : ১৪৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

-তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। বিশ্ব-মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে। -সূরা আলে -ইমরান : ১১০

আল্লাহ পথে জিহাদ

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও ইসলাম কোন ব্যাপারে সংকীর্ণতা এবং জোর-জবরদস্তী অনুমোদন করেনি। মানুষকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ এই যে, যমীনের বুকে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। কামিল দীন তথা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়ার যোগ্যতা ও মর্যাদা অন্য কোন ধর্মের নেই :

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ج

-দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তী নেই, গুমরাহী-পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। -সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৬

ইসলাম মুসলমানদেরকে প্রথমত ঈমানদারদের সাহায্য-সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে দীনের ব্যাপারে কেউ তাদেরকে বিপর্যয়ে ফেলতে না পারে আর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, এমন শক্তিকে শক্তি দিয়ে রুখতে পারে। কারণ তখন ভালোভাবে দাওয়াত পেশ করা কোন কাজে আসে না। ভালো ব্যবহারের স্থানও তা নয়। দ্বিতীয়ত, ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে যমীনের বুকে মহান সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার, এ মহান সুবিচারের দ্বারা জীবনের সকল পর্যায়ে মানবতার কল্যাণ সাধনের। এ সুবিচার সমাজের সদস্য সংক্রান্ত ব্যাপারে হোক, কি জাতির বিভিন্ন দল সংক্রান্ত ব্যাপারে হোক বা বিশ্বের বুকে বসবাসকারী সকল জাতি-গোষ্ঠী সংক্রান্ত ব্যাপারে, যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় বিশ্ব-মানবতা। এ নির্দেশ মুসলমানদের নিকট দাবি করে যে, বিশ্বের যেখানেই যুলুম-সিতম, বিদ্রোহ-অবাধ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তার মুকাবিলা করতে হবে, তা ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির যুলুম হোক, কি দলের ওপর দলের যুলুম বা জনগণের ওপর সরকারের যুলুম। মোটকথা, যুলুম-অবিচার দুনিয়ার যেখানেই হোক না কোন, মুসলিম উম্মাহ তা মুকাবিলা করতে এবং তার কার্য-কারণ দূর করতে আদিষ্ট। ভূ-খন্ডের অধিকারী হতে, বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধি করতে বা মানুষকে তাদের অনুগত করার মানসে তারা যুলুমের বিরুদ্ধাচরণ করবে না; বরং তা করবে সকল স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যমীনের বুকে কালিমাতুল্লাহ-আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠা করার মহান ব্রত নিয়ে। ইসলামে এটাকেই বলা হয় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'- মানে আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম-সাধনা। জোরপূর্বক মানুষকে ধরে ধরে মুসলমান করার জন্য নয়; বরং যুলুম-অবমাননার হাত হতে তাদেরকে মুক্ত করার সুযোগ দেয়ার জন্য, যাতে করে কোন উদ্ধত শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা আযাদী ভোগ করতে পারে, আর তাদের জন্য যে নিঃশর্ত সুবিচার আল্লাহর কাম্য, তা উপভোগ করতে তারা সক্ষম হয় ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ–

-ঈমানদররা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর কাফিররা যুদ্ধ করে তাগূতের রাস্তায়। -সূরা আন-নিসা ঃ ৭৬

ইসলামের সত্যিকার বুনিয়াদী নীতিতে নিহিত রয়েছে এক সত্যিকার এবং পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহ। আজ পর্যন্ত জ্ঞাত মানব ইতিহাসে এটা সর্ববৃহৎ বিপ্লব বলে স্বীকৃত। সে বিপ্লব-বিদ্রোহ কি? যুলুমের সকল রং-রূপ এবং আকার-আকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; সকল স্তরে, সকল পর্যায়ে এবং সকল ক্ষেত্রে বিদ্রোহ। যেসব সরকার-সংগঠন এবং অবয়ম-কাঠামো যুলুমের আশ্রয় নেয়, কোন ব্যক্তির খাতিরে তা টিকিয়ে রাখতে চায়, শাসক বা শোষকের আকারে যা কোন দলের রক্ত শোষণ করে, শ্রেণী-বিশেষের খাতিরে তাকে

বাঁচিয়ে রাখতে চায়, যারা জমিদার-জোতদার বা পুঁজিবাদীর বেশে অপরকে শোষণ করতে চায় বা কোন সরকারের স্বার্থে তাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, আক্রমণকারী এবং সাম্রাজ্যবাদীর আকারে যারা অন্য কোন রাষ্ট্র-সরকারের বিরুদ্ধে চড়াও হয়, ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সরকার ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা করবে, এখন এটা একেবারেই অপরিহার্য। এমনিভাবে এটাও অপরিহার্য যে, ইসলাম এ প্রতিবন্ধকতার পরওয়া না করেই তার পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব অব্যাহত রাখবে। অনুরূপভাবে এ বিপ্লবের সাহায্যের জন্য এবং আল্লাহর বাণীকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয করাও অপরিহার্য ছিল। একক এবং দলগতভাবে ব্যক্তি, সরকার এবং রকমারী বন্ধন ও যুলুমবাজ সভ্যতার নিগড় থেকে মানবতার মুক্তি সাধনও ছিল অপরিহার্য। কেবল আন্তর্জাতিক পর্যায়েই নয়; বরং সেসব রাষ্ট্র-সরকারের সীমা-সরহদের অভ্যন্তরেও। সুতরাং কোন রাষ্ট্র-সরকারের অভ্যন্তরে যুলুম-নির্যাতন চলতে দেখে ইসলাম কেবল এ জন্য খামুশ থাকতে পারে না যে, সে রাষ্ট্রের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের জন্য এটা সমীচীনও নয়। ইসলাম যুলুমের এত বড় মূল্য দিতে পারে না। আন্তর্জাতিকতার ছাপ ইসলামকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই কোন রাষ্ট্র-সরকারের কাছ থেকে নিছক ভুয়া শান্তি ক্রয়ের নিমিত্ত ইসলাম তাকে রাষ্ট্রের জনগণের ওপর যুলুম-সিতম চালাবার অনুমতি দিতে পাওে না। এমনটি ভাবতেও পারে না। জনগণকে তাদের আইনগত এবং সামাজিক সুবিচার থেকে বঞ্চিত করার অনুমতি দিতে পারে না ইসলাম। কারণ যালিম রাষ্ট্র-সরকারের অধিবাসীরা যে কোন জাতি এবং যে কোন ধর্মমতের অনুসারী হোক না-কেন, তারা তো মানুষ। মানুষের ওপর থেকে যুলুম-নির্যাতন দূরীভূত করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম মিল্লাত আদিষ্ট। এ কারণে জিহাদ হচ্ছে এক বিশ্ব বিপ্লব সৃষ্টির দর্শন। শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সুবিধা লাভের কোন পথ নয়। এ বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বপ্রকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, মানে মনের শান্তি, পরিবারের শান্তি, সমাজের শান্তি, আর সর্বশেষে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক শান্তি। মানুষ মানুষ বলেই বিশ্ব-মানবতার সত্যিকার এবং পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে আর মানুষ হিসেবে এটা তার অধিকার। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج

-ঈমানদারগণ! সুবিচার স্থাপনকারী আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও; যদিও এ সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে; পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের নিরুদ্ধে হয় না কেন। -সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز

-কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা সুবিচার করো, তা আল্লাহ ভীতির নিকটতর। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮

এসব রেখা ইসলামে বিশ্ব-শান্তির প্রকৃতির চিত্র অংকন করে। এ শান্তি কোন সীমিত অর্থে নয় যে, যে কোন মূল্যে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে, এ বিরত থাকার ভিত্তি যা-ই হোক না কোন। সেখানে এক মূল্যহীন, গুরুত্বহীন শান্তিও রয়েছে, যা দাঁড়ায় মানবতার বিরুদ্ধে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য যেসব উন্নত নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এ শান্তি তার পরিপন্থী। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে এ শান্তি থেকে দূরে থাকার তাকীদ করেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ –

-অতঃপর তোমরা হতোদ্যম হবে না আর শান্তি-সমৃদ্ধির দিকে ডাক দেবে। অথচ তোমরাই তো সবার ওপরে; আর আল্লহ রয়েছেন তোমাদের সাথে। -সূরা মুহাম্মদ : ৩৫

মু'মিন সবার ওপরে এ জন্য যে, সে জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষ যখন সেসব মূল্যবোধের ওপর ঈমান আনে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে তাদের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ এসব উন্নত মূল্যবোধ আল্লাহর বাণী (কালিমাতুল্লাহ)-র অন্তর্ভুক্ত :

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

-তোমরা আল্লাহর সাহায্য করলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। -সূরা মুহাম্মদ : ৭

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ٥ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٥ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ٥

-আর যে কেউ আল্লাহকে সাহায্য করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। সেসব ব্যক্তি, আমরা তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সকল কাজের পরিণতি আল্লাহর হাতে নিহিত। -সূরা আল-হজ্জ : ৪০-৪১

যমীনের বুকে আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত ইসলাম এক চিরন্তন নিরবচ্ছিন্ন জিহাদে নিয়োজিত। ব্যক্তি-সমাজ এবং রাষ্ট্রে এক সুস্থ-সুন্দর জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ জিহাদ। ইসলামের উন্নত নীতিমালার উপর এ জিহাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিশ্বের বুকে কোন যালিম শক্তির সাথে সন্ধি করবে না, সে যালিম শক্তি ব্যক্তি এবং সমাজের ওপর অত্যাচারী কোন ব্যক্তির আকৃতিতে হোক বা অন্য শ্রেণীর উপর শোষণকারী কোন শ্রেণী-বিশেষের আকারে অথবা দেশ-জাতিকে শোষণকারী কোন রাষ্ট্রের আকারে দেখা দেয় না কেন। ইসলামের নিকট এসব একই

আকার-আকৃতির। সবই ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদ করা মুসলমানের কর্তব্য। তার উচিত কখনো এর সাথে সন্ধি না করা। হ্যাঁ, তার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের সময়টুকুর ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। স্বভাবতই তার কর্তব্য হচ্ছে এসব পরিস্থিতির সাথে সহযোগিতা না করা, কোন অবস্থায়ই তার সারিতে না দাঁড়ানো। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

-এবং গুনাহ ও বাড়াবাড়ির কাজে কারো সাথে সহযোগিতা করবে না। -সূরা আল-মায়েদা ঃ ২.

ইসলামের শক্তি হচ্ছে এক স্বাধীন শক্তি। যুলুম গোলামী এবং শোষণের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়ার জন্যই ইসলাম যমীনের বুকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। ইসলাম এ ব্যাপারে কোন বংশ-বর্ণ-গোত্র-ভাষা এবং ধর্মের প্রতি তাকায় না। তার কাছে সকল মানুষ এক সমান। কারণ তারা মানুষ। সীমিত এবং সংকীর্ণ অর্থে ইউরোপ জাতীয়তাবাদী দর্শনের যে অর্থ করে থাকে, সংক্রামক ব্যধির মত সংকীর্ণ,দুর্বল এবং গুরুত্বহীন সীমায়, যা এখন আমাদের দিকেও সংক্রমিত হচ্ছে, ইসলাম সে অর্থে একে গ্রহণ করে না। কারণ জাতীয়তাবাদের এ অর্থ ইসলামের মানবীয় ঐক্যের সার্বিক দর্শনের পরিপন্থী।

বিশ্বের যেখানেই যুলুম-নির্যাতন চলুক না-কেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাকে প্রতিহত করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়। এ যুলুম মুসলমানের ওপর চলুক বা যিম্মীদের ওপর, যিম্মীদের হিফাযত-নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা অন্য কারো ওপর-যাদের সাথে মুসলমানরা কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয়। ইসলাম যেখানেই কোন যালিম ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র-সরকারের মুকাবিলা করে, তা করে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, একদল মানুষ অপর দলের প্রতি যুলুম-অবিচার করেছে, তারা লাল, সাদা বা কলো-এ জন্য করে না, এজন্যও নয় যে, তারা য়াহূদী, খৃষ্টান বা অংশীবাদী। তারা যমীনের বুকে আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করবে যতটা; মানব জাতির জন্য সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে যতটা বাধার সৃষ্টি করবে, তাদের মুকাবিলা করা হবে ঠিক ততটা। এ প্রতিবন্ধকতায় যার যতটা অংশ থাকবে, তার প্রতিরোধও হবে ততটা তীব্র। যে যতটা ঔদ্ধত্য পরায়ণ, বিভ্রান্ত এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হবে, তার মুকাবিলাও করা হবে ততটা কঠোরভাবে। এই উদ্ধত শক্তি সন্ধি-শান্তির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে সোজা পথ অবলম্বন করলে তাদের কোন কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয়া হবে, নিজেদের জন্য তারা যে কোন মত ও পথ অবলম্বন করতে পারে। অবশ্য শর্ত হচ্ছে এই যে, সে মত ও পথে আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকতে হবে।

কাফির, মুশরিক এবং আহলি কিতাবদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মতভেদ রয়েছে, তার লক্ষ্য হচ্ছে এ দৃষ্টিকোণ। কাফির এবং মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণের ভিত্তিকেই অস্বীকার করে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সৃষ্টির সকল নিয়ম-নীতি এবং শিষ্টাচারের সকল তাৎপর্য অস্বীকার করে। কারণ এসবের মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহর সুবিচারের নীতিমালা। এ কারণে তারা আপন অস্তিত্বের বিচারেই আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা মাত্র, যা ইসলাম প্রমাণ করে।

এতসব সত্ত্বেও যতক্ষণ তারা ইসলামী দাওয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, ইসলামী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তোলে এবং মুসলমানদেরকে উত্যক্ত-পীড়িত না করে, ইসলাম ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না; বরং ইসলাম তো তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কল্যাণ এবং ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধী নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَايَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

-যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং নিজেদের গৃহ থেকে তোমাদেরকে বহিস্কারও করেনি, তাদের সাথে সদাচার এবং ইনসাফের আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তোমাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে (অন্যদের) সাহায্য-সহযোগিতা করেছে; আল্লাহ তো কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই তো যালিম। -সূরা মুমতাহানা ঃ ৮-৯

অবশিষ্ট রয়েছে আহলি কিতাব। তারা হয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকারে রয়েছে অথবা বিভিন্ন দলের আকারে মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করছে। প্রথম অবস্থায় তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি-চুক্তি রয়েছে অথবা নেই। তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তির সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকলে তাদের সন্ধি-চুক্তি বহাল রাখা হবে। মুসলমানরা তদের সাথে কৃত চুক্তির খেলাফ করবে না, তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গও করবে না। পরবর্তী প্যারায় এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। আর তাদের মধ্যে কোন সন্ধি-চুক্তি না থাকলে সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আয়াত কার্যকর হবে। তারা মুসলমানদের উত্যক্ত-অতিষ্ট না করলে, ইসলামী মিশনের পথ প্রতিরোধ না করলে তাদের জন্য থাকবে কল্যাণ ও সুবিচার। তারা এ পথ থেকে নিবৃত্ত না হলে নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার যে কোন একটা গ্রহণ করতে মুসলমানরা বাধ্য হবে, তাদেরকে স্বাধীনতা দেবে ইসলাম, জিযিয়া বা যুদ্ধ, এর যে কোন একটি গ্রহণ করবে।

ক. ইসলাম ঃ আল্লাহর দেয়া চিরন্তন জীবন বিধানের এটাই হচ্ছে সর্বশেষ রূপ। ইসলাম হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্য হিদায়াত তথা পথ-নির্দেশ। সকল মানুষের জন্য ব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের কাজ।

খ. জিযিয়া ঃ এ জন্য যে, তা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার দলীল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং যে বস্তুবাদী শক্তি মানুষকে ইসলাম প্রচার থেকে নিবৃত্ত করে, তাকে প্রতিহত করার দলীল।

গ. **যুদ্ধ** ঃ কারণ, আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ এবং তার বিরুদ্ধে চিরন্তন একগুঁয়েমীর নীতি অবলম্বন করার এ একটি মাত্র পথই খোলা থাকে। আল্লাহর চিরন্তন বাণীতে যে আলো এবং সুবিচার নিহিত রয়েছে, এ শক্তি যেহেতু মানবতাকে সে আলো থেকে বিরত রাখে এবং গোটা মানব জাতিকে পরিপূর্ণ শান্তি থেকে নিবৃত্ত করে, তদ্বারা উপকৃত হতে বাধা দেয়, তাই কেবল তৃতীয় উপায় মানে যুদ্ধের মাধ্যেমে সে শক্তিকে প্রহিহত করা যেতে পারে।

আহলি কিতাবের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে বসবাস করে, তাদের ব্যাপারটি সাধারণ আহলি কিতাবের চেয়ে ভিন্ন। এরা যিম্মী, কারণ ইসলাম তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। দায়িত্ব নিয়েছে তাদের জান-মাল হিফাযতের। তাদের অধিকার ও কর্তব্য ঠিক আমাদের অনুরূপ। এ ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট বিধান রয়েছে। তাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়, তা মুসলমানদের নিকট থেকে গৃহীত যাকাত-এর বিকল্প। জিযিয়া হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহে জান-মালের হিফাযতের বিনিময়। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা মুসলিম প্রজাদের মত। উপরন্তু এর বিনিময়ে তারা সরকারের নিকট থেকে লাভ করে অবাধ ও নিরপেক্ষ সুবিচার। ইসলামী রাষ্ট্র তাদের গ্যারন্টি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদেরকে যাকাত দানে বাধ্য করা ইসলামের অভিপ্রেত নয়। কারণ তা হচ্ছে নিছক একটা ধর্মীয় ইবাদত। ইসলাম মানুষকে চিন্তা-বিশ্বাসের এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে নিশ্চয়তা দেয়, যিম্মীদেরকে একান্ত ইসলামী ইবাদতে বাধ্য করা তার পরিপন্থী বিধায় ইসলাম তা থেকে বিরত থাকে। এ কারণে ইসলাম তাদের নিকট থেকে জিযিয়ার নামে ট্যাক্স গ্রহণ করে, যাকাতের নামে নয়। যাতে - لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - 'দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই' -এ সাধারণ নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

কেউ যদি বাধ্য-বাধকতা ছাড়া স্বেচ্ছায়-সানন্দে মুসলমানদের মত যাকাত-কর আদায় করাও পছন্দ করে,তা সে করতে পারে। সে অধিকার এবং ইখতিয়ার তার রয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই, হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফকালে বনু তাগলিব গোত্র স্বেচ্ছায় জিযিয়ার স্থলে যাকাত দেয়া পছন্দ করে। আর এরই ভিত্তিতে তারা যাকাত আদায় করে।[১]

মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে বসবাসকারী খৃষ্টান এবং অ-খৃষ্টান সংখ্যালঘুদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশে শত্রুর পক্ষ থেকে সন্দেহ-সংশয় এবং ভয়-ভীতি ছড়ানের চেয়ে ঘৃণ্য এবং বিস্ময়কর আর কোন কাজ নেই। এ হচ্ছে এক স্বার্থান্ধ, নিকৃষ্ট এবং ভুল দাবি, কখনো কখনো সংখ্যালঘুদের কোন কোন বোকা এবং মতলববাজ দলের পক্ষ থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়। নিছক হিংসা-বিদ্বেষ এবং কুমতলবই এর কারণ। তাদের মনে অকারণে এসব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেহেতু তা ইসলাম, এজন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং এর পেছনে অন্য কোন কারণ নেই। কখনো কখনো এসব দাবি নামেমাত্র মুসলমানদের পক্ষ থেকেও করা হয়। মাকড়সার জালের মত দুর্বল এ ব্যক্তিরা এই ঘৃণ্য দাবির গোপন দিকের আশ্রয় নেয়। কারণ এরাই হচ্ছে তাদের মামুলি বস্তুগত, স্বার্থ,

---

১. স্যার টি.ভি.আরনল্ড ঃ প্রিচিং অব ইসলাম, আরবী সংস্করণ, অনুবাদ হাসান ইবরাহীম ক্যাসান ও তদীয় বন্ধুদ্বয়, পষ্ঠা ৪৯।

খ্যাতি বা তাদের দুর্বল ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি-প্রচারণার মালিক। এটাও এর অন্যতম কারণ যে, এরা এমনিভাবে কোন ক্রুশেডার পাদ্রী এবং প্রাচ্যবিদদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। এরা খৃষ্টবাদের জন্য এমন সব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, যা কোন মুসলমান বা কোন ভদ্রলোক কোন অবস্থায়ই আঞ্জাম দিতে পারে না। যেহেতু এদের সংখ্যা বিরল, তাই চরমপন্থী খ্রীষ্টানদের মধ্যেই এরা নিজেদের গ্রাহক খুঁজে পায়। এ কারণে নয় যে, সত্যিই তাদের কিছু মূল্য আছে; বরং এ জন্য যে, সৌভাগ্যবশত এদের সংখ্যা বিরল। পতন আর পরাধীনতার যুগেও মানুষের প্রকৃতি এত নীচে নামতে পারে না। আমাদের সমাজেও এদের সংখ্যা খুবই বিরল- এ থেকেই এ কথার সত্যতা আঁচ করা যায়।

মানবীয় উদারতার প্রাণসত্তা

ইসলামের জীবনবোধে যে মানবীয় উদারতা নিহিত রয়েছে, কোন সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারে না, পারে না তাকে প্রতারণা বলে অভিহিত করতে। এ উদারতা কোন দল-গোত্রবিশেষ বা কোন বিশেষ জীবনব্যবস্থার অনুসারীদের জন্য নয়; বরং সকল মানবতার জন্য। মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য এ উদারতা। ইসলাম যখন মানুষের পথ-নির্দেশে তার দায়িত্ব পালন করে এবং এর মাধ্যমে যুলুম-সিতম এবং বিপর্যয় দূরীভূত করে, তখন কোন ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে তাতে কোন কঠোরতা থকে না, থাকে না কোন ধর্ম বা বর্ণের বিরুদ্ধে অন্তরে কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ।

উদারতা এবং প্রশস্ত চিত্ততার এ প্রাণসত্তা তাকে যমীনের বুকে শান্তি-সুস্থিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। সুযোগ করে দেয় বিভিন্ন ধর্ম-কর্ম-গোত্রকে একীভূত করার। সুযোগ দেয় মানব জাতির মধ্যে উদারতা, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্পীতি বিস্তারের। ব্যক্তিগত ঘৃণ্য-বিদ্বেষ গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ধর্ম-বর্ণে কলুষতা থেকে জীবনের পরিমন্ডলকে পূত পবিত্র রাখার সুযোগ এনে দেয়। এসব কার্য-কারণের ফলশ্রুতিতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং খুন-খারাবী, হানাহানি দেখা দেয়, তা প্রতিহত করার সুযোগও এনে দেয় উদারতার এ প্রাণসত্তা। শুধু তাই নয়, নিছক বস্তুগত শোষণ, সম্প্রসারণবাদী অভিপ্রায় এবং বিজয় লাভ ও মিথ্যা অহমিকার বশবর্তী হয়ে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, তাও দূরীভূত করার সুযোগ এনে দেয়।

ইসলামের সাধারণ মূলনীতি এ নিরেট মানবীয় প্রাণসত্তার চিত্র অংকন করে এভাবে ঃ

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

-মানবমন্ডলী! নিঃসন্দেহে আমারা তোমদেরকে এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন দল-গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। -সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩

وَلَاتُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ق اِلا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ٥

-আর আহলি কিতাবদের সাথে কেবল উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করবে, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা যালিম, তাদের ব্যতীত এবং বলবে, আমরা ঈমান এনেছি, যা কিছু আমাদের এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের এবং তোমাদের মা'বূদ এক। আর আমরা তো কেবল তাঁরই অনুগত। -সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪৬

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ –

-ঈমানদারদেরকে বলে দাও যে, যারা আল্লাহর দিনগুলোর আশা পোষণ করে না, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। -সূরা আল-জাসিয়া ঃ ১৪

وعن جابربن عبد لله قال : مرت بنا جنازة فقام النبى صلى الله عليه وسلم وقمنا قلنا يا رسول الله انها جنازة يهودى فقال اوليست نفسا ؟ اذا رأيتم الجنازة فقوموا –

-হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ একবার আমাদের নিকট দিয়ে জানাযা অতিক্রম করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো এক য়াহূদীর জানাযা! হুযুর বললেন, তা কি কোন মানুষের নয়? কোন জানাযা দেখলে তোমরা দাঁড়াবে। - সহীহ বুখারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা এবং অন্যান্য মুসলমানগণ সাধারণত এহেন একান্ত মানবীয় উদারতার উপর কঠোরভাবে আমল করেছেন। কোথাও কোন আকস্মিক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটে থাকলেও ধর্মীয় প্রয়োজনকে তার কারণ বলা চলে না। যুলুম-সিতম এবং বিপর্যয়কেও বলা যায় না তার কারণ। এসব ঘটনা ঘটেছে এমন লোকদের দ্বারা, যাদেরকে ইসলামের সত্যিকার আদর্শ বলা যায় না। এ সব লোক ইসলামের উন্নততর মূলনীতি, তার মানবতার প্রাণসত্তা সম্পর্কে অবহিত ছিল-এমন কথাও বলা চলে না।

একবার হযরত উমর (রাঃ) কোন এক অন্ধ বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখেন। এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, সে য়াহূদী। হযরত উমর (রাঃ) জানতে চাইলেন, কেন সে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। জবাবে সে জানালো ঃ জিযিয়া, প্রয়োজন এবং জীবনধারণের চাহিদা। খলীফা (রাঃ) হাত

ধরে তাকে আপন গৃহে নিয়ে আসেন, তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজন পূরণ করেন এবং বায়তুলমালের খাজাঞ্চীর নিকট পয়গাম পাঠান ঃ

انظر الى هذا وضربائه – فوالله ما انصفناه ان اكلنا شيبته ثم نخزه عند الهرم – انما الصدقات للفقراء والمسكين وهذا من مساكين اهل الكتان –

-এ ব্যক্তি এবং এর মতো অন্য ব্যক্তিদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহর কসম, আমরা যৌবন খেয়ে বার্ধক্যে তাকে কষ্ট দিলে তার প্রতি এটা আমাদের ইনসাফ করা হবে না। সদকা তো নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্থ এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য। আর এ হচ্ছে আহলি কিতাবের নিঃস্ব ব্যক্তি।

হযরত উমর (রাঃ)-এর দামেশ্‌ক সফরকালে একস্থানে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত কিছু খ্রীষ্টান দেখতে পান। তাদেরকে সরকারী ধন ভান্ডার থেকে সাহায্য দেয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তাদের জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহেরও নির্দেশ দেন।

বস্তুত এ উদারনৈতিক প্রাণসত্তাই মানুষকে ইসলামের দিকে টেনে আনার কারণ হয়েছিল এবং এক অলৌকিক ও বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে দুনিয়ার বুকে ইসলাম বিস্তারের সুযোগ এনে দিয়েছিল। তখনকার দিনে বিস্তৃত ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রগত অত্যাচারে অতিষ্ট হয়েই মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইসলামের কোলে আশ্রয় নিয়ে উদারতা,সুবিচার, ন্যায়নীতি এবং সাম্য লাভের আশা ছিল তাদের তীব্র।

স্যার টি.ভি. আর্নল্ড রচিত Preaching of Islam (আরবী অনুবাদ ডক্টর হাসান ইবরাহীম হাসান ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৫৩ ও তৎপরবর্তী) গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এন্টিয়াটিকের জ্যাকভ গোত্রের প্রধান পুরোহিত মাইকেল দি গ্রেট তার ধর্মভাইদের পত্রের জবাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি আরবদের বিজয়ে আল্লাহর হাত দেখতে পান। তখন প্রাচ্যের গীর্জাগুলো পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ইসলামী শাসনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ লাভ করে।"

এ পাদ্রী হেরাক্লিয়াসের যুলুম-নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে লিখেন ঃ

"এ কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের মালিক আল্লাহ। শক্তি আর দোর্দন্ড প্রতাপের একক অধিপতি তিনি। তিনি মানুষের রাজত্বে যেভাবে খুশী পরিবর্তন সাধন করেন। যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন, আর যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তিনি অবনতকে উন্নত করেন। তিনি যখন রোমানদের অত্যাচার দেখেন, যারা আমাদের গীর্জাগৃহে লুণ্ঠন এবং গোটা দেশে আমাদের গৃহকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, কোন প্রকার দয়া-অনুগ্রহ ছাড়াই তারা আমাদের ওপর নির্যাতন চালায়, তখন রোমানদের অধিকার থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসমাঈলের পুত্রদেরকে প্রেরণ করেন। আর সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের হাতে ক্যাথলিক গীর্জা গৃহের পতন এবং ক্যালকী ডোম সম্প্রদায়ের য়াহূদীদেরকে তা দান করার ফলে আমাদেরকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির

সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ গীর্জা সব সময় তাদের অধিকারে ছিল। আরবরা যখন সেসব অধিকার করে, তখন সেসব গির্জা যাদের অধিকারে ছিল, তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় (আর এ সময় হিম্‌স-এর বড় গীর্জা এবং হাররান-এর গীর্জাও ছিনিয়ে নেয়া হয়)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রোমানদের পাষাণ হৃদয়তা, নির্যাতন ও ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং নিজেদের বিরুদ্ধে চরম পক্ষপাতিত্ব ও শত্রুতা থেকে মুক্তিলাভ করা আমাদের জন্য কোন মামুলী কাজ ছিল না। এ হচ্ছে এক বিরাট ঘটনা, যার কারণে আমরা আজ নিজেদেরকে শান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।"

মুসলিম বাহিনী যখন জর্দান উপত্যাকায় পৌঁছে আর আবু উবায়দা ফোহল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন, তখন সে অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীরা আরবদেরকে লিখে ঃ

"মুসলিম বাহিনী! তোমরা আমাদের নিকট রোমানদের চেয়েও বেশী প্রিয়। যদিও তারা আমাদের সতীর্থ-স্বধর্মী। কিন্তু তোমরা আমাদের প্রতি বেশী অনুগ্রহশীল, যুলুম-সিতম থেকে বেশী দূরে তোমাদের অবস্থান। তোমরা সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনা কর, কথা দিয়ে তা রক্ষা কর। কিন্তু রোমানরা সবদিক বিচারে আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছে। তারা তো আমাদের বাসস্থান পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছে। আর হিমস শহরের অধিবাসীরা হেরাক্লিয়াসের সৈন্যদের সামনেই নিজেদের শহরের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আর মুসলমানদের নিকট পয়গাম পাঠায় যে, গ্রীক খ্রীষ্টানদের যুলুম-সিতম এবং বল প্রয়োগের তুলনায় মুসলমানদের ক্ষমতা গ্রহণ এবং ইনসাফ-সুবিচার তাদের বেশী পছন্দ হয়।"

খৃষ্টীয় ৬৩৩ থেকে ৬৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সিরিয়ায় যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যাতে আরবরা রোমান সেনাদেরকে ক্রমে ক্রমে সে দেশ হতে বহিস্কার করে দেয়, তখন সিরিয়াবাসীদের অনুভূতিও ছিল প্রায় অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৬৩৭ সালে দামেশক যখন আরবদের সাথে সন্ধি-চুক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ফলে লুট-তরাজ ও খুন-খারাবী থেকে নিরাপদ হয়ে পড়ে, এছাড়াও সে চুক্তিতে আরও কতিপয় উপযুক্ত এবং নমনীয় শর্ত ছিল, তখন সিরিয়ার সকল অঞ্চল দামেশ্‌কের দৃষ্টান্ত অনুকরণে অলসতা দেখায়নি। হিমস, মম্বজ ও অন্যান্য কতিপয় আবর শহর আরবদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে। আর এর ফলে তারা আরবাদের অধীনে আসে। এসব শর্তের ফলে কেবল বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধান পাদ্রীই শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করেনি যে, শাহনশাহ তাদেরকে তাঁর আনুগত্যের জন্য বাধ্য করবে- বস্তুত রোমানদের এ আশংকা তাদের অন্তরে মুসলামানদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিকে অধিক প্রিয় করে তোলে। তাই তারা নিজেদেরকে রোমান রাজত্ব বা অন্য কোন খৃষ্টান রাজত্বের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে চায়নি। আর আরব বিজেতারা এমনিভাবে আর একটি কল্যাণও লাভ করে। তা হচ্ছে এই যে, বিজেতা সৈন্যরা এসব খৃষ্টান অঞ্চলে ইতিপূর্বে যা কিছু করেছিল, আর সে সবের ফলে যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া এবং বীরত্বের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়, তা সবই তাদের মনে ছিল।

অবশিষ্ট রয়েছে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এলাকা। মুসলমানরা তাদের শৌর্যবীর্যের ফলে অতি দ্রুত এসব এলাকা অধিকার করে নিয়েছিল। তাদের এটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল যে, ইয়াকূবী এবং নাস্‌তুরী খ্রীষ্টান ফিরকার চিন্তাধারা বিস্তারের ফলে যে পক্ষপাতিত্ব এবং বিশৃংখলা ছড়িয়ে

পড়েছিল, তার তুলানায় তারা নজীরবিহীন উদারতা এবং ধর্মীয় পক্ষাপাতহীনতা লাভ করেছে। মুসলমানদের উদারতা অকৃপণভাবে তাদেরকে অবাধে স্ব-স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অনুমতি দেয়। এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটে থাকলে তা ছিল গুটিকতক বিধি-নিষেধ, নিজেদের পরস্পরের কোন্দল এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ঠেকাবার লক্ষ্যেই এসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় , নানা ফিরকা ধর্মীয় বাগাড়াম্বর জাহির করার জন্য যা করতো। এর ফলে অন্যন্য ফিরকা ছাড়া মুসলমানরাও উপকৃত হয়েছে। তাদের ইসলামী অনুভূতি অক্ষত রয়েছে। আরবরা বিজিত দেশের সাথে যেসব চুক্তি করেছে, এ উদারতার পক্ষে তাও সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাসের প্রতি নজর দিলে অতি সহজে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আরবরা বিজিতদের সাথে স্বাক্ষরিত এসব চুক্তিতে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা মানসিক, আর্থিক এবং দৈহিক আযাদী লাভ করবে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করে আনুগত্যপরায়ণ থাকলে এবং জিযিয়া আদায় করলে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকবে।

এসব সূক্ষ্ম চুক্তির বিস্তারিত বিবরণে এমন কিছু সংযোজন হয়েছে, যাকে কাট-ছাট দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা কোন সহজ কাজ নয়।সে সব বিস্তারিত বিবরণ হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের অবলম্বিত ঐতিহাসিক ঐহিহ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। সে ঐতিহ্যের পরিপন্থী কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে তার ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এখানে সেসব শর্ত আলোচনা করায় কোন ক্ষতি নেই। এসব শর্ত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, খলীফা উমর উবনুল খাত্তাব (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকারকালে এসব শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما اعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان - اعطاهم امانـــا لا نفســـهم واموالـــهم وكنائســـهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها - انه لا تسكن كنا ئـــهم ولا تهدم ولاينتقص منها ولامن حيزها ولا من صليبهم ولامن شئ مــــن اموالهم ولايكرهون على دينهم ولايضار احد منهم -

-দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু। এ হচ্ছে সে নিরাপত্তা, যা আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন ইলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস)-বাসীদেরকে দিয়েছিলেন। সে তাদেরকে জানমাল, গীর্জা-ক্রুস, সুস্থ-অসুস্থ এবং সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। তাদের গীর্জায় কেউ বসবাস করতে পারে না, পারে না তার আকার-আকৃতি এবং আয়তনে কোন পরিবর্তন সাধন করতে। গীর্জার ক্রুস ভাঙ্গতে পারে না, তাদের কোন অর্থ-সম্পদ হরণ করা যেতে পারে না, বাধ্য করা চলে না তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে। তাদের কারো কোন ক্ষতিও করা যাবে না।

তাদের ধনীদের ওপর পাঁচ দীনার, মধ্যবিত্তদের ওপর চার দীনার এবং তৃতীয় স্তরের সাধারণ নাগরিকদের ওপর তিন দীনার জিযিয়া ধার্য করা হয়।

হযরত উমর (রাঃ) প্রধান পাদ্রীর সাথে পবিত্র স্থান যিয়ারত করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যখন বড় গীর্জায় ছিলেন, তখন সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। পাদ্রী বললেন, আপনি এখানেই সালাত আদায় করে নিন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) কিছুক্ষণ চিন্তা করে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "আজ যদি আমি এখানে সালাত আদায় করি, তাহলে পরে কোন এক সময় আমার অনুসারীরা এ দাবি উত্থাপন করতে পারে যে, এটা তো মুসলমাদের ইবাদতের স্থান।"

অমুসলিম প্রজাদের সাথে হযরত উমর (রাঃ)-এর সদাচরণ যে মনোভাব প্রকাশ করে, নীচের ঘটনাটিও তার সাথে সম্পৃক্ত। বলা হয়ে থাকে, হযরত উমর (রাঃ) য়াহূদী কুষ্ঠ রোগাক্রান্তদেরকে সদকার অংশ দান এবং তাদের ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ দেন। জীবনের অন্তিম ওসীয়তেও হযরত উমর (রাঃ) সে সব যিম্মীদের (সে সব অমুসলিম, যারা মুসলমানদের সহমর্মিতার পর্যায়ভুক্ত ছিল) কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর পর খিলাফাতের দায়িত্বে অভিষিক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি ওসীয়ত করে যান যে, যিম্মীদের ব্যাপারে তাঁকে কোন্ নীতি অবলম্বন করতে হবে। তিনি বলেন ঃ

واوصيه بذمة الله وذمة رسوله ان يوفى لهم بعهدهم وان لايكلفـــوا الا طاقتهم -

-আমি তার জন্য আল্লাহর যিম্মাদারী এবং রাসূলের যিম্মাদারীর ওসীয়ত করছি যে, যিম্মীদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করবে এবং তাদের ওপর সাধ্যের অধিক বোঝা চাপাবে না।

এ ধরনের উদারতা এবং সুবিচার ও ন্যায়নীতি নিয়ে ইসলাম অতীতেও গোটা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল আর ভবিষ্যতেও বিশ্ব-শান্তি কায়েম করতে পারে। কারণ ইসলাম মানুষকে যা কিছু দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম-দর্শন-মতবাদ তা দিতে পারে না। ইসলাম সকল মানুষকে একই কাফেলার পথিক মনে করে, যাতে সকলেই তার ছায়াতলে শান্তি উপলব্ধি করে।

মি ঃ গিব Wherther Islam may be গ্রন্থে বলেন ঃ

"কিন্তু ইসলাম সব সময় মানবতার মহান খেদমত আন্জাম দিতে সক্ষম। এছাড়া বিশ্বে এমন কোন সংগঠন নেই, যা সর্বস্তরের মানুষকে একই বৃত্তে একীভূত করতে এতটা স্পষ্ট সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই একবৃত্তে সমাবেশের ভিত্তি হচ্ছে কেবল সাম্য। আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান, চীনে গুটিকতক এবং জাপানে মুসলমানদের মামুলী সংখ্যা এসত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, এসব নানাবিধ বর্ণ-বংশ-গোত্রের মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করার এবং তাদের শ্রেণীর ওপর বিস্তারলাভের ক্ষমতা ইসলামের মধ্যে সব সময় ছিল। যখনই প্রাচ্য-

প্রতীচ্যের বিশাল সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিরোধ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়, তখন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অপরিহার্য হবে।"

আমি এখানে দু'জন ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের উক্তি উদ্ধৃত করেছি এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে-অতীত এবং বর্তমানে-সত্যিকার উদারতা এবং অমুসলিমদের জন্য সুবিচার ন্যায়-নীতির এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ সন্দেহ-সংশয়ের অনেক উর্ধ্বে। ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে ইসলামের পক্ষে এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, এমনটি হতেই পারে না। এটাও সম্ভব নয় যে, প্রকাশ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় তাঁরা কিছু অতিরঞ্জিত করেছেন।

শান্তি স্থাপনে মানবীয় উদারতা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আজ বিশ্বের বুকে বিজয়ী সকল সভ্যতাই এ উপাদান থেকে বঞ্চিত। ধর্ম-বর্ণ-বংশ গোত্র ইত্যাদির আভিজাত্য আজকের বিশ্বকে শতধা বিভক্ত করে রেখেছে। এসব ঘৃণ্য পক্ষপাতিত্বের কারণে মানবতা আজ ধ্বংসপ্রায়, গহ্বরের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছে। এতে সত্যিকার মানবিক উদারতা এবং সুবিচার ও ন্যায়-নীতি অনুপস্থিত। বরং এর পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য লোভ-লালসা চলছে প্রচন্ডভাবে। এসব কিছু যুদ্ধ এবং সন্ধির ময়দানে মানুষের জীবনকে জাহান্নামে পর্যবসিত করেছে। বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে বুভুক্ষা আর ত্রাস। আজ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি নিজেদের সম্পর্কে সতত সন্ত্রস্ত, শংকিত। এক নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ আর ব্যাকুলতার পরিবেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের জীবনকে, মানুষের শিরা-উপশিরায় এসব অনুভূতি বিস্তার লাভ করেছে, তাদের রগ-রেশায় তা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা সব সময় নিজেদের চিন্তায় অস্থির থাকে, একে অপরের ভয়ে কম্পমান থাকে, যেখানে শান্তির কোন উপায় থাকে না। তারা এমন হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ে, যেখানে শান্তির কোন অস্তিত্ব নেই। এমন অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত, যেখানে একবিন্দু আলো পৌঁছতে পারে না। তা সত্ত্বেও পাঠক সেসব হতাশ সভ্যতাকে আত্মগর্ব আর অহমিকায় নিমজ্জিত দেখতে পাবে, দেখতে পাবে তারা নিজেদের সাফাই গাইছে। অথচ তারা মানবতাকে দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ, যুদ্ধের ওপর যুদ্ধ এবং বিপদের পর বিপদ উপহার দিয়ে আসছে। কেন এমন হচ্ছে? তা এজন্য যে, লৌহ, আগুন, বিদ্যুৎ এবং বাষ্পের শক্তির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। তারা এ্যাটম বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু হায়! ভালোবাসা এবং উদারতার কোন সূক্ষ্মতম অংশও তাদের অধিকারে নেই; মানবতার কোন এক ক্ষুদ্রতম অংশের ওপরও নেই তাদের কোন কর্তৃত্ব।

এ হচ্ছে মানুষের এক আত্মিক অবস্থা। পতন আর অন্ধকারের যুগে মানবতার এ অবস্থা হয়। একে চাঙ্গা করতে পারে এমন কোন ঔষধ নেই। নেই এমন কোন আলোর কিরণ, যা তার অন্ধকার দূর করতে পারে, পারে তার অন্ধকার দিকগুলোকে আলোকিত করতে। আছে কেবল একটিমাত্র চিকিৎসা, তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম পুনরায় মানবতার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

তার উত্তরণ ঘটাবে মানবিক উদারতায়। তার আবিষ্ক্রিয়া এবং জ্ঞানকে পরিণত করবে স্নেহ-প্রীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং শান্তির পথের অস্ত্র হিসাবে।

লেনদেনে নৈতিক দিক

ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় অবস্থার ক্ষেত্রেই নৈতিক দিক বিজয়ী প্রভাবশালী এবং উজ্জ্বল থাকে। সম্ভবত এটাই ইসলামের প্রাণশক্তিকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও সীমিত আমিত্ব রাষ্ট্র সরকারের পূজা করে, আর তাকে সব ধরনের নৈতিক এবং মৌলিক নীতি থেকে উন্নত একটা পবিত্র লক্ষ্য বলে অভিহিত করে, ইসলাম তা থেকে মুক্ত। অধুনা বিশ্বের সকল পরিচিত সংগঠনের ওপর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ প্রাণশক্তিই কার্যকর। কেবল ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই এ থেকে মুক্ত। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সে প্রাণশক্তি ইসলামী জীবনের পরিবেশ-পরিমন্ডলকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে ছাড়ে। আর ইসলামী জীবনকে পর্যবর্সিত করে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের জীবনে। যেখানে চুক্তি-অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই, সেখানে বেঈমানী আর মুনাফিকী ছাড়া অন্য কিছুর কোন শক্তি নেই, নেই কোন ভূমিকা।

ইউরোপের আধিপত্যের যুগে মানবতা জঙ্গলী চুক্তি এবং জন্তু-জানোয়ারের আইনের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত অবলোকন করেছে। এ আইন হচ্ছে মুনাফিকী, বেঈমানী, নীচতা-হীনতা, চুক্তি ভঙ্গ, ওয়াদা খেলাফী, চুক্তি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা এবং তাকে নিছক কাগজের টুকরায় পর্যবসিত করার আইন। মানবতা যুদ্ধের সে ভয়ংকর পাশবিকতাও দেখতে পেয়েছে- যা দেখে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারও লজ্জিত হয়। হিরোশিমা এবং নাগাসাকীতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই নগ্ন বর্বরতার দু'টি চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে মানবতা চুক্তি ভঙ্গ, অবিশ্বাস-অনাস্থা এবং হিংস্রতা-বর্বরতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত অবলোকন করবে। এসব হবে নাস্তিক্যবাদী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রাণসত্তার সম্পূর্ণ সহায়ক। নাস্তিক্যবাদী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা কোন নীতি-নৈতকতা এবং দীন-ধর্মে বিশ্বাসী নয়। কোন নীতি-বিবেকের প্রতিও তার নেই কোন আস্থা। পংকিল বস্তুবাদী দর্শন এ সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করে আছে। এ সভ্যতা জীবনের কার্যকর, বর্তমান এবং নিকৃষ্ট বস্তুগত দিক ছাড়া অন্য সব দিককেই অস্বীকার করে।

এ সভ্যতায় আন্তর্জাতিক ঐক্যের যতই ঢাক-ঢোল পেটানো হোক না কেন, তুচ্ছ-নিকৃষ্ট প্রাণশক্তির অধিকারী এবং ঘৃণ্য বিবেকসম্পন্ন এ সভ্যতার ফলে মানবতার ঐক্যের দর্শন কার্যত দূরেই থাকবে। এর কারণ এই যে, কোনও একটি নৈতিক দর্শনের প্রতি এ ঐক্যকে অবশ্যই আস্থা স্থাপন করতে হবে, এমন এক নৈতিক দর্শন তাকে মেনে চলতে হবে, যা বস্তুগত সম্পর্ককে করে সংস্থাপিত-সুগঠিত। সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করবে জীবন গঠনের কাজে, জীবনের ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের কাজে নয়। এখানেও লোভ-লালসা রাষ্ট্র সরকারের ওপর চেপে বসবে, যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য যে কোন অপরাধ-বর্বরতা-হিংস্রতাকে বৈধ জ্ঞান করবে। কারণ এসব অপরাধ তো অপর রাষ্ট্র-সরকারের বিরুদ্ধে।[১] মানবতার পবিত্রতার পরিবর্তে রাষ্ট্র-সরকারের পবিত্রতার ধারণা যতক্ষণ কার্যকর

১.আধুনিক রাজনীতির অভিধানে অন্যদের বিরুদ্ধে অপরাধ তো কোন অপরাধই নয়, বরং তাদের ভাষায় এই হচ্ছে স্বজাতির সেবা, দেশপ্রেমের পরিচয়! -অনুবাদক

থাকবে, ততক্ষণ অপরের অধিকার হরণের অপরাধ থেকে কোন কিছুই নিবৃত্ত করতে পারবে না। রাষ্ট্র-সরকারের পবিত্রতার ধারণা অপরাধীদেরকে অনেক বড় নেতা এবং গাদ্দার-মীরজাফরদেরকে ঝানু রাজনীতিকে পরিণত করেছে। মানবতার গোটা ইতিহাসে এসব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল সে সময়টুকু, যখন ক্ষমতা নিবদ্ধ ছিল ইসলামের হাতে। এ ব্যতিক্রম অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্রে আলোর মিনার স্বরূপ।

আমরা ইতোপূর্বেও আলোচনা করেছি যে, ইসলাম হচ্ছে মুক্তিদাতা শক্তি। ধরাধামে মানুষকে বন্ধনমুক্ত করাই ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে দেয় স্বাধীনতা, আলো আর মর্যাদা। ইসলাম কোন বংশ, গোত্র বা ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিকার হয় না। এ শক্তি যখন অনিষ্টতা, ঔদ্ধত্য এবং গোলামীর শক্তির সাথে সংঘাতমুখর হয়, তখন তা একাই এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ লড়াইয়েও কোন শোষণমূলক বা অর্থনৈতিক কোন স্বার্থ সিদ্ধি ইসলামের লক্ষ্য নয়। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) জনৈক গভর্নরের চিঠির জবাবে (যিনি লিখেছিলেন যে, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে; তাই অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ফলে জিযিয়ার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে) লিখেন ঃ

فقد بعث محمد هاديا ولم يبعث جابيا –

-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন, তহশিলদার হিসাবে নন।

স্বাধীনতা দান এবং প্রতিষ্ঠা-পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম যখন এগিয়ে আসে, তখন সে একথাও বিস্মৃত হয় না যে, তার প্রধানতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন, বিজেতাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ বিধান বা মুসলমানদের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধন নয়। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে এমন কোন আশংকা নেই যে, সে হারামকে হালাল করে- এমন কোন রাষ্ট্রীয় পবিত্রতার ধারণার অনুসারী হবে যে, এ ধারনাই অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করে। বেঈমানী, মুনফিকী আর মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতা বলে। পাষাণহৃদয়তা আর অপরাধ-বর্বরতাকে উপস্থাপন করে যুদ্ধে বীরত্ব হিসেবে।

সন্ধি-চুক্তি একটি পবিত্র জিনিস। যদিও তা মেনে চললে কখনো মুসলমনাদেরকে কোন কোন তাৎক্ষণিক স্বার্থ এবং ঈপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শরাফত-ভদ্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী, সেজন্য মুসলমানকে যত ক্ষতিই স্বীকার করতে হোক না-কেন, যত বিপদেই পড়তে হয় না-কেন; সর্বাবস্থায়ই মাননীয় অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রের পাষাণহৃদয়তা এবং মারামারি-কাটাকাটির উষ্ণ পরিবেশই হোক না কেন। ইসলাম এসব উন্নত চরিত্রের আদর্শ কাজে লাগিয়েছে এবং পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি; বরং এসব দ্বারা ইসলাম অযুত-কোটি মানুষের হৃদয় জয় করেছে। যেসব উন্নত নীতিমালা বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব, তাও জয় করে নিয়েছে ইসলাম। যুদ্ধ-সন্ধিতে নৈতিক দিক সংরক্ষণের নিমিত্ত ইসলামকে সাময়িক এবং আংশিক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে

হয়েছে, অবশেষে তার প্রতিদানও লাভ করেছে। ইসলাম দেখতে পেয়েছে যে, অতি অল্প সময়ে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় পৌঁছেছে, কিভাবে দলে দলে লোক আল্লাহর দীনে শামিল হয়েছে।

আন্তর্জঅতিক তথা মানবিক বিশ্বে ইসলাম ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করাকে আইনে পরিণত করেছে ঃ

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ۝

-ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। নিঃসন্দেহে ওয়াদা-অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসবাদ করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ اِذَا عَهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ط

-আর তোমরা যখন অঙ্গীকার করবে, তখন আল্লাহর অংগীকার পূরা করবে আর পাকাপোক্ত শপথ করার পর তা ভাঙবে না। তোমরা তো তার জন্য আল্লাহকে যামীন করছো। তোমরা যা করছো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার খবর রাখেন। আর তোমরা সে নারীর মতো হবে না, যে তার কাটা সূতা মজবুত করার পর তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। তোমরা নিজেদের শপথকে পরস্পরের প্রতরণা এবং হস্তক্ষেপের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে থাকো, যাতে এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশী উপকৃত হয়। -সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৯১-৯২

এ থেকে জানা যায় যে, ইউরোপে রাষ্ট্র-সরকারগুলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ওয়াদা খেলাফীকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য যে দলীল অবলম্বন করে অর্থাৎ রাষ্ট্র-সরকারের স্বার্থের দলীল, এখানে কুরআন তাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে ঃ

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ط

-যাতে এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশী উপকৃত হতে পারে।

কুরআন মজীদ এ দলীলকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, এ প্রবণতা অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে বৈধ করতে পারে না। মুসলমানদেরকে মানুষের স্বার্থের সামনে মাথানত করতে বারণ করে আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে এ অপমানকর উদাহরণের সাথে তুলনা দিয়ে বলে ঃ

كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط

-সে নারীর মতো, যে তার চেষ্টা-শ্রমে কাটা সূতা মজবুত করার পর তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার পূরণ করা এবং অঙ্গীকার পূরণকারীকে এমন মহান মর্যাদাকর ভাষায় স্মরণ করেন, যেমনিভাবে তিনি নিকৃষ্ট ভাষায় স্মরণ করেন অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী ব্যক্তিকে। চূড়ান্ত কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানবতার গন্ডি থেকে খারিজ করে পশুত্বের পালে নিক্ষেপ করেছেন ঃ

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٥ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَايَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ٥

-কেবল জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে; যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরো করে আর পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। -সূরা আর-রা'দ ঃ ১৯-২০

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَـــا اَمَرَ اللهُ بِــهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِيْ الْاَرْضِ لا اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ٥

-আর যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সব রিশতা-আত্মীয়তাকে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা, যারা তা কর্তন করে এবং পৃথিবীতে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট ঠিকানা। - সূরা আর-রা'দ ঃ ২৫

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ عَـــاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ٥

-যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্ট জীব। তোমরা যাদের সঙ্গে চুক্তি করেছো আর তারা প্রতিবারই তা ভঙ্গ করে এবং এ ব্যাপারে ভয় করে না। -সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৫-৫৬

মুশরিকদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করার জন্যও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ মুশরিকরা ইসলাম এবং মুসলমানদের পথরোধ করেছে, তাদের প্রতিরোধ করেছে, আর তাদেরকে এমন সব কষ্ট দিয়েছে, যা স্পেনে ক্রুসেডার খৃষ্টবাদের বিজয়ের পর দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট গোটা মানবতার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সব মুশরিক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বলেন ঃ

وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَاذِمَّةً ط

-আর তারা যদি তোমদের ওপর বিজয়ী হয়, তবে তোমাদের ব্যাপারে কোন শপথ এবং কোন দায়িত্বেরই পরোয়া করবে না। -সূরা আত-তাওবা ঃ ৮

তাদের মত ঝানু এবং পাপী মুশরিকদের সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তা-ও দিচ্ছেন যে, আজকের পর এরা আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি লাভের অধিকারী হবে না। হ্যাঁ, ইতিপূর্বে যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, তা মেনে চলা হবে এবং মুসলামনরা তা ভঙ্গের কাজে কখনো সূচনা করবে না।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَكْبَرِ اِنَّ اللهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

-এবং আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জনগণের জন্য বড় হজ্বের দিন সাধারণ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল নিশ্চয়ই মুশরিকদের থেকে বিমুখ। সুতরাং তোমরা যদি তওবা করে নাও, তবে তাই তোমদের জন্য উত্তম আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে নাও যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর কাফিরদেরকে ভয়ংকর আযাবের সুসংবাদ দাও; সেসব মুশরিকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ; অতঃপর তারা এতে তোমাদের ক্ষতি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে কোন সাহায্য করেনি। সুতরাং তাদের অঙ্গীকার চূড়ান্ত সময় সীমা পর্যন্ত পৌঁছাও। যারা ভয় করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে ভালোবাসেন। -সূরা আত-তাওবা ঃ ৩-৪

আর চূড়ান্ত কথা এই যে, মুসলমানরাও যখন দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মুসলমানদের নিকট আবেদন জানায়, তখন তাদের এ কাজ তাদের ভাইদের সাথে পূর্বেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েজ করে না ঃ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ

-আর তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তাদের সাহয্য করা তোমাদের কর্তব্য। অবশ্য সে জাতির বিরুদ্ধে তোমরা তাদের সাহায্য করতে পারো না, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ। -সূরা আল-আনফাল ঃ৭২

এ হচ্ছে চুক্তি রক্ষা করার এমন এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এখানে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা নিছক দার্শনিক তত্ত্ব এবং উদাহরণ হিসেবে পেশ করার মূলনীতিই নয়; বরং মুসলমানদের জীবন এবং তাদের সকলের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যিকার কার্যকর আচরণও ছিল তা-ই। ইসলামের বাস্তব ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে। আমরা এখানে তার কিছু অংশ আলোচনা করছি।

হযরত হুযাইফা ইবনুল য়ামান (রাঃ) বলেন, আমি এবং আবুল হোসাইন মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলে কুরাইশের কাফিররা আমাদেরকে পাকড়াও করে। এ কারণে আমি বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। তারা আমাদেরকে বলে, নিশ্চয়ই তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতে চাও। আমরা বললাম, তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, তবে (কোন কাজে) আমরা অবশ্যই মদীনা যেতে চাই। তখন সে মুশরিকরা আমাদের নিকট থেকে আল্লাহর নামে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করে যে, তোমরা অবশ্যই মদীনা যাবে, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোগ দিয়ে লড়াই করবে না। সুতরাং আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ

انصرفا نفى بعهدهم ونستعين الله عليهم -

-তোমরা দু'জনে ফিরে যাও। তাদের অঙ্গীকার আমরা পুরো করবো আর তাদের বিরুদ্ধে কেবল আল্লাহর সাহায্য নেবো।

কোন কোন মুশরিক হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে যারা কুরাইশের নিকট গমন করবে, তারা তাকে গ্রহণ করে নেবে। আর কুরাইশের অনুসারীদের মধ্যে যারা মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করবে, তিনি তাদেরকে গ্রহণ করবেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ অঙ্গীকারের উপর অটল ছিলেন। যারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি, তারাও তাঁর সাথে ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফে (রাঃ) বলেন ঃ

بعثنى قريش الى النبى صل الله عليه وسلم فلما رايت النبى وقع فى قلبى الا سلام فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم - قال انى لا اخيس بالعهد ولا احبس البرود ولكن ارجع اليهم - فان كان الذى فى قلبك الان فارجع -

-কুরাইশ আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে প্রেরণ করে। তাঁকে দেখামাত্র আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করে। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর তাদের নিকট ফিরে যাবো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না আর দূতদেরকে বারণও করি না। এখন তুমি কুরাইশের নিকট ফিরে যাও। বর্তমানে তোমার মনের যে অবস্থা, তাই যদি বহাল থাকে, তবে তুমি ফিরে আসবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল ইবনে আমর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সন্ধি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, চুক্তিপত্র লেখা হচ্ছিলো কিন্তু

তখনও তাতে সীলমোহর হয়নি; এ সময় আবু জুন্দল ইবনে সুহাইল বেড়ি এবং হাতকড়া সমেত কাফিরদের নিকট থেকে পালায়ন করে ক্রন্দনরত অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হন। সুহাইল তাঁর পুত্রকে দেখে বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার এবং আপনার মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সময় সুহাইল তাঁর পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আবু জুন্দল (রাঃ) বললেন, হে মুসলিম জনতা! দীনের কারণে মুশরিকরা আমাকে কষ্ট দেয়। এখন কি আমাকে তাদের নিকট ফিরে যেতে হবে?

যেহেতু আল্লাহর নবী চুক্তি সম্পাদন করেছেন, তাই আবু জুন্দলের আবেদন কোন কাজে লাগেনি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফেরত দেন। যদিও তখন পর্যন্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর এবং সীলমোহর হয়নি (এই বিচারে চুক্তি তখনও অসম্পূর্ণ; যদিও মুখে মুখে সিদ্ধান্ত হয়েছিল)।

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে সেনাপতি আবূ উবায়দা খলীফার মতামত জানার জন্য লিখলেন যে,ইরাকের এক শহরে জনৈক ক্রীতদাস শহরবাসীদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। উমর ফারুক (রাঃ) জবাবে জানান ঃ

ان الله عظم الوفاء فلا تكونون اوفياء حتىٰ تفوا فوفوا لهم وانصرا عنعم –

-নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার পূরণ করার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ঘোষণা করেছেন। তোমরা যতক্ষণ ক্রীতদাসের নিরাপত্তা প্রদান করবে না, ততক্ষণ তোমরা অঙ্গীকার পূরণকারী সাব্যস্ত হতে পারবে না। সুতরাং অঙ্গীকার পূরণ করো এবং দুশমনদেরকে ত্যাগ করে চলে এসো।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে আমি দু'টি মহৎ স্পষ্ট তত্ত্ব বর্ণনা করতে চাই। প্রথম তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) একজন মুসলিম ক্রীতদাসের অঙ্গীকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর সেনাপতিদেরকে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে একদিকে মুসলমানদের পরিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ সাম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়- খলীফা উমর (রাঃ) কার্যত যা প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যক্তির স্থান ও মর্যাদা যা-ই হোক না-কেন, তিনি তাকে মূল্য দিয়েছেন, সকল মুসলমানের ওপরই তার কথা ও অঙ্গীকার কার্যকর হবে। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর স্বীকৃতি পাওয়া যায় ঃ

المسلمون تتكافا دمائهم ويسعى بذمتهم ادناهم –

-সকল মুসলমানের রক্ত এক সমান। আর তাদের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও দায়িত্ব নিতে পারে।

অপরদিকে এ ঘটনায় প্রতিটি ব্যক্তির ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব প্রকাশ করে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি উক্তি গোটা মুসলিম মিল্লাতের উক্তি। সুতরাং কথা বলার আগে অত্যন্ত সংযত হয়ে দুরদর্শিতার সাথে কথা বলা উচিত। কারণ তার একটি উক্তির জন্য গোটা মুসলিম উম্মাহ জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং এজন্যে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে খলীফা উমর (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি

فلا تكونون اوفياء حتى تفوا –

-তোমরা যতক্ষণ কার্যত ওফাদারীর পরিচয় না দাও, ততক্ষণ ওফাদার হতে পার না।

তাঁর এ উক্তিটিও ব্যাপক অর্থবোধক-এ উক্তি ইসলামী চিন্তাধারার চিত্র অংকন করে। তা হচ্ছে এই যে, মানুষের কথার অস্তিত্ব তখন প্রতিপন্ন হয়, যখন বাস্তবে তা হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থপূর্ণ। মুখ নিঃসৃত বাক্য এবং অনুভূত কর্মের মধ্যে স্থাপিত হয় সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য। ইসলামের সকল মৌলনীতির একই অবস্থা। তা কোন নিছক ওয়াজ-নসীহতের দৃষ্টান্ত নয়, নয় কোন জাঁকজমকপূর্ণ উক্তি। এবং তা হচ্ছে একটা বিধান, যা চালিয়ে যেতে হবে, কতকগুলো আইন-কানুন; যা বাস্তবায়িত করা কর্তব্য। বিশ্বের বুকে অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাও একটি বাস্তব ঘটনা, যদিও তা আসমানী ওহীরও এক উন্নত দৃষ্টান্ত।

শরাফত-বুযুর্গী এবং নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে ইসলাম তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়। অপরের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সত্যি সত্যি আশংকা যতক্ষণ দেখা না দেয়, ইসলাম ততক্ষণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা জায়েয মনে করে না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, দুশমনের শত্রুতার কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করা আর প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দেয়া। তাদের চুক্তি দিনের আলোয় তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা তাদের কর্তব্য, রাতের আঁধারে চুক্তি ভঙ্গ করা তাদের কাজ নয়। দুশমন যতক্ষণ চুক্তি ভঙ্গ না করে, ততক্ষণ তা করা যায় না। এরপরও দুশমন যদি ঐক্য ও সন্ধির জন্য উদ্যত হয়, তাহলে মুসলমানদেরকেও সে জন্য উদ্যত হতে হবে, নুয়ে পড়তে হবে সে জন্য ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ٥ وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَايُعْجِزُوْنَ ٥ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ٥ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ٥

-আর কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের যদি চুক্তিভঙ্গের আশংকা হয়, তবে তুমি তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কর, যাতে এ বিষয়ে তুমি এবং তারা সমান বলে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা চুক্তিভঙ্গকারীদের ভালোবাসেন না। কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা বুঝি বেঁচে গেল। নিশ্চয়ই তারা কাবু করতে পারবে না। তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য তোমরা যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকবে শক্তিশালী আর শিক্ষিত ঘোড়া ও জরুরী সরঞ্জাম নিয়ে। এভাবে আল্লাহ তা'আলার দুশমন, তোমাদের দুশমন এবং এদের বাদ দিয়ে আর যারা রয়েছে, তারা যেন তোমাদেরকে ভয় করে চলে। তোমরা আল্লার পথে যা কিছু ব্যয় করবে, (তার বিনিময়) তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না। আর তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন। আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সাহায্য এবং মু'মিনদের দ্বারা তোমার সহায়তা করেছেন। -সূরা আনফাল ঃ ৫৮-৬২

কেউ কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস الحرب خدعة প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার নাম যুদ্ধ' শুনে সংশয়ে পড়ে যায়। অথচ আসলে এতে সংশয়ের কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধে প্রতারণা বৈধ। কারণ তাতো সন্ধি নয়। যুদ্ধ ঘোষণার পর শুরু হয় এর ছল-চাতুরী আর রণকৌশলের কাজ। এ সত্য অবহিত হয়েই দুশমন তার ব্যবস্থা করবে। গ্রহণ করবে উদ্যোগ-আয়োজন। সুতরাং যুদ্ধে প্রতারণার অর্থ হচ্ছে রণনৈপুণ্য এবং উন্নত সামরিক যোগ্যতা। এটা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানের কাজে, সন্ধির ক্ষেত্রে নয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করলে স্পষ্ট শত্রুতার পন্থাবলম্বনকারী দুশমনদেরকে ভুল বুঝাবুঝিতে ফেলা এবং হঠাৎ পাকড়াও করার জন্য অন্যদিকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন (এই কৌশল অবলম্বন করাকে বলা হয় তাওরিয়া)। শান্তিকামী চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করা এবং অতর্কিতে তাদের ওপর চড়াও হওয়া তাওরিয়ার উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে শক্তিশালী ইসলাম সতর্কতাপূর্ণ মর্যাদার ভূমিকা গ্রহণ করে। ইসলাম চুক্তি ভঙ্গ করে না, দুর্বলতাও দেখায় না, শীনাজুরী করে না, আবার ঢিলেমীও প্রকাশ করে না। ইসলাম তো শক্তির মর্যাদা দেয়, ভদ্র ব্যক্তিদের ভদ্রতার মর্যাদা দেয়, সাথে সাথে বাধ্য ও বিশ্বস্তদের মত চুক্তি-অঙ্গীকারও মেনে চলে। আশ্রয়প্রার্থী কাফিরকে আশ্রয়দানের ব্যাপারেও এসব উন্নত চরিত্র প্রকাশ পায়। কারণ এহেন পরিস্থিতিতে তার ক্ষতি সাধনের শক্তি থাকে না। সুতরাং বীরত্বের দাবি হচ্ছে তাকে কষ্ট না দেয়া। কারণ ইসলাম তার বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করতে চায় না; বরং তাকে সোজা পথে আনতে চায়। দুশমনকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে ইসলাম প্রথম সূচনা করে না। দুশমন যখন সূচনা করে, দুশমনী প্রকাশ করে এবং তার মুকাবিলা করে, ইসলাম অবশ্যই তার জবাব দেয় ঃ

আবু দাউদ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ط

-আর কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যতক্ষণ সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে; অতঃপর তাকে তার ঠিকানায় পৌছে দাও। -সূরা আত-তাওবা ঃ ৬

এটা কেবল আশ্রয় দেয়াই নয়; বরং তার সাথে সাথে সাহায্য-সহায়তাও রয়েছে। যতক্ষণ সে নিরাপদে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারে। এ হচ্ছে উন্নতির এক উচ্চ শিখর, যেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মমত পৌছতে পারেনি। এমনিভাবে ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিকদেরকে কোন কষ্ট দেয়া যাবে না।

মুসাইলামা কায্যাবের দু'জন দূত-ইবনে নাওয়াজা এবং ইবনে আতাল মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল? জবাবে তারা বললো, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল। তাদের এ জবাব শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

امنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما

-আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। কোন দূতকে যদি হত্যা করতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের উভয়কে হত্যা করতাম।

আর যুদ্ধ, সে তো মানুষের স্বাধীনতার জন্য, যুলুম-বঞ্চনা আর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, যুলুম-সিতম-ঔদ্ধত্য আর বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে, অলীক কল্প-কাহিনী আর গাঁজাখোরী গাল-গল্পের বিরুদ্ধে। সকল অর্থ আর সকল ক্ষেত্রের বিচারে এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সাথে মনের কামনা-বাসনার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থনৈতিক, বংশীয়-গোত্রীয় এবং জবরদস্তীমূলক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। এ যুদ্ধে অংশ নেয়া মানব-মর্যাদার সম্পূর্ণ সহায়ক। কারণ মানবীয় গুণাবলী, মানুষের অধিকার এবং মানবতার মৌলনীতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ যুদ্ধ।

জাহান্নামী শিল্পের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের অপরাধমূলক পুঁজি এ যুদ্ধ ছড়ায় না। দেহ আর আত্মাকে গিলে খাওয়াই হচ্ছে এ সব জাহান্নামী শিল্পের কাজ। তা তাহযীব-তমুদ্দুনকে গিলে খায়, নীতি-নৈতিকতাকে নিশ্চিহ্ন করে। গুদামজাতকারী কোম্পানীগুলো নয়া উপনিবেশে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যে যুদ্ধ জারী রাখে, এ যুদ্ধ তা-ও নয়। তারা যুদ্ধ চালায় নয়া উপনিবেশের বস্তুগত এবং মানবিক শক্তি থেকে তাদের কাঁচামাল হাসিল করার জন্য, নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার দখল করাই এদের উদ্দেশ্য। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ অবৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য, হারাম মুনাফার পরিধি বৃদ্ধি করার সুযোগ সন্ধানের জন্য এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের যে যুদ্ধ ছড়ায়, এ যুদ্ধ তা-ও নয়।

যে যুদ্ধ বিভিন্ন জাতির ওপর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করার জন্য লৌহ-প্রাচীর দাঁড় করায়, যাতে বিজিত এলাকার মানুষ মূক-বধির আর অন্ধ হয়ে থাকে,লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অজ্ঞতা ও দাসত্বের মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে হাঁকিয়ে নেয়া যায়; যেমন যবেহ করার জন্য পশুকে নিয়ে যাওয়া হয় কসাইখানায়, এ যুদ্ধ তা নয়। যে যুদ্ধে পাশ্চাত্যের পূঁতিগন্ধময় সভ্যতা, বস্তুগত স্বার্থ, বংশগত দাসত্ব এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর খাতিরে মানবতার বিরুদ্ধে যায়, এ যুদ্ধ তাও নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা তার দীর্ঘকালের দুর্গন্ধময় সংস্কৃতিতে এ ধরনের অনেক যুদ্ধের সাথে পরিচিত হয়েছে।

এ হচ্ছে এমন এক যুদ্ধ, যা বিশ্বের বুকে বসবাসকারী মানবকুলের জন্য বহন করে আনে সাম্য, সুবিচার-ন্যায়নীতি এবং মান-মর্যাদা। বাস্তব জীবন এবং বস্তুজগতে তা কার্যকরও করে, আইন এবং বিধি-বিধানে তা প্রয়োগ করে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই তা বাস্তবায়িত করে; একই আকার-আকৃতিতে, একই উপায়ে এবং সকলের জন্য একই পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠিত করে।

সুদ, গুদামজাতকরণ, অবৈধ মুনাফাখোরী এবং শোষণমূলক কার্যকলাপকে ইসলাম হারাম করেছে। এমনিভাবে ইসলাম বস্তুবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ দূর করেছে এবং ফুটবার পূর্বে অংকুরেই তা বিনষ্ট করে দিয়েছে।

গুদামজাতকারী কোম্পানীগুলো এবং ব্যাংক এমন দু'টি জিনিস, যা তার অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিয়ে গুদামজাতকারী, সুদখোর এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়। যালিম ও রক্ত শোষক সুদের হাতে মিসর স্বীয় স্বাধীনতার বিনাশ অবলোকন করেছে। মিসর প্রত্যক্ষ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলো- যারা ইংরেজদের স্বার্থে মিসরের তূলা চায়, নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য মিসরের বাজার চায়, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কোম্পনীর নয়া উপনিবেশবাদের জন্য এবং সমুদ্রপারের অন্যান্য উপনিবেশের জন্য সুয়েজ খাল অধিকার করতে চায়, এদের হাতে এর কি দশা হয়েছিল? এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা যেসব দেশকে সেসব ব্যাংক এবং কোম্পনীর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের হাতে বিপদে ফেলেছেন, তারাও নিজেদের স্বাধীনতার ধ্বংস দেখতে পেয়েছে। ইসলাম প্রথম পদক্ষেপেই এটা বুঝতে পেরেছে। সে কারণে ইসলাম সূদ, গুদামজাতকরণ এবং শোষণের নখ কেটে দিয়েছে এবং সকল দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছে। আর একটিমাত্র সংগ্রামের দরজা খোলা রেখেছে, তা হচ্ছে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ-আল্লাহর পথে জিহাদের দরজা। যেখানে পার্থিব কোন হীন উদ্দেশ্য সামনে থাকে না।

কেবল এ একটিমাত্র উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হলে তা হবে মানবতার খাতিরে যুদ্ধ। প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসামূলক পাশবিক বৃত্তি, লুট-তরাজ এবং ধ্বংসলীলা এখানে লক্ষ্য নয়। এখানে নিরীহ এবং দুর্বলদেরকে স্পর্শও করা হয় না। এ যুদ্ধ অন্যায়-অনাচারী শক্তির মূলোৎপাটনের মৌলিক লক্ষ্য অতিক্রম করে না। অথবা সে শক্তিকে এতটা দুর্বল করে তোলে, যাতে মানবতা সে সবের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। কাউকে ধ্বংস করা, প্রতিশোধ নিয়ে মনের ঝাল মেটানো বা কাউকে অপদস্থ করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস এখানে থাকতে পারে না।

হযরত রাবাহ ইবনে রবীআ (রাঃ) বলেন, একদা কোনও এক যুদ্ধে যোগ দানের জন্য তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে বের হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহবীরা এক নিহত মহিলার নিকট গিয়ে থমকে দাঁড়ান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ماكانت هذه لتقات - "এ মহিলার তো যুদ্ধ করার কথা নয়।" এই বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের চেহারার দিকে তাকালেন। তিনি জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন ঃ

الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا (اجيرا) ولاامرأة

-তুমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নিকট গমন করে বল, শিশু, মজদুর এবং নারীকে যেন হত্যা না করে।

কোন এক যুদ্ধশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয় যে, যুদ্ধের সারিতে কিছু সংখ্যক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। জনৈক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মন বিষণ্ন কেন? তারা তো মুশরিকদের সন্তান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ

ان هؤلاء خير منكم انهم على الفطرة اولستم ابناء المشركين ؟ فاياكم وقتل الاولادا ياكم وقتل الاولاد -

-এ শিশুরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। কারণ তারা প্রকৃতির ওপর রয়েছে। তোমরা কি মুশরিকদের সন্তান নও? সাবধান, শিশুদেরকে হত্যা করবে না; খবরদার, শিশুদেরকে হত্যা করবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে নিহত মহিলার লাশ পাওয়া গেলে তিনি বলেন, তোমরা নারী এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না। -বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ
হযরত বুরায়াদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোন সামরিক বাহিনীর আমীর করার সময় তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়েও আল্লাহকে ভয় করার এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তাকে বলতেনঃ

اغزوا باسم الله فى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغـــدروا ولاتمثوا ولاتقتلوا وليدا -

-তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করো, যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তার সাথে লড়াই করো। লড়াই করবে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোন লাশ বিকৃত করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না।- মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী

ইমাম মালিক (ও) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فدعوهم وما حبسوا انفسهم له ولا تقتلن امراة ولاصبيا ولا كبيرا هرما -

-তোমরা এমন কিছু লোক দেখতে পাবে, যারা বলে যে, আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে রেখেছি। সুতরাং তাদেরকে সে লক্ষ্যের জন্য ছেড়ে দাও, যে জন্য তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে রেখেছে। কোন নারী, কোন শিশু এবং অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। -আল-মুয়াত্তা

খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে কিছু ওসীয়ত করেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেন ঃ

ولاتقطعن شجرا ولاتخربن عامرا -

-কোন বৃক্ষ কাটবে না এবং কোন আবাদ ঘরকে বিরান করবে না।

হযরত যায়দ ইবনে ওহাব (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর পত্র আসে। তাতে এ নির্দেশও ছিল ঃ

لاتغلوا ولاتغدروا ولاتقتلوا وليدا واتقوا الله فى الفلاحين -

-আমানতে খিয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না এবং কৃষক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর আর একটি ওসীয়ত এইঃ

ولا تقتلوا هرما ولا امراة ولا وليدا وتوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان وعند شن الغارات-

-কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি, কোন নারী ও কোন শিশুকে হত্যা করবে না, দু'টি বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও তাদের হত্যা থেকে বিরত থাকবে আর ব্যাপক হামলাকালেও তা থেকে বিরত থাকবে।

এসব নিছক দার্শনিক তত্ত্ব নয়, যা আমলের সময় দ্রবীভূত হয়ে লোপ পায়; বরং প্রাচীন এবং আধুনিক ইসলামী যুদ্ধে এটা ছিল বাস্তব ও কার্যকর নীতি। এর পরিপন্থী কোন বিরল ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকবে। কিন্তু তা ধর্তব্য নয়। আর দু'একটা বিরল ঘটনা ইসলামের বুনিয়াদী নীতিকে বাতিল করতে পারে না। এ বুনিয়াদী নীতিকে ইসলাম তার লক্ষ্য বলে স্থির করেছে আর বাস্তব জগতে তা কার্যকার করে দেখিয়েছে।

ইসলাম যুদ্ধ ও সন্ধিতে যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে, তা যদি আমরা স্মৃতিপটে জাগরূপ রাখি এবং যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা-যা পুঁতিগন্ধময় পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহর নাযিল করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং মানুষের জন্য মানুষের মনগড়া জীবন ব্যবস্থার পার্থক্য আমাদের সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠে। আমরা এটাও দেখতে পাই যে, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানবতা কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। হাস্যকর দম্ভ এবং জ্ঞানের হাস্যকর দাবিতে হাবুডুবু খেয়ে ফিরছে মানবতা। তারা বলতে চায়, আল্লাহর অভিপ্রায়ের চেয়েও তারা বেশী কল্যাণ প্রয়াসী এবং আল্লাহর দানের চেয়েও বেশী নিজের মঙ্গলের অধিকারী।

মানবতার এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। কাফির, আল্লাহ-বিমুখ এবং আত্মগর্বে দিশেহারা সভ্যতার কুফল পুঁতিগন্ধময় নর্দমায় হাবুডুবু খাবে। হ্যাঁ, এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানবতার নেতৃত্ব ইসলামের হাতে সমর্পণ। ইসলাম উদ্‌ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত মানবতাকে সুবিচার, ন্যায়নীতি, নিয়ম-শৃংখলা এবং শান্তি-নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যায়।

আর এখন --- --- --- উপায় কি?

শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামের সর্বাত্মক দর্শনের কিছু অংশ আলোচনা করার পর এবং ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তির পরিপূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার পর- যেখানে শান্তির তাৎপর্য হচ্ছে যমীনের বুকে পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা আর আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠা করার পরিপূর্ণ এবং সর্বাত্মক কল্যাণ যেখানে নিহিত রয়েছে-এ বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত চিরন্তন জিহাদ এবং বিদ্রোহ-অনাচার নির্মূল করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সাধনা, বিপর্যয় এবং অন্যায় অনাচারের সাথে অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শান্তি-সুস্থিতির এ ব্যাপক তাৎপর্য হৃদঙ্গম করার পর হে মুসলিম উম্মাহ! এখন আমাদের কর্তব্য কি, কী আমাদের কর্ম-পন্থা? আমাদের চতুর্দিকে যে বিশ্বজোড়া সংঘাত ঘুরপাক খাচ্ছে, সে সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি? জীবনের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কি দায়িত্ব ন্যস্ত হয়? মানবতা এবং স্বয়ং আমাদের জীবনের কী দাবী আমাদের নিকট ?

এ গ্রন্থের প্রথমদিকের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমাদের ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব সমাধান নির্দেশ করে। এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক সমস্যার মধ্যে পার্থক্য করে না।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ব-শান্তি প্রসঙ্গে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন প্রসঙ্গে আমরা অনেক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেছি। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির কার্য-কারণের এবং সমাজের অভ্যান্তরে অনেক আবেগ-অনুভূতি, সংগঠন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক সম্পর্ক অবলোকন করেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের কর্মপন্থা কি? আমাদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে কিভাবে বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করতে পারি? আর কিভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের মৌলিক বিশ্বাস কার্যকর করতে পারি?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে দু'টি স্বতন্ত্র ব্লক রশি টানাটানি এবং শক্তি পরীক্ষায় মত্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বাস্তব তত্ত্ব-তথ্য তুলে ধরতে চাই। যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে এসব শক্তি পরীক্ষা চলছে এবং যেসব কার্যকারণ তা দূরীভূত বা প্রভাবিত করতে পারে, আমরা তার পর্যালোচনা করতে চাই।

উপরিউক্ত বিষয়ের আলোকে সে সব মূলনীতি সম্পর্কে ইসলামের রায় এবং তা প্রতিরোধের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে যে ভূমিকা গ্রহণ আমাদের জন্য জরুরী, তাও জানা যাবে। আমাদের আকীদা-বিশ্বাস আমাদের সম্মুখে যে ভূমিকা উপস্থাপন করে, তা কি আমাদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করে, না আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের দাবি এবং স্বার্থের দাবির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে ,তাও জানা যাবে। অবশ্য এ জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে,সত্যিকার অর্থে এ ধরণের কোন দ্বন্দ্ব থাকতে হবে।

অতএব যখন এটাও স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, আমাদের আকীদা-বিশ্বাস সমস্যার যে সমাধান উপস্থাপন করে, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হচ্ছে আমাদের সমস্যার সত্যিকার সমাধান; বরং মানবতার সবয়েছে বড় স্বার্থ এবং গোটা মানবতার কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে। এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেল আমরা হিদায়াতের পথে অবিচল থাকতে পারবো এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত করে শান্তিতে পথ পরিক্রম করতে পারবো। আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন থেকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে পৃথক করতে হবে- এহেন পরিস্থিতিতে এমন হৈ-চৈ একেবারেই অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ ও প্রণিধানের অযোগ্য বলে প্রতিভাত হবে। অধুনা আমাদেরকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আল্লাহ্‌ও অনুগ্রহে এখন আমরা মানব-জীবনের সেসব বাস্তব এবং কার্যকর চিত্র উপস্থাপন করবো, যাতে আমরা এ সম্পর্কে মানুষের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ এবং ইসলামের রায় জানতে পারি।

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে

যুদ্ধের দামামা বাজছে। আর হতভাগ্য মানুষের কর্ণকে তা বিদীর্ণ করছে। একান্ত গভীরভাবে কান পেতেও কিছুই শোনা যায় না। মানবতা ইতিপূর্বে আমেরিকায় বরং তারও আগে কোরিয়ায় মার্কিনীদের যুদ্ধের আগেও এ দামামা শুনতে পেয়েছে। বিগত বছরগুলো যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছে, তারা এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সবকিছু ডাক দিয়ে এ সত্য প্রকাশ করছে বা ইশারা-ইঙ্গিতে একথা বলছে। সকল রাষ্ট্রীয় শক্তি-সামর্থ্য এবং উপায়-উপকরণ এ জন্য নিয়োজিত হচ্ছে।

ডিপ্লোমেসীর ক্ষীণ আবরণ এ প্রস্তুতিকে আচ্ছন্ন করে আছে। আমেরিকার নিকট সত্য গোপন করার কাজে এ আবরণ সফল হতে পারে কিন্তু আমেরিকার অভ্যন্তরে এসত্য এতটা স্পষ্ট যে, এ আবরণ তা গোপন করতে পারে না।

মার্কিন সংবাদপত্রের গভীর মনোযোগী পাঠক, যে ব্যক্তি সিনেমাসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও যার জানাশোনা আছে, সে স্বতঃই এ ধারণা করতে পারে যে, আমেরিকা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। মানে যুদ্ধ খুব দূরে নয়। তারা এজন্য জনমত গঠন করছে। সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, এসব প্রস্তুতি আর উদ্যোগ-আয়োজনে যা কিছু ব্যয় হচ্ছে, তা বোকামী না হলেও যুদ্ধ তো বটে। আর সে যুদ্ধও খুব দূরে নয়।

নিঃসন্দেহে আমেরিকা যুদ্ধ বাধাতে চায়। ইউরোপও আমেকিার পদাংক অনুসরণ করলে সে কোরিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো না। আমেরিকা তো বার্লিন সংকটকাল থেকেই একটা যুদ্ধ বাধাতে চায়- এটা স্পষ্ট ছিল। ইন্দো-চীন যুদ্ধে আমেরিকা ইন্ধন যোগায় এবং তা জারী রাখতে ফ্রান্সকে চাপ দিতে থাকে, অস্ত্রবাহী জাহাজ দ্বারা তার সাহায্য করে এবং মার্কিন সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপের হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স শান্তি-নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু তখন ক্লান্ত শ্রান্ত ইউরোপ-আমেরিকার উপর্যুপরি পীড়াপীড়ি এবং খাহেশে সাড়া দিতে পারেনি, তখনও তার আঘাতের ক্ষত শুকায়নি। ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ায় সে ছিল ব্যস্ত, যদিও এতে সমাজতন্ত্র যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে এবং অনাগত দিনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তখন ডলারের শক্তি প্রয়োগ ইউরোপকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ঠেলে দেয়া ছাড়া সব কিছুই করতে পারতো। কেবল এ জন্যই আমেরিকাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

মার্কিন ব্যাংক এবং পুঁজি একটা নতুন যুদ্ধ বাধাবার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করে। এটা হচ্ছে আসল সমস্যা। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, মার্কিনীরা যেসব যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে বাণিজ্যিক বিজয় লাভ করেছে, তা তাদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন অস্ত্র বাজারজাত করাও একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের পর বাজার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শহর অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল তাদের বেশী। তখন বাজারে ইউরোপের প্রতিযোগিতা ছিল না। শক্তিও ছিল কম। বিশেষ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত নিষ্পেষিত ইউরোপে তা ছিল আরও দুর্বল।

মার্কিনী উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হচ্ছে মন্দা বাজার। আর এ মন্দা বাজারের অর্থ হচ্ছে মার্কিন পুঁজিকে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

এর পরিণতি দেখা দেয় মার্শাল প্লানের আকারে। এ প্লানের তিনটি প্রধান লক্ষ্য ছিলঃ

এক ঃ প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয় যে, উৎপন্ন পণ্য দ্বারা যে সব দেশ উপকৃত হয়; মার্কিন ডলারের আকারে নগদ মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সেসব দেশের ওপর চাপ দেয়া যাবে না। কারণ মার্কিন সরকার ইউরোপীয়

দেশগুলোয় লেটার অব ক্রেডিট খুলতো এ শর্তে যে, এ সব দেশের সরকারকে অধিকতর মার্কিন পণ্য ক্রয়ের কাজে তা ব্যয় করতে হবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এ মার্শাল প্লান বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন পুঁজিপতিদের করের বড় বড় বোঝাও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু বিরাট অংকের ট্যাক্সের সাথে এমন মুনাফাও অর্জন করতো, যা উসূল করার ব্যাপারে মার্শাল প্লান-এর আকারে কোন সন্দেহ থাকে না। উপরন্তু তারা মন্দা বাজারের ক্ষতি থেকেও রক্ষা পায়।

দুই ঃ দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন শ্রমিক শ্রেণীর বেকারত্ব এবং তার ফলে উদ্ভূত সামাজিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি। কারণ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরীর কাজে শ্রমিকরা ইতিপূর্বে যেভাবে ব্যস্ত ছিল, এখন তাতে কিছুটা ভাটা পড়েছে। এর দাবি হচ্ছে শহুরে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহের উপায় উদ্ভাবন, যা কল-কারখানাকে খুব বেশী ব্যস্ত রাখতে পারে। মার্শাল প্লান এবং ইউরোপীয় দেশগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করাই হচ্ছে এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এর শেষ পরিণতি হচ্ছে মার্কিন পুঁজি বৃদ্ধি।

তিন ঃ এর তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু করার জন্য নব পর্যায়ে ইউরোপের পুনর্গঠন এবং এতে জীবনের কর্মচাঞ্চল্য পুনরায় ফিরিয়ে আনা, অপরদিকে বেকার লোকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে মার্শাল প্লান ছিল সহায়ক। এ কারণে প্লানের প্রণেতা মার্শাল আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টিতে তাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত। মার্কিন সাময়িকী 'লুক'-তো তাকে বিশ শতকের বিশজন সেরা মানুষের অন্যতম বলে অভিহিত করেছে- যারা বিংশ শতাব্দীতে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কিন্তু মার্শাল প্লানের বয়স সব সময় দীর্ঘ হবে, এটা সম্ভব নয়। কারণ ইউরোপের বাজার যখন ভরে যেতো, তখন কাজ-কারবারের ধরন এক নির্দিষ্ট সীমায় এসে স্তিমিত হওয়া ছিল পরিস্থিতির অবিকল দাবি। এ হচ্ছে চিত্রের এক পিঠ। অপর পক্ষে ইউরোপের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ চূড়ান্ত সীমায় উপণীত হওয়া ছিল জরুরী। ইউরোপ তার উৎপাদন ক্ষমতা বহাল করেছিল অথবা বহাল করতে উদ্যত ছিল। এখন সে এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, কেবল নিজেই ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়নি; বরং অপরকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে। এখন ইউরোপের উৎপন্ন দ্রব্য কেবল ইউরোপের বাজারেই নয়; বরং বিশ্বের অন্যান্য বাজারে মার্কিন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক এমনি এক সময় বৃটেন এক প্রতারণার জাল বিস্তার করে। এর দ্বারা সে মার্কিন প্রজ্ঞার সরলতা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জ্ঞান দ্বারা তার পুঁজিহীনতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং শোষণ চালায়। এই খেলা ছিল ডলারের তুলনায় পাউন্ড স্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের খেলা। সে আমেরিকাকে ডলারের সত্যিকার মূল্য নয়; বরং সাধারণ অফিসিয়াল মূল্য বহাল রাখার জন্য বৃটেন থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়।আর বৃটেন প্রকাশ করে যে, সে আমেরিকার ভয়ে ভীত। কিন্তু আসলে সে তার প্রতিপক্ষের জন্য আর একটি উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখেছিল। অনেক পরে আমেরিকা তা জানতে পেরেছে

ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পাউন্ড স্টার্লিং-এর প্রভাবাধীন পরিমন্ডলে মার্কিন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তার জন্য বাজারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বাজারগুলো দখল করে ইউরোপীয় পণ্য। পক্ষান্তরে স্টার্লিং

এরিয়ায় ষ্টার্লিং পাউন্ড-এর মূল্য হ্রাস পাওয়ার প্রভাব ইউরোপীয় পণ্য মূল্যের উপর পড়েনি। এ বৃত্ত ছাড়া অন্যত্র ইউরোপীয় পণ্যের মূল্যের তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও বেশী হ্রাস পায়।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এ প্রতারণা সম্পর্কে জানতে পেরে বিশ্ব বাজার থেকে সকল প্রাকার কাঁচামাল গুটিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এর জবাব দেয়। তার এ শক্তি ছিল। কারণ তার ক্রয় ক্ষমতা ছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। উপরন্তু বিশ্ব বাজারে তার প্রভাব, যাচাই-বাছাই-এর ক্ষমতা এবং নগদ মুদ্রা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। বৃটেনের উদ্দেশ্য ছিল এর পণ্যের তুলনায় কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং প্রতিযোগিতায় তাকে দুর্বল করে দেয়া। কারণ কাঁচামালের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ছিল বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, এমনি করে বৃটেন এবং মার্কিন মূল্যে এক ধরনের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে। যেমন পশমী কাঁচামালের মূল্য শতকরা পাঁচশ'ভাগ বৃদ্ধি পায়। কারণ পশম ইংরেজদের এক বিশেষ শিল্প। এমনিভাবে বৃটেনের ছল-চাতুরীর মুকাবিলায় নয়া মার্কিন কর্মনীতির বদৌলতে যে কাঁচামালের ভিত্তিতে ইংরেজদের শিল্প টিকে আছে, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়াও বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মূল্য বৃদ্ধির যে ঢেউ শুরু হয়, তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এটাই।

কিন্তু আমেরিকার এ পদক্ষেপ ছিল একটা জরুরী পদক্ষেপ। এর চেয়ে বেশী এটা অগ্রসর হতে পারেনি। কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল একটা সাময়িক এবং সুনির্দিষ্ট হামলা প্রতিরোধ করা। বাজারে মার্কিন পণ্যের চাহিদার বিচারে সাধারণ অবস্থায় কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এর সাথেই তাতে এক বিরাট ধাক্কা লাগে। তা ছিল এই যে, বিশ্ব-বাজারের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ চীনকে সমাজতন্ত্র গ্রাস করে নেয়। চীন পঞ্চাশ কোটি (বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা একশ'বিশ কোটিরও বেশী- অনুবাদক) মানুষের আবাসভূমি। এ সংখ্যা বিশ্বের প্রায় $^1/_৪$ ভাগ। আসলে চীনে মার্কিন পণ্যের বড় বাজার ছিল না। কিন্তু জাপানের পরাজয়ের পর আশা করা গিয়েছিল যে, চীন সে স্থান দখর করবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র যখন চীনকে গ্রাস করে, তখন সে পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। আর মার্কিন পুঁজি কিছুটা মন্দা অনুভব করে। এমনিভাবে সামাজিক সংগঠনগুলি আশংকা করে বেকারত্ব বিস্তারের। কোরিয়ায় যুদ্ধের কিছু পূর্ব পর্যন্ত বেকারদের সংখ্যা ৫০ লাখে পৌছে (যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তা ৩০ লাখে নেমে আসে)।

এ কারণে আমেরিকার জন্য যুদ্ধ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। যদিও কোরিয়ায় যুদ্ধ ২০ লক্ষ্য মানুষকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু কেবল এ যুদ্ধই রোগের একমাত্র চিকিৎসা প্রামণিত হয়নি। আমেরিকার প্রয়োজন ছিল এক ব্যাপক সর্বাত্মক যুদ্ধ। যা একদিকে সকল বেকার লোককে গ্রাস করবে, অপরদিকে পুঁজিকে দেবে মুনাফার নিশ্চয়তা। সুতরাং অধুনা[১] মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে যুদ্ধ জাতীয় জীবনের একটা প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। আর যুগের দাবি অনুযায়ী বিশ্ব-কম্যুনিজমের সয়লাব রোধ করার জাতীয় খাহেশ তো রয়েছে। উপরন্তু বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের এ সয়লাব প্রতিদিন নতুন নতুন ভূমিকে গ্রাস করছে, আর রোজ রোজ এক নতুন বাজরে লাগাচ্ছে তালা।

---

১. এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে।

ইউরোপ যদি আজ আমেরিকার কথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, আর এর ফলে যুদ্ধ শুরু করতে বিলম্ব করে, তবে তা খুব একটা দীর্ঘায়িত হবে না। কারণ হচ্ছে এই যে, ঠিক একই কারণে ইউরোপও যুদ্ধের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করবে। আর যে দিন ইউরোপেও পুঁজির উপাদান চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছবে, সে দিন আমেরিকার মতো সে-ও বিশ্ব বাজার খুঁজবে। আর যতদিন বিশ্বে-সমাজতন্ত্র মারমুখী থাকবে- তার মারমুখী থাকাটা অপরিহার্য; বিশ্বের অধিকাংশ দেশের নিকৃষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি তার জন্য পথ প্রশস্ত করবে। তীব্র শ্রেণী বৈষম্য, যা মনে হিংসা-বিদ্বেষ জাগায়, তা সমাজতন্ত্রের সহায়তা করবে, পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদ যে অন্ধ মোহে ছুটে চলেছে, তা তাকে খাদ্য সররাহ্ করবে- বিশেষ করে বিশ্বের প্রাচ্য দেশগুলোকে। সুতরাং যতদিন সমাজতন্ত্র মারমুখী থাকবে, সে প্রতিদিন আমেরিকা এবং ইউরোপের সামনে এক নতুন বাজারে তালা ঝুলাবে। তাই বিশ্বের স্থানে স্থানে পুঁজির স্বার্থ এ তুফানের পথরোধের জন্য একত্রিত হবে। তারা অস্ত্রবলে বাজার ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে বা ন্যূনপক্ষে যুদ্ধ দ্বারা ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের প্রয়াস চালাবে। অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-উপকরণের বিপুল সম্ভার মৃত্যু এবং ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত হবে। আর এসব কারখানায় যোগাবে কাজ, পুঁজিকে যোগাবে মুনাফা আর লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে যোগাবে মৃত্যু।

সুতরাং ইউরোপের বর্তমান ভূমিকা যুদ্ধের তালে তাল মিলানোর ব্যাপারে তার অবস্থান এবং আমেরিকার উত্তেজিত শিরা ঠান্ডা করার চেষ্টা করা- এসবই হচ্ছে শান্তির সাময়িক কার্যকারণ। হতভাগ্য মানুষের জন্য এটা শান্তির সত্যিকার গ্যারান্টি নয়। পুঁজির স্বার্থ এবং তার লোভ-লালসা হতভাগ্য মানুষকে কসাইখানায় ঠেলে দিচ্ছে। এসব স্বার্থ এবং গরজের পেছনে যে বস্তুগত চিন্তাধারা লুক্কায়িত রয়েছে, তা কোন নৈতিক বা আত্মিক কার্যকারণে কোন মূল্য দেয় না। যদিও চারিত্রিক নীতিমালা এবং মানবীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নামে প্রচুর প্রোপাগান্ডা চলছে।

সংঘাতের মুখে

আজ একদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্লক দাঁড়িয়ে আছে। উভয়ই বিশ্বের অবশিষ্ট এলাকা ধীরে ধীরে গ্রাস করার চিন্তা-চেষ্টায় নিয়োজিত। উভয়ই অবশিষ্ট দুনিয়ার সকল মানবিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক উপায়-উপকরণকে কসাইখানায় নিয়ে কাজে লাগাতে চায়।

আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক বিভিন্ন উপায়ে কাজ করছে। প্রথমত সে সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদীদেরকে ভয় দেখায়, বিশেষ করে সামন্তবাদী আরব দেশগুলোকে। সে পুঁজিবাদীদেরকে ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের ভয় দেখায়। সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের যৌথস্বার্থে সে তাদের প্রতি আহ্বান জানায়। আর এ কাজে সে স্থানীয় পুঁজিবাদ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের মধ্যস্থলে এক প্রাকৃতিক বস্তুগত চুক্তির আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয়ত সে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মন্দাকে ব্যবহার করে এবং কোন কোন সময় সশস্ত্র হামলা চালাতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে সব দেশ কোন না-কোনভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন, যেমন আরব দেশগুলো- সেখানে চলে এই খেলা। তৃতীয়ত, সে কয়েক পর্যায়ে ডলারকে

ব্যবহার করে। এর মধ্যে একটা নতুন পর্যায় হচ্ছে মার্শাল প্লান-এর স্থলাভিষিক্ত। এটাকেই তারা বলে অর্থনৈতিক সাহায্য। ট্রুমান-এর পরিকল্পনায় এটাকেই বলা হয়েছে 'চতুর্থ বিন্দু'।

এ ব্লক সাধারণত শাসক এবং শোষক গোষ্ঠীকে আহ্বান জানায়; সাধরণ মানুষের প্রতি এদের তেমন একটা আস্থা নেই। কারণ পুঁজিবাদী ব্লকের বিজয়ের সাথে এদের স্বার্থ জড়িত। এ ব্লকটি এ পথে খুব চেষ্ট-সাধনা করে। কিন্তু সাথে সাথে মানুষের জাতীয় লক্ষ্য সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, শাসক, শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ওপরই থাকে এদের সবচেয়ে বেশী আস্থা। তারা বিশ্বাস করে যে, এ শ্রেণী জনগণের জাতীয় লক্ষ্যের পথে কখনো সাম্রাজ্যবাদের সাথে সত্যিকার শক্রতা প্রকাশ করবে না। যতক্ষণ এসব জাতি নিজেদের কাজ-কারবার নিজেদের হাতে গ্রহণ না করে, ততক্ষণ এ ব্লকের ভূমিকা বজায় থাকে। তাদের চালবাজ নেতা-কর্তাদের চালবাজীতে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হতে পারে না; একথার সুষ্ঠু এবং কার্যকর প্রমাণ উপস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এ ভূমিকা পরিবর্তন হয় না। তাদের বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদ এ ব্লকের জন্য সত্যিকার বিপদের কারণ প্রমাণিত হবে। উপরন্তু যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে এ ব্লক এবং তার স্বার্থকে বিপদের পথে ঠেলে দেয়া হবে। যখন এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কেবল তখন পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্লক এসব জাতির চিৎকারে কর্ণপাত করার কথা চিন্তা করবে।

এ ব্লক আমাদেরকে নিজেদের সাথে মিলাতে চায়, যাতে কেবল আরবদের মধ্য থেকেই লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে সেনাবহিনীতে ভর্তি করতে পারে। কোন কোন বেতার বার্তা থেকেও এ সত্য প্রমাণিত হয়। তারা আমাদের তেল, খাদ্য উপকরণ এবং রণ কৌশলের ঘাঁটি আগামী দিনের গণহত্যায় সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বিশেষ করে ইন্দো-চীনে তাদেরকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তার পরে তাদের এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। আর এর ফলে তারা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, পশ্চিম সাহারার মাইন অঞ্চল মুক্ত করার জন্য যুদ্ধবাজ পক্ষ কখনো কখনো সেখানে উষ্ট্র এবং গাধা ছেড়ে দিতো। কিন্তু যখন এসব জন্তু পাওয়া যেতো না, তখন আফ্রিকার নয়া উপনিবেশের হাবশীদেরকে মাইন ক্ষেত্রে ছেড়ে দেয়া হতো,যাতে তারা নিজেদের দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ খুইয়েও তাদের জন্য মাইন এলাকা মুক্ত করতে পারে। এসব ঘটনা সত্য হোক না-হোক, এটুকু নিঃসন্দেহে সত্য যে, নিজেদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্বার্থে যুদ্ধক্ষেত্রকে কন্টকমুক্ত করা এসব নয়া ঔপনিবেশিক সৈন্যদের দায়িত্ব ছিল সব সময়। যুদ্ধের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে প্রথম আঘাত সহ্য করা এদেরই কাজ। কোরিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধে যেসব তুর্কী সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরও একই দশা হয়েছে। একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদেরকেও। অনাগত কালের কোন যুদ্ধে, তা যদি বেঁধেই যায়- ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিজেদের বস্তুগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে যেসব লক্ষ লক্ষ আরবীয় কুরবানীর পশু উপস্থাপন করবে, তাদের পরিণতিও ভিন্ন হবে না। এরাও নয়া উপনিবেশের সৈন্য এবং তুর্কী সৈন্যদের ভাগ্য অবশ্যই বরণ করবে।

শ্রমজীবী জনগনই সমাজতান্ত্রিক ব্লকের লক্ষ্য। যেসব লক্ষ-কোটি মানুষ নিজের শ্রম দ্বারা সব কিছু উৎপাদন করে নিজেরা ভুখা থাকে, তারাই হচ্ছে এদের লক্ষ্য। ভুখা-নাঙ্গা মানুষই তাদের টার্গেট। যুগ যুগ ধরে যারা শোষিত-বঞ্চিত, তারাই এদের লক্ষ্যবস্তু। এখনও এদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, যারা রুটি দেখায়, তাদের ডাকে সাড়া দেয়। যে কেউ তাদেরকে এহেন ন্যাক্কারজনক বিলাসিতার হাত থেকে মুক্ত করার ওয়াদা করে, তাদের সামনে স্বল্প সংখ্যক লোক যে বিলাসিতা ভোগ করছে, যাদের উপায়-উপকরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং ন্যাক্কারজনক। অথচ এ সময় অন্ন-বস্ত্রের অভাব লক্ষ-কোটি শ্রমজীবি মানুষকে ইন্ধনে পরিণত করে। অতঃপর এ ইন্ধনকেও করে টুকরো টুকরো। যারাই এদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, এরা তাদের পেছনে ছুটে চলে।

সমাজতান্ত্রিক ব্লক এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তি এবং অপরাধকে ব্যবহার করে। পরাধীন জাতি নিজেদের ঘাড় থেকে পরাধীনতার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলতে চায়। তাদের এ আকাংখাকে কাজে লাগায়, তারা নিজেদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা দ্বারা উপকৃত হতে চায়, যা যালিম-পাষন্ড সাম্রাজ্যবাদ ওদের দেশের গাদ্দার সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় এদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। এমনিভাবে এ ব্লক পাশ্চাত্যের খৃষ্টবাদ এবং স্থানীয় পুঁজিবাদের যে কোন ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতাকে কাজে লাগায় এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য-সুবিচারের আন্দোলনকে পন্ড করার কাজে সাহায্য গ্রহণ করে।

যাই হোক, এ উভয় ব্লক গোটা বিশ্বকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, গোটা দুনিয়ার মানবতার জন্য তাদের ছাড়া কোন উপায় নেই। সারা বিশ্বকে এ দুটোর যে কোন একটি গ্রহণ করে নিতে হবে। তাদেরকে এ দুটো ব্লকের যে কোন একটার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, মানবতার সৌভাগ্য অর্জন এবং মানবতার শান্তি-সুস্থিতির স্বার্থে হয় পাশ্চাত্যের ব্লক বিজয় লাভ করবে, না হয় প্রাচ্যের ব্লক। উপরন্তু এ ব্লকের বাইরের জগতকে কোন একটির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াই এক শক্তিকে অপর শক্তির ওপর চূড়ান্ত বিজয় দানের একমাত্র উপায়। তাদের মতে এমনিভাবে সকল অস্থিরতা-অরাজকাত দূরীভূত হতে পারে।

তাদের এ দাবিতে সত্যতার কোন লেশমাত্র নেই, নেই এ বড় বুলিতে জাতি এবং মানব সত্তার মঙ্গল ও কল্যাণের কোন প্রশ্ন। আমরা নিশ্চিত যে, এতে আমাদের কোন কল্যাণ নিহিত নেই, গোটা মানবতার জন্যও নেই এতে কোন মঙ্গল। এ ব্লকদ্বয়ের কোন একটি অপরটির ওপর বিজয় অর্জন করে অপরটিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাতে মানবতার কোন কল্যাণ হবে না। আমরা এখন জীবনের বস্তুগত অস্তিত্ব পরিপূর্ণ করার পর্যায়ে অবস্থান করছি। এখন আমাদেরকে সাম্রাজ্যাবাদের কাছ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নেয়া স্বার্থ পুনরুদ্ধার করতে হবে। তাই প্রাচ্য ব্লক চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করলে তা আমাদের স্বার্থের অনুকূলে হবে না। এদের পরজিত না হওয়ার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এত শক্তি নিয়ে এ ব্লকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে টিকে থাকা আমাদের জন্য এ কথা প্রমাণ করে যে, আমরা ধীরে ধীরে আমাদের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবো। এমনিভাবে মানবতার জন্যেও এটা এক জরুরী নিশ্চয়তা যে, যালিম-অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী তার ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে

না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে, যারা আমেরিকা সম্পর্কে শুভ ধারণা রাখে এবং মনে করে যে, আমেরিকার বিজয় সাম্রাজ্যবাদের আশা-আকাংখা এবং তীব্রতা প্রশমিত করবে, তবে তাদেরকে দেখতে হবে যে, স্বয়ং আমেরিকা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদরে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রয়োজনে কিভাবে লোহা ও আগুনের শক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মদদ যোগায়। উপরন্তু আমেরিকার ঘৃণ্য আধিপত্য মানবতার ওপর জেঁকে বসুক- আমি মানবতার জন্য তা থেকে পানাহ চাই। নয়া উপনিবেশবাদের পণ্যভূমিতে বৃটেনের আধিপত্যও মার্কিন আধিপত্যের তুলনায় মূল্যহীন। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলোর জন্য মার্কিনীদের শত্রুতা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং ভয়ংকর। শ্বেতাঙ্গদের জন্য একজন মার্কিনী যে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তার সামনে নাৎসীবাদও হার মানে, আমেরিকার একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মাথা তুলে দাঁড়ানোকে কেবল হিটলার -ইজমের সাথে তুলনা করা যায়। যেদিন দুর্ভাগা মানবতাকে আমেরিকার দম্ভ আর ঔদ্ধত্যের ফাঁদে ফেলবে, মানবতার জন্য সে দিন হবে শোক ও মাতমের দিন। বিশ্বের বুকে এমন কোন শক্তি নেই, যার সামনে এ দম্ভ ভীত হতে পারে; কেউ তার কাছ থেকে হিসাবও নিতে পারবে না।

এমনিভাবে আমরা মনি করি, বিশ্বে প্রাচ্য ব্লকের একটা সাময়িক প্রয়োজন রয়েছে, যাতে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা যায়। আর এ ভয়-ভীতির ছায়ায় জনগণের ছিনিয়ে নেয়া অধিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। আমরা সামাজিক সাম্য-সুবিচার প্রতিষ্ঠার অনেক চেষ্টায় এ শক্তির অস্তিত্বের নিকট ঋণী। সমাজতন্ত্রের ভয় না থাকলে সামাজিক সুবিচারের এসব চেষ্টা অনেকাংশে অপূর্ণ থাকতো।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের বা মানবতার কল্যাণ এতে নিহিত যে, প্রাচ্য ব্লক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করুক আর এমনিভাবে সমাজতন্ত্রের কাল্পনিক স্বপ্ন সফল হোক আর সকল মানুষ সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হোক।

সত্য কথা এই যে, এ ব্লকও আমাদের মঙ্গল চায় না, তাদের অন্তরে আমাদের জন্য কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, নেই তাদের এ ক্ষমতা। তারা আমাদেরকে তাদের সেনাবাহিনীর সদস্য বা অধীন হিসেবে দেখতে চায়। আমাদের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা সম্মানজনক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠুক, তা তারা চায় না। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আমাদের সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে, ফিলিস্তিনের অভিজ্ঞতা তা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে। এমনিভাবে য়াহূদীদের জন্য এটা প্রাচ্য ব্লকের হাতিয়ার, যা ফিলিস্তিনে আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এইযে, আরব জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমান থাকুক, রাশিয়া তা পছন্দ করে না। রাশিয়ার ভয় হচ্ছে, আরব ব্লক যেন কখনো এমন এক সত্যিকার শক্তির আকারে মাথা তুলে না দাঁড়ায়, যা ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের নেতৃত্ব অস্বীকার করে। এ কারণে রাশিয়া এ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, যাতে বিভিন্ন জাতির বস্তুগত এবং প্রকৃতিগত অধিকারের ক্ষেত্রে তার সকল দাবি বাষ্প হয়ে হওয়ায় উড়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার প্রোপাগান্ডার অন্যতম ভিত্তি তার হাতছাড়া হোক,

তাতেও সে কুণ্ঠিত নয়। একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈলের গোড়পত্তনে রাশিয়ার আশীর্বাদ সকলের জানা কথা। অথচ সে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করে। রাশিয়া এসব কিছুকেই আরব ব্লকের শক্তি সঞ্চয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। ইসরাঈল যাতে কাঁটার মতো আরবদেহে বিদ্ধ হতে পারে, এইজন্য সে আরবদের ওপর এ বর্বর এবং কঠোর আঘাত হানে। আরবদের ভৌগলিক ঐক্য বিনষ্ট করা, তাদের সীমান্তে ভাঙ্গন ধরানো এবং পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করাও ছিল এ ব্যাপরে রাশিয়ার উদ্দেশ্য। তার প্রোপাগান্ডার ভাষা যা কিছু চেপে চেপে বলে, তা কেবল পাশ্চাত্য ব্লকের বিরুদ্ধে তার সংঘাত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। পাশ্চত্য ব্লকের প্রোপাগান্ডা এবং কর্মধারাও ঠিক অনুরূপ। রুশ কমিউনিজমের দৃষ্টিতে আমরা আমাদের যুদ্ধাস্ত্র পাশ্চাত্য ব্লকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু আমাদের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব এবং সত্তা থাকুক, তা তারা বরদাশ্ত করতে পারে না। আমাদের দেশে তাদের এজেন্টরা যখন শুনতে পায় যে, আরবদের একটা সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব কায়েম করার জন্য ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং তাদেরকে একটা স্বতন্ত্র ব্লকে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যেন তাদেরকে বিরাট অজগর দংশন করেছে। আমরা তাদের তল্পীবাহক হয়ে সমাজতন্ত্রের গুণ কীর্তন করতে থাকি, কেবল এ অবস্থায়ই তারা আমাদেরকে দেখতে চায়। তারা দেখতে চায়, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা নিজেদের দেশে তাদেরকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করি। এটা এমন এক ভূমিকা, যা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা মানুষ, জন্তু বা প্রাণহীন বস্তু নই- এ অনুভূতিও তারা মেনে নিতে পারে না।

যেসব শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে শোষক শ্রেণীর গলার হার তৈরী হয়, যাদের গায়ের ঘাম নেশাখোরদের পান পেয়ালায় টপটপ করে ঝরে, আজ তাদের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের কিছুটা চাকচিক্য থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত মানুষকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রায় প্রাণহীন দেহে পরিণত করা- যেখান থেকে কোন একটা মানুষের চিন্তাধারাও বেরিয়ে আসার অনুমতি নেই, লেনিন-ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যেখানে কোন হৃদয়ই স্পন্দিত হতে পারে না, সেখানে এ ধারণা করাও ভয়ংকর, তাতে শরীর শিহরিয়ে ওঠে, সকল সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অনুভূতি কেঁপে ওঠে তার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে।

আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এ দুটো বস্তুবাদী শক্তির কোন একটির চূড়ান্ত বিজয়কে জীবনের প্রকৃতি অস্বীকার করে। এ শক্তিদ্বয়ের প্রকৃতিতে কেবল স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান। সীমাতিরিক্ত বিজয় থেকেই পরাজয়ের উৎপত্তি, যেমন পরাজয়ের স্তূপ থেকে বিজয়ের জন্ম। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে মিত্রশক্তি জাপান এবং জার্মানকে পরাস্ত করার জন্য অকাতরে চেষ্টা চালিয়েছিল, আজ তারা ইন্ধন খন্ড এবং কর্তিত দেহের সামনে মাথানত করছে, যাতে সেখান থেকে ঔদ্ধত্যপরায়ণ শয়তানকে বের করতে পারে। তারা গতকাল যাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ তারা নতুন শয়তানের বিরুদ্ধে তাকে গ্রহণ করতে চায়। ঠিক এমনটিই করেছিল তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কাল যদি এরা প্রাচ্য ব্লকের ওপর বিজয় লাভ করে, তাহলে তাদেরকে নতুন করে জার্মানীর মুকাবিলা করতে হবে। আর যদি এ

সংঘাতে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়, তবে তার অভ্যন্তর থেকেই শত্রু সৃষ্টি হবে। কঠোরতার অভ্যন্তর থেকেই এ দুশমন সৃষ্টি হবে, মানবতা দীর্ঘদিন ধরে যে কঠোরতা সহ্য করতে পারে না। আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধের আগেই যুগোশ্লাভিয়া হাত গুটিয়ে নিয়েছে, আর এসব কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্লকে দেখা দেয় তীব্র মতবিরোধ[১] এর কারণ হবে, মানবতাকে একই কাঠামোয় বিন্যাস-চেষ্টার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে যখন মানবতার ওপর একই চিন্তাধারা চেপে বসবে এবং সমাজতন্ত্রের পর্যায়ের পর সে চিন্তাধারা আর কোন অগ্রগতির অনুমতি দেবে না। কারণ মার্কসবাদের স্বপ্নভঙ্গের পর সমাজতন্ত্রের সামনে আর কোন লক্ষ্যবস্তু নেই। এ পরিস্থিতি এমন এক অভিশাপ, যাতে মানুষের নিক্ষিপ্ত হওয়া এ কথার প্রমাণ হবে যে, তাকে এক বিরাট অনিষ্টে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এ দুটি ব্লকের সংঘাত এবং তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর যুদ্ধের পরিণতিতে আমরা বিশ্বশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবো- এ ধারনার কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কেও বিশের ভালো মানুষ এ ধারণা পোষণ করতেন যে, এরপর শান্তির সুস্বাদু ফল তারা এমনিতেই লাভ করবেন। কিন্তু পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, যুদ্ধরূপ বৃক্ষ কেবল তিক্ত ফলই দিয়েছে। এ ভালো মানুষরা তা গলধঃকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। মিষ্ট সুস্বাদু ফল ভাগ্যে জুটেছে কেবল ঔদ্ধত্যপরায়ণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর। তারা প্রাচ্যের হোক বা প্রতীচ্যের!

মুক্তি কোন্ পথে?

এ ব্লকে বা ও ব্লকে যোগ দেয়া হতভাগ্য মানুষের জন্য এটা মুক্তির পথ নয়। এ ব্লকদ্বয় চায় প্রতিপক্ষকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে সারা বিশ্বের উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে। সে একা যেভাবে খুশী গোটা বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে তা হবে এ ব্লক দুটোর মূল ভূ-খন্ডের বাইরে। এ লড়াই হবে তুরস্ক, ইরান,ইরাক, সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মাটিতে। আবাদান এবং জাহরানের পেট্রোল খনি হবে এ যুদ্ধের ক্ষেত্র। এ যুদ্ধ আমাদের সকল উপায়-উপকরণ ধ্বংস করবে, আমাদের জীবনকে করবে বিপন্ন, আর আমাদের আবাসভূমিকে পরিণত করবে ধ্বংসস্তূপে। যুদ্ধে যে কোন ব্লকই বিজয়ী হোক না কেন, তার ধ্বংসলীলায় কোন তারতম্য হবে না। যাই হোক, এ যুদ্ধের ফলে আমরা কাষ্ঠখন্ডে পরিণত হবো। বিগত যুদ্ধে ইউরোপের যে অবস্থা হয়েছিল, এ যুদ্ধে আমাদের অবস্থা হবে তার চেয়েও মারাত্মক। এ যুদ্ধে আমাদের যে অবস্থা হবে, তা ইতিপূর্বে কোন জাতি কল্পনাও করতে পারেনি। একটি ক্ষুদ্র এটম বোমা ব্যবহারের হিরোশিমা আজও উদাহরণ হয়ে ওয়েছে। এটম বোমা ব্যবহারের জন্য আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁদুরে পরিণত হবো। হাইড্রোজেন বোমা, গ্যাস বোমা হামলা, অজ্ঞানকারী রশ্মি, ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক যুদ্ধ এবং এমন সব অত্যাধুনিক অস্ত্র আমাদের উপর প্রয়োগ করা হবে, পাশ্চাত্যের অপরাধী চিত্তের রাজ্যে কাফির মন-মানস থেকে যা উৎসারিত হয়েছে।

---

১. চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব ও তীব্র মতবিরোধ আজ কারো অজানা নয়। - অনুবাদক

প্রাশ্চাত্য ব্লকের হোতরা আমাদেরকে বলে যে, আমরা পুঁজিবাদী ব্লকে যোগ দিলে তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। পুঁজিবাদী ব্লক নিজেকে গণতান্ত্রিক ব্লকে বলেও দাবি করে। আমরা যেন দু'দফা এ ব্লকের সাথে যোগ দিইনি! আমাদেরকে যেন একই বিবর থেকে দু'দু' দফা দংশন করা হয়নি? এ বিরল ও সন্দেহজনক ভূমিকার কারণ আমি জানি। তা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় পুঁজিবাদী এবং পাশ্চত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বস্তুগত চুক্তি রয়েছে। স্বাধীনতা হরণকারী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এটা একটা যুক্ত স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদীরা এ ঔদ্ধত্য এবং শোষণ থেকে একটুও পেছনে হটতে প্রস্তুত নয়। তারা বরাবর এ অবস্থান বজায় রেখেছে। তারা ভালোভাবেই জানে যে, সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে তাদের বস্তুগত আশ্রয়স্থল। সাম্রাজ্যবাদই তাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা। এ সম্রাজ্যবাদই তাদেরকে ক্ষমতা এবং পুঁজি যোগন দিয়েছে। এ সাম্রাজ্যবাদীরা গাদ্দারদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে, যখন তারা আরাবী পাশার সৈন্যদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল এবং মিসরে আক্রমনকারী বাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এ ব্যক্তি তাদেরকে ভূমি এবং অর্থ-সম্পদ দান করেছিল। এমনকি আজও[১] তারা শরীফ খান্দানের সদস্য হিসেবে পরিগণিত। সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বত্র এমনটিই করে থাকে। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত মরক্কোর গাদ্দার আল-জালাবী। মরক্কোর মুসলিম নাগরিকদের উপর ফরাসীদের হামলায় তার পুত্রও নিহত হয়েছিল। তথাপি এ ব্যক্তি লজ্জাবোধও করে না।

জনগণ এ নতুন যুদ্ধে ইন্ধন হলে তাতে ক্ষমতাসীনদের কি ক্ষতি? যুদ্ধের ফলে তাদের বিষয়-সম্পত্তি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। তাদের ক্ষেত-খামাররের উপর থেকে ঋণের বোঝা হালকা হয়। তারা যদি জুয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে বা অপকর্ম ও অপব্যয়ের মাধ্যমে নিজেদের অর্থ-সম্পদ উজাড় করে থাকে,তাহলে যুদ্ধে তারা এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। যুদ্ধকালে তারা জরুরী আইনের সুযোগও পায়, যার ছত্রছায়ায় তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে দুর্ণাম ও লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করে মানসিক স্বস্তিবোধ করে। মানুষের মুখে তালা দেয়ার, কলম ভেঙ্গে দেয়ার এবং স্বাধীনতাকামী মানুষকে পাইকারীহারে গ্রেফতারের সুযোগও তারা লাভ করে। যারা জনগণের মধ্যে অধিকার-সচেতনতার বীজ বপন করে, অর্থ-বিত্ত ছাড়া যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে এরা নিজেদেরকে রক্ষা করে। প্রাচ্যদেশে চড়া কর পরিশোধ করতে হয় কেবল গরীব জনগণকেই। ফিলিস্তিন যুদ্ধে আমরা দেখতে পেয়েছি, যে সব সামরিক অফিসার বড় লোকের সন্তান, তারা কিভাবে যুদ্ধের ময়দানে কষ্ট-ক্লেশ থেকে রেহাই পেয়েছে। এরপরও কিভাবে তারা বীরত্বের পদকে ভূষিত হয়। অথচ কায়রোর পানশালা, অপকর্মের আখড়া এবং নৃত্য-শালায় এরা ডুবে থাকে।

তাই বলছি, ক্ষমতাসীনরা যদি নিজেদের দেশকে পুঁজিবাদের হাতে তুলে দেয়- যারা তাদের স্বভাবজাত বন্ধু- তাতে তাদের কি ক্ষতি? অথচ তারা নিজেরা তো সব ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ, যার হাতে এসব ক্ষমতাসীনের ক্ষমতার চাবিকাঠি নিহিত, যারা সত্যিকার

১.বিতাড়িত ফারুকের সময় এ ছত্রগুলো লেখা হয়েছে। একটা নিছক ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে আমরা বর্তমান সংস্করণেও তা অবশিষ্ট রেখেছি।

বন্ধু এবং সুদিনের স্বামীকে চিনতে পারে অত্যন্ত ভালোভাবে- যদি জনগণের স্বাধীনতার চীৎকারকে মূল্যহীন মনে করে, তাতে তাদের দোষ কি?

অন্যদিকে কমিউনিজমের হোতারা আমাদেরকে রুটি এবং শান্তিতে ডুবিয়ে রাখার ওয়াদা করে। অবশ্য এ জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, আমরা যেন কমিউনিষ্টদের কাতারে শামিল হই, যাতে তারা বিজয়ী হতে পারে।

সন্দেহ নেই, আমাদের রুটি এবং শান্তির প্রয়োজন রয়েছে সত্যি সত্যিই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, এর সাথে আমাদের শক্তি এবং মান-মর্যাদার প্রয়োজনও রয়েছে। কমিউনিজম আমাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা আমাদেরকে মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবার অনুমতি দিতে রাযী নয়। কমিউনিজম যুগোশ্লাভিয়াকে তার পালক পুত্র হিসেবে পেশ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা-ই যথেষ্ট। যখনই এদেশটি তার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করানোর চেষ্টা চালিয়েছে, তখন তার যে দশা হয়েছে, তা রীতিমতো শিক্ষনীয়।

কমিউনিজম খ্রীষ্টান ইউরোপ বস্তুবাদী সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে তা একমাত্র উপায় হতে পারে না। কারণ আমাদের রয়েছে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার আরও ব্যাপক এবং কমিউনিজমের তুলনায় আরও পূর্ণাঙ্গ উপায়-উপকরণ। এসব উপকরণ আমাদের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। আমাদের মান-মর্যাদার স্বাভাবিক আকাংখাকে করে না অবদমিত। আমাদের নিকট অন্ন-বস্ত্রের চেয়ে এটা আরও প্রিয়, আরও মূল্যবান।

মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে, আগামী দিনের সংঘাতে তৃতীয় একটি ব্লক সৃষ্টি করতে হবে, যে ব্লক বর্তমানে বিদ্যমান উভয় ব্লককে স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দেবে যে, না, তোমরা আমাদের দেহ এবং জীবনের উপায়-উপকরণের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে- আমরা তোমদেরকে এ অনুমতি দিতে পারি না কিছুতেই। আমরা কখনো আমাদের উপায়-উপকরণকে তোমাদের খাহেশের গোলাম বানাতে দেবো না। আমরা কখনো আমাদের দেহকে তোমাদের গোলা-বারুদ ব্যবহারের কাজে ব্যয় হতে দেবো না। ভেড়া-বকরীর মতো আমরা আমাদের গর্দান তোমাদের হাতে সঁপে দেবো না কখনো।

কেবল এ ভূমিকাই জ্বরাগ্রস্ত মন-মানসে কিছুটা শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে, পারে ব্যধিগ্রস্ত পায়ে কিছুটা ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। এরপর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ব্লক অনুভব করবে যে, এ বিশাল বিশ্বে মানুষও বাস করে। যাদের কিছু গুরুত্ব রয়েছে। তারা নিছক অর্থহীন বস্তুগত সত্তা নয়; নয় কেবল সেবাদাস।

যাদের অন্তরে উভয় ব্লকের কোন একটি স্থান করে বসেছে, তারা বলবে অসম্ভব, এতো হতে পারে না কখানো। উভয় ব্লকের মধ্যখানে প্রাচীরের মতো দাঁড়াবো, আমাদের এমন ক্ষমতা নেই। এদিক বা ওদিকের পা আমাদেরকে পিষে মারবে। আমরা কোন ব্লকের সাথে নেই, এমন ঘোষণা করা উচিত হবে না, আমাদের কোন না-কোন ব্লকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা অপরিহার্য।

আমি জানি, প্রোপাগান্ডা মন-মানসকে কতটা আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, মানুষ কি করে নিজেকে এতটা হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। নিজেদের ইচ্ছায় সেবাদান এবং প্রাণহীন বস্তুতে পরিণত হতে কেন তারা লজ্জাবোধ করে না!

কোন সৈন্যই শত্রুভূমিতে লড়াই করার যোগ্য হতে পারে না। সে দেশের নাগরিকরা এদের বিরুদ্ধে বিপদের পাহাড় খাড়া করাতে পারে। তাদের সম্পদ এবং রেশন বন্ধ করে দিতে পারে। পারে যাতায়াত এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুর জন্য করতে পারে গোয়েন্দাগিরী, করতে পারে তাদেরকে শান্তি-স্বস্তি থেকে বঞ্চিত। সৈন্যরা তাদের সাথে সদ্ভাব রাখুক এবং তাদেরকে নিজেদের কাজকর্মের জন্য অবাধে ছেড়ে দিক বা তাদের ওপর আক্রমণ করুক। কিন্তু শেষ পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রু ছাড়াও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থানেরও সম্মুখীন হতে হবে।

জার্মানীর সকল বাহিনীকেও যুদ্ধের ময়দানে পরজিত হওয়ার পূর্বে দু'বার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধ হোক বা আধুনিককালের, কোন সেনাবাহিনীই আভ্যন্তরীণ স্থানীয় অধিবাসীদের শত্রুতার সামনে টিকতে পারে না। বেখবর আর অপরিণামদর্শীদের ছাড়া কেউ স্থানীয় দুশমনী সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।

এই যে লক্ষ-কোটি জনতা, যুদ্ধের স্ট্র্যাটিজিতে যাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেকোন বিশ্বযুদ্ধে এদের ভূমিকা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর। জয়-পরাজয়ের এদের বস্তুগত উপায়-উপকরণ চূড়ান্ত। এ জনতা যখন একটা কিছু করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন কেউ তাদেরকে ঠেকাতে পারে নি। তারা যখন কিছু একটা করতে চায়, তখন অপারগ ও অক্ষম হয় না। এ ব্যাপারে আরও কিছু বলা মানে প্রলাপ বকা।

ইসলামের বানী

ওপরে যা বলা হয়েছে, বাস্তবতা তা-ই বলে। বস্তু এবং কাঠামোর প্রতি বাস্তব দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ পরিণতিই নজরে পড়ে। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, এ ব্যাপারে কাঠামোর এবং বস্তুর বাস্তব ব্যাখ্যায় ইসলাম কি বলে।

এক ঃ অধুনা মানবতা যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত, জীবন সম্পর্কে সার্বিক মূলনীতি এব শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ চিন্তাধারার ভিত্তিতে ইসলাম এসব যুদ্ধ-বিগ্রহকে অভিসম্পাত দেয়। যে সব কার্য-কারণের ফলে এ সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইসলাম তাকেও অভিসম্পাত দেয়, অভিসম্পাত দেয় যুদ্ধের প্রতি আহ্বানকারী এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদেরকেও। এসব যুদ্ধের লক্ষ্যও অভিসম্পাতযোগ্য, যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং পরিণতিও অভিসম্পাতের যোগ্য। কারণ বিশ্বের বুকে আল্লাহর বাণী এবং তা যে সব মূলনীতির পতাকাবাহী, এসব যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

এ কারণে ইসলাম আমাদের জন্য বিশ্বে খোগদ্রোহী শক্তিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাকে হারাম প্রতিপন্ন করে। পাপ এবং অন্যায়ের সাথে সহযোগিতা করা থেকেও ইসলাম আমাদেরকে বারণ করে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

-যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আর যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। - সূরা আন-নিসা ঃ ৭৬

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানকালের যুদ্ধ কায়-কারণ ও লক্ষ্যের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই আল্লাহর বাণীর সাথে। এ সব যুদ্ধ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর পথে নয়।

দুই ঃ মুসলমানদের কষ্টদানকারী, তাদেরকে দেশান্তরকারী, বিতাড়িত করার কাজে অন্যদেরকে সহায়তা দানকারীদের সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করাকে ইসলাম আমাদের জন্য হারাম করেছে ঃ

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج

-যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমাদেরকে নিজেদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন। -সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৯

ফিলিস্তিনে আমাদের আবাসভূমি থেকে আমাদেরকে নির্বাসিত করার ব্যাপারে ইংরেজ, আমেরিকা এবং তাদের সাথে রাশিয়াও শরীক ছিল। বিশ্বের বুকে মুসলমানদের যে কোন দেশ আমাদের নিজেদের আবাসভূমি। উত্তর আফ্রিকায় আমাদের উপর নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ফ্রান্সও শরীক ছিল এবং এখনও আছে। এ শক্তি দীনের কারণে আমাদের সাথে লড়াই করে এবং এখনও তা অব্যাহত রেখেছে। এ কারণে এ চারটি রাষ্ট্রের যে কোন একটির সাথে যে কোন ধরনের চুক্তি এবং সব রকম সহযোগিতা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। যে দেশ তাদের সাথে এমন ধরনের চুক্তি করবে, সে ইসলামের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে; এহেন হারাম কাজে সরকারের আনুগত্য করা সে দেশের জনগণের উচিত নয়; বরং সে রাষ্ট্রকে এমন হারাম কাজ থেকে বারণ করা গোটা মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য। যে কোন উপায়ে এ কাজ করতে হবে।

তিন ঃ মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতন দূর করতে এবং এর সূচনা নিজেদের যুলুম-সিতম বন্ধ করার মাধ্যমে করতে ইসলাম আমাদেরকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেয়। বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে জঘন্য কোন যুলুম নেই। ইসলামী আবাসভূমির দৃষ্টিকোণ থেকে এ সাম্রাজ্যবাদ অধুনা তিনটি রাষ্ট্রে রূপে উপস্থিত হয়েছে- ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইসরাঈল।

এ কারণে যে কোন ফ্রন্টে এ তিনটি যালিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইসলাম আমাদের প্রতি আহ্বান জানায়। প্রথম সুযোগেই এদের প্রতি তরবারি উত্তোলন করার জন্যও ইসলাম

আমাদেরকে নির্দেশ দেয়, যতক্ষণ এরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুলুম-বাড়িবাড়ি থেকে নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ আমরা নিজেদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মনে করবো :

وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ –

-এবং আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। -সূরা আল-বাকারা : ১৯০

চার : এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের ব্যাপারে যা প্রযোজ্য, ব্যক্তি এবং সমষ্টির ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য। সুতরাং যে কোন কোম্পানী, যে কোন অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন ব্যক্তি এসব দেশের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করে, সে ইসলামের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতরণকারী, আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং মুসলিম মিল্লাতের প্রতি বিদ্রোহী। সারা বিশ্বের সর্বত্র সে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতবকারী।

যেসব ঠিকাদার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এসব রাষ্ট্রের সেনাবহিনীকে খাদ্য, রসদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করে, যেসব মজদুর তাদের জন্য ছাউনিতে কাজ করে বা বন্দরে তাদের মাল-সামান খালাস করে, আর যেসব পেশাদার উলামা-মাশায়েখকে এসব সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী সংকট উত্তরণের কাজে ব্যবহার করে, এরা সকলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করছে। এরা মুসলমানদের সাথে এবং নিজেদের সাথেও গাদ্দারী করছে। কোন আহার্যের গ্রাস, কোন খেদমত বা সাহায্যের জন্য বা কোন ফতোয়ার জন্য যখনই এদের হস্ত প্রসারিত হয়, তখন এরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে থাকে।

এসব বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ইসলাম প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি কড়া নির্দেশ দেয়। ইসলাম তাদেরকে নির্দেশ দেয় এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে এদের ওপর আঘাত হানতে। যতক্ষণ তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুলুম-সিতম থেকে নিবৃত্ত না হয়, আমরা ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকব। উপরন্তু যতক্ষণ তারা সারা বিশ্বে বিদ্রোহ-বিপর্যয় থেকে নিবৃত্ত না হবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

এ হচ্ছে ইসলামের বাণী, যা অত্যন্ত স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, উন্নত এবং প্রকাশ্য। ইসলামের এ বাণী আমাদের জন্য মুক্তির পথ উন্মোচন করে। গোটা মানবতার জন্য ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ, যে কোন বিদ্রোহ-বিপর্যয়-বাড়াবাড়িমুক্ত শান্তি-সুস্থিতির পথ উন্মুক্ত করে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, বাস্তব জীবনে ইসলামের এ বাণী কিভাবে কার্যকর হবে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মুসলিম মিল্লাত যতক্ষণ দু'টি বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।

এক ঃ প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের ছোট-বড় যে কোন দেশ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আইন এবং তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে ইসলামী শরীয়ত থেকে। এ শরীয়ত থেকে গৃহীত নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মূলনীতি জারী করতে হবে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতিনীতি এবং জীবনের পাঠক্রমে। পাঠ্যসূচীকে ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

দুই ঃ দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল দেশকে ইসলামের পতাকাতলে এক ব্লকে শামিল হতে হবে। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও সকলকে এক ব্লক হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তেমনি অর্থনৈতিক এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রেও। তাদের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি হবে ঃ

ক. তারা নিজেদের এবং জনগণের জন্য যে কোন ধরনের স্বাধীনতা কামনা করবে। যে কেউ এ স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

খ.বিশ্বে যে কোন প্রকার যুলুম-সিতম এবং যে কোন ধরনের সাম্রাজ্যবাদই বর্তমান থাকুক না-কেন, এরা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

এ সমমনা ব্লকই নতুন পতাকা উত্তোলন করতে পারেব, যাতে এক নতুন মানবতার চিন্তাধারা প্রতিফলন ঘটবে। আর এ পতাকা নিয়ে তারা পথভ্রষ্ট, বিপণ্ন এবং হতভাগ্য মানবতার জন্য পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসগরের উপকূল পর্যন্ত এ নতুন ব্লকের সীমা বিস্তৃত হবে। নিম্নোক্ত মুসলিম দেশগুলো এ ব্লকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া,লিবিয়া, নীল উপত্যকা, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, জর্দান, আরব জাযিরা, ইয়েমেন, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া। এ ব্লকের অধিবাসীদের সংখ্যা হবে তিরিশ কোটির বেশী।[১] পেট্রোল এবং কাঁচামালের উর্বর খনির মালিক হবে এরা। ভৌগলিক অবস্থান এবং সামরিক গুরুত্বের বিচারে এবং গোটা দুনিয়ার সাথে সংযোগের ক্ষেত্রে এ ব্লক হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল্য হবে অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে সংঘাতমুখর দুটি ব্লকের কোন একটিকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে দু' দু'বার চিন্তা করতে বাধ্য করার মতো ক্ষমতা থাকবে এ ব্লকের। কারণ আগামী দিনের দু'টি ব্লকের যুদ্ধে উভয় ব্লকের মধ্যখানে অবস্থিত বিশাল এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিশাল এলাকা ধ্বংস করা ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে তাদের কোন মূল্য থাকবে না। এ নতুন পর্বের উভয় ব্লককে সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপের ফলে উক্ত অঞ্চলে তাদের ঔদ্ধত্য পরায়ণ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি অব্যাহত রাখার পূর্বে কয়েকবার ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করতে পারে।এ ব্লকের বিচক্ষণতা যখন এমন পর্যায়ে পৌছবে, যাতে তারা সে এলাকায় উভয় ব্লকের মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক প্রোপাগান্ডার সামনে দাঁড়াতে পারে, কেবল তখনই এ ব্লকটি উপরিউক্ত স্থান এবং গুরুত্বের অধিকারী হতে পারে। যখন তারা নিজেদের অর্থনীতি এবং সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ সংগঠিত করবে এবং তাকে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

১.এটা প্রায় ৩ যুগ আগের কথা, বর্তমানে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী। -অনুবাদক

থেকে মুক্ত করবে, তাদের শাসকগোষ্ঠী,পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে তাদেরকে নিক্ষেপ করেছে, দেশ-জাতি আর দীন-ধর্ম কিছুই যাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়।

আমি এ কথাগুলো লিখছি জাতির জন্য, সরকারের জন্য নয়, জনগণের জন্য, সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য নয়। এ বিশাল ভূখন্ডের জাতি এবং জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দুর্বলতা এবং অনৈক্যের কারণ যা-ই কিছু হোক না-কেন, যুলুম-নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ির কার্য-কারণ যা কিছু এবং যত কিছুই হোক না কেন, জাতি এবং জনগণের প্রতি আস্থা না হারানোই হচ্ছে আহ্বানকারীর কর্তব্য। কারণ জনগণ যখন চায়, তখনই কোন শক্তিশালী ব্যক্তি এবং তাদের বন্ধুদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। জনগণ ইচ্ছ করলে তাদেরকে স্থায়ী সংকটে ফেলতে পারে। তখন তারা নিজেদেরকে ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আর তারা নিজেরাও বাঁচাতে পারবে না অস্থিরতা থেকে।

এখন জনগণের জন্য সময় এসেছে এ অপরাধমূলক উপহাসের একটা সীমা নির্ধারিণ করে দেয়ার, যে উপহাস করে থাকে তাদের সাথে নিজেদের ব্লকের শাসকগোষ্ঠী। আপন ভাগ্যের মাপাকাঠি এখন জনগণের নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে সে হাতকে গুঁড়িয়ে দেয়ার, যে হাত তাদের মর্জীর বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

কয়েকটি শাসক পরিবারের নিজেদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বেদীমূলে ফিলিস্তিন ধ্বংস হয়েছে। আরবদের শক্তি- তা যতই দুর্বল হোক না কেন, মুষ্টিমেয় য়াহূদীর সামনে টিকতে অক্ষম বলেই এটা ঘটেনি। যদিও পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রী উভয় ব্লকই য়াহূদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তা সত্ত্বেও তারা আরবদেরকে পরাভূত করতে পারতো না, যদি আরবের মধ্যে অতটা অনুভূতি এবং বিচক্ষণতা বর্তমান থাকতো, যা দিয়ে তারা স্বার্থপর মানুষের স্বার্থপরতা খতম করতে পারতো এবং তাদের অনিষ্টের হাতকে গুঁড়িয়ে দিতে পারতো। তাহলে এহেন বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না, সংঘটিত হতো না এ বিয়োগান্ত ঘটনা।

এটা রোধ করা যেতো, কিন্তু নানা পতাকা অর্থাৎ বিভিন্ন দুর্বল জাতীয়তার পতাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাদের শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, দিয়েছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব।

ইসলামের একক পতাকার দিকে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র পথ, যা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আজ এ পতাকাই মুক্তির দিশারী। সত্যি কথা এই যে, ইসলামের বাণী হচ্ছে সে সর্বশেষ বাণী, মুসলমানরা মুক্তির জন্য বজ্র নিনাদ স্বরে যাকে আহ্বান জানাতে পারে। কেবল তা-ই নয়; বরং শান্তি-স্বস্তি এবং জীবনের নিরাপত্তার জন্য একদিন বিশ্ব মানবতা ইসলামকে ডাকবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, যারা কুফুরী করে; অতঃপর এরা তো আর কিছুতেই ঈমান আনবে না। যাদের সাথে তোমার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে,তারা প্রত্যেকবারই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা মোটেই সাবধান হয় না। অনন্তর তুমি যদি যুদ্ধে তাদেরকে কাবু করতে পার, তবে তাদের মাধ্যমে তাদের পরবর্তীদেরকেও বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে ফেল, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে। কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমার যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশংকা হয়, তবে তুমি তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কর, যাতে এ বিষয়ে তুমি এবং তারা সমান বলে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে ভালোবাসেন না। কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা বুঝি বেঁচে গেল। নিশ্চয়ই তারা কাবু করতে পারবে না। তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য তোমরা যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকবে শক্তিশালী আর শিক্ষিত ঘোড়া ও জরুরী সরঞ্জাম নিয়ে। এভাবে আল্লাহ তা'আলার দুশমন, তোমাদের দুশমন এবং এদের বাদ দিয়ে আর যারা রয়েছে, তারা যেন তোমাদেরকে ভয় করে চলে। তোমরা তাদেরকে জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদের ভালভাবেই জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, (তার বিনিময়) তোমাদেরকে পুরোপুরোই দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না। আর তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

সূরা আনফাল ঃ ৫৫-৬১